রাসূলের (সা) যুগে মদীনার সমাজ

মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ

(২য় খন্ড)

ড: আকরাম জিয়া আল উমরী

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

রাসূলের (সা) যুগে মদীনার সমাজ
মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ
(২য় খণ্ড)

ডঃ আকরাম জিয়া আল উমরি

অনুবাদ
এম রুহুল আমিন

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

রাসূলের (সা) যুগে মদীনার সমাজ

মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ

(২য় খণ্ড)

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)
বাড়ি # ৫০, রোড # ১৬, (৩য় তলা), ধানমন্ডি আ/এ
ঢাকা -১২০৯
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯১১৪৭১৬,
ফোন : ৯১৩৮৩৬৭, ৮১২২৬৭৭, ০১৫৫৪৩৫৭০৬৬
E-mail : biit_org@yahoo.com

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৬, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ
জুলাই ৩১, ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ

ISBN : 984-8203-51-2

প্রচ্ছদ
নজরুল ইসলাম বাদল

বিনিময় ঃ ১৭০.০০ টাকা

মুদ্রণ ঃ
চৌকস প্রিন্টার্স লিমিটেড
১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড
ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

Rasuler (sm) Jooge Madinar Samaj is a Bengali translation of Medinan Society at the Time of the Prophet- Zihad against the Mushriks vol. 2 by Akram Diya al Umari and translated into Bengali by M Ruhul Amin and published by Bangladesh Institute of Islamic Thought, Dhaka, Bangladesh, 1st Print 2007.
Phone : 9138367, 8122677, Fax : 9114716, Email : biit_org@yahoo.com
Price : Tk. 170.00, US$ 12.00

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা

রাসূলের (সঃ)-এর যুগের সমাজ বিশ্ব মুসলিমের চিরন্তন আদর্শ সমাজ। এ সমাজ মুসলিমদের জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ। বিশ্বের মুসলিমগণ যে দেশেই বাস করুন না কেন, তারা তাদের নিজেদের অবস্থান নির্ণয় করতে পারেন সহজেই। এই সমাজের প্রতিটি অঙ্গই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এর সমাজব্যবস্থা, ব্যবসায়, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, যুদ্ধ ও শান্তি সবই পরবর্তী বংশধরদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। সেজন্য মদীনার সমাজ ও শাসন ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে জানা দরকার।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমরা বইটির দ্বিতীয় খন্ডের অনুবাদে হাত দিয়েছি। ডঃ আকরাম জিয়া আল উমরী একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ইসলামী গবেষক। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বর্তমানে ইসলামী বিশেষজ্ঞদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ইসলামের ইতিহাস রচনা। এই জাতীয় পুস্তক শুধু জীবন বৃত্তান্তমূলক না হয়ে সমাজভিত্তিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইসলামের ইতিহাস লিখনে, প্রমাণপঞ্জী যাচাই, বাছাই ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে গভীর মনোনিবেশ প্রয়োজন তার খুব কমই করা হয়েছে।

ডঃ উমরী এ বিষয়টির প্রতি খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন এবং একারণেই তাঁর এই গ্রন্থখানি আদর্শ ইতিহাস হতে পেরেছে বলা যায়।

অনুবাদ কার্য একটি দূরূহ কাজ। আমি মনে করি কাজটি সফলতার সংগে সম্পন্ন করেছেন এম রুহুল আমিন, তিনি বইটি প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় অনুবাদ করার প্রয়াস পেয়েছেন।

জুলাই ২০০৭

এম জহুরুল ইসলাম এফসিএ
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যাট
ঢাকা।

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহুম্মা ছাল্লিআলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ, ওয়াআলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন।

ইসলামের প্রথম যুগেই রাসূল (সা) এর জীবনী *সীরাহ* লিখার বিষয়টি চিন্তা করা হয়েছিল। এ লক্ষ্যে ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে ইতিহাস ও হাদীস বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ উপাত্ত সংগ্রহ ও উপাত্ত বিন্যাসে আত্মনিয়োগ করেন।

ওয়াকিদী ও বালাজুরী'র ন্যায় ঐতিহাসিকগণের লিখার বৈশিষ্ট্য ছিল রাসূল (সা) এর জীবনের ঘটনাগুলোকে বিষয়ওয়ারী ও নিয়ম অনুযায়ী সুবিন্যস্ত করা। *মুহাদ্দিসগণের হাদীস* গ্রন্থগুলোর ঐতিহাসিক উপাত্তের কোন কোনগু*লো কখনো কখনো উল্টাপাল্টা অবস্থায় বিন্যস্ত করা হয়েছিল। এর কারণে মুহাদ্দিসগণ, হাদিস* বর্ণনাকারীগণের মতে, বিভিন্ন কারণে ভিন্নতার সৃষ্টি করেছিলেন।

সেজন্য *মুহাদ্দিসগণ* কোন রিপোর্টের এক অংশ এখানে, অপর অংশ জীবন বৃত্তান্তের নিয়ম অনুযায়ী অন্যত্র যুক্ত করে দিয়েছেন। *সহীহ* বুখারীর মাগাযী (সামরিক অভিযান) অধ্যায়ে বিষয়টি স্পষ্ট বুঝা যায় যা *সহীহ* মুসলিমে তেমনটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না। এর কারণ, *সহীহ* মুসলিমে বিষয়টিকে দীর্ঘ করে উপস্থাপন করা হয়েছে আর *হাদীসের* বর্ণনার উপর মতামত বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনায় এবং এগুলোর বিভাজনের বেলায় ইমাম বুখারীর চেয়ে বেশী যত্নশীল ছিলেন।

কোন কোন লেখক জীবনী লিখার বেলায় মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকদের পদ্ধতিকে সমন্বিত করে লেখনির কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, খলিফা ইবনে খাইয়াত, ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান ফাসাবী, মুহাম্মদ ইবনে জরীর আল তাবারী প্রমুখ। সনদ বর্ণনায় তাঁরা মুহাদ্দিসগণের নীতি অনুসরণ করেছিলেন এবং কোন ঘটনার বর্ণনায় *সনদের* আশ্রয় গ্রহণ করতেন।

লেখকগণ *সীরাহ* লিখার বেলায় যতটা সম্ভব বিভিন্ন প্রতিবেদন সংগ্রহ করে সেগুলো লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এ ব্যাপারে কোন্‌টা *সহীহ্* আর কোন্‌টা *সহীহ্* নয় সে বিষয়ে তারা এতটা চিন্তিত ছিলেন না। তাঁরা কোন্‌টা *সহীহ্* আর কোন্‌টা *সহীহ্* নয় সনদের উপর ভিত্তি করে তা নির্ণয় পাঠকদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। এর ব্যতিক্রম ঘটেছে শুধুমাত্র বুখারী ও মুসলিমের বেলায়। তাঁরা যা লিখেছেন তা *সহীহ্* হিসেবেই লিখেছেন। লেখকগণও এ দু'টোকে তাঁদের বর্ণনায় *সহীহ্* বলে বর্ণনা করেছেন।

ইসলামের প্রথম শতাব্দীর বিশেষজ্ঞগণ হাদীসের বর্ণনাকারীর সনদ ও তাদের পদমর্যাদা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সেজন্য সে যুগের ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন রিপোর্টের বিচার করতে সক্ষম ছিলেন। তবে বিভিন্ন রাবী ও *সনদের* বিষয়টি পরবর্তী শতাব্দীতে শুদ্ধতা বিচারের মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করা হয়নি। তাছাড়া রিপোর্টার ও বয়ানকারীদের শিক্ষা সম্পর্কে তখন কোন বিবেচনা করা হয়নি বিধায় রিপোর্ট ও

বয়ানকারী সম্পর্কে শিক্ষিত ব্যক্তির সন্ধান তেমন একটা পাওয়া যায় না। এর কারণে সমসাময়িক লেখক ও ঐতিহাসিকগণের বিভিন্ন রিপোর্টের মধ্যে *হাদীসের* শ্রেণী বিভাগকরণ ও যথোপযুক্ত শিরোনাম ব্যবহারের ব্যাপারে তেমন কোন বিভক্তির উলে-খ পাওয়া যায় না। গত দু'শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকদের মধ্যে গড়ে ওঠা মতামতই আমাদের বর্তমান সময়ের বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ অনুসরণ করে যাচ্ছেন। পশ্চিমাদের ঐতিহাসিক লেখালেখির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রচলিত *সীরাত* রিপোর্টগুলোকে আধুনিক লেখকগণ মূল্যায়ন করেছেন। পশ্চিমা পদ্ধতি ঐতিহাসিক রিপোর্টের ভিত্তিতে অনুসরণ করা হতো না। এসব রিপোর্টের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণেই এগুলো পশ্চিমা পদ্ধতির সাথে মিলতো না। এ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সনদ গুলোকে *মুহাদ্দিসগণ* কোন কোন *হাদীসের* সঠিকতা যাচাইয়ে ব্যবহারের ক্ষেত্রে উৎসাহী ছিলেন।

জীবনবৃত্তান্ত ও পদমর্যাদা সহকারে *হাদীস* বর্ণনাকারীদের ওপর অনেক বই-পুস্তক লিখা হয়েছে। এ সব পুস্তকের কোন কোনটিতে বর্ণনাকারীদের পদমর্যাদা বর্ণনা করা হতো আর কোন কোনটিতে হতো না। এসব পদ মর্যাদার ওপর ভিত্তি করেই তাদের রিপোর্টের যথার্থতা বিচার করা হতো। তা ছাড়া বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে সমসাময়িকদের মতামতও জীবনী গ্রন্থে উলে-খ করা হতো। ইসলামের ইতিহাস বর্ণনায় বর্তমানে এত বিশাল তথ্য ভাণ্ডার ও মূল্যবান গ্রন্থরাজী বা *সীরাত* গ্রন্থাবলী ব্যবহার করা হয় না। আমরা যদি মহান পন্ডিতগণের গবেষণার ফসলকে ব্যবহার না করি, তাদের বিখ্যাত ঐতিহাসিক রিপোর্টকে মূল্যায়ন না করি আর শুধু মাত্র ঐতিহাসিক সমালোচনার পশ্চিমা পদ্ধতিকেই ব্যবহার করি তা হলে আমাদের সমূহ ক্ষতি হয়ে যাবে।

ইসলামের ঐতিহাসিক রিপোর্টের সমালোচনা উপেক্ষা করে শুধুমাত্র মূল পাঠ্যাংশের সমালোচনার ওপর নির্ভর করে *সীরাত* প্রণয়ন করা হলে পরস্পর বিরোধী অনেক রিপোর্টের কারণে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। বিশেষ করে ইসলামের প্রথম যুগের রিপোর্টের সাথে সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের ব্যাপারে এমন বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। গবেষকগণ সনদের আলোচনার জন্য মুহাদ্দিসগণের মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এ রূপ করা না হলে কোন্ রিপোর্টটি সঠিক তা নির্ণয়ে তারা অনতিক্রম্য সমস্যার সম্মুখীন হবেন।

অন্যায়ভাবে পশ্চিমা সমালোচনার পদ্ধতিকে আমরা অবজ্ঞা বা হেয় করছি না, মনগড়াভাবে তাদের পদ্ধতিকে বিচার বিশে-ষণ করছি না। পশ্চিমা সমালোচনার পদ্ধতিগুলো বড় বড় পণ্ডিতদের শ্রম সাধনার ফল। অভিজ্ঞতা ও ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে তারা এ পদ্ধতিতে উন্নয়ন ঘটিয়েছেন। পশ্চিমা সমালোচনা পদ্ধতি ব্যাপকতা ও গভীরতা অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেক পণ্ডিত ব্যক্তিই তাঁর পূর্বসূরীদের কাজের সাথে নতুন কিছু যোগ করেছিলেন।

অনেক নীতি ও পদ্ধতির ব্যাপারে মুসলিম পণ্ডিতদের প্রতিষ্ঠিত গবেষণাকে পশ্চিমা পণ্ডিতগণ খণ্ডন করেছেন। পশ্চিমা পণ্ডিতদের এরূপ খণ্ডন প্রক্রিয়া ইউরোপের চিন্তা জগতের মূলে নাড়া দিয়েছিল। ইউরোপের পশ্চিমা বিশ্ব ও মুসলিম বিশ্বের সত্যিকার

সমস্যায় এ ঘটনাটি ঘটেছিল। মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা পদ্ধতি *মুহাদ্দিসগণের* নিয়ম পদ্ধতির মত ছিল না। অন্যান্য নিয়ম পদ্ধতিগুলো *উসূলে ফিক্‌হ্‌র* পণ্ডিতগণ প্রণয়ন করেছিলেন। চিকিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, অংকশাস্ত্রের পণ্ডিতগণ বিশেষ বিশেষ নিয়ম কানুন প্রণয়ন করেছিলেন।

রজার বেকনের মতে এ নিয়ম বা গবেষণা পদ্ধতিগুলো পশ্চিমা ইতিহাসতত্ত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট। গুস্তাব লেবনের মতো[১] রজার বেকণ তাঁর গবেষণার কাজে আরবি সূত্রের গ্রন্থাবলি ব্যবহার করেছেন। গবেষণার এ পদ্ধতিগুলো প্রযুক্তির উঁচু স্তরে পৌঁছাতে পশ্চিমের বস্তুবাদী সভ্যতাকে সাহায্য করেছিল। এ ভূমিকার বিষয়টি হলো *মুহাদ্দিসগণের* অনুসৃত পদ্ধতি। এ পদ্ধতি সরাসরি হাদীস বর্ণনার সাথে জড়িত। এ বর্ণনাগুলো আমরা পরবর্তীতে ঐতিহাসিক রিপোর্টের জন্য ব্যবহার করবো। মুহাদ্দিসগণের অনুসৃত পদ্ধতি ঐতিহাসিক গবেষণার পদ্ধতির মত।

হাদীসের শ্রেণীবিভাজন ও শিরোনামকরণে মুহাদ্দিসগণ যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন পঞ্চাশ হিজরীতে খতিব আল বাগদাদী তা চূড়ান্ত করেন। এরপর এ ব্যাপারে আর তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। শিক্ষাদানের লক্ষ্যে ইবনে আল সালাহ ও আল-কাযী আয়ায হাদীসের শ্রেণী বিভাজনের পদ্ধতিতে সংশোধন ও সংস্কার করেছিলেন মাত্র। আল হাফিয আল যাহাবী, আল হাফিয ইবনে কাসির ও আল হাফিয ইবনে হাজার তাঁদের গ্রন্থাবলীতে সামান্য পরিবর্তন এনেছিলেন। তবে বিভাজনের এ পদ্ধতিতে তেমন কোন পরিবর্তন আনা হয়নি। এর কারণ আল যাহাবী ইবনে কাসির ও ইবনে হাজার সাধারণ নিয়মাবলীতে সামান্যই পরিবর্তন এনেছিলেন। সামান্য হলেও এ সংশোধনগুলোর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি কিভাবে এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ ও ব্যাপক ভিত্তিক হতে পারে, মুসলিম বিশ্বে শিক্ষা আন্দোলন এর মাধ্যমে সক্রিয় যার ফলে এ পরিবর্তন বহুদিন পর্যন্ত অবহেলার কারণে কোন চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করেনি।

মুহাদ্দিসএবং পশ্চিমা আলোচকদের পদ্ধতিগুলোকে সমন্বয় করা গেলে সবচেয়ে ভাল ফলাফল পাওয়া যেত। তবে পশ্চিমা পদ্ধতিকে ইসলামী চিন্তার মানদণ্ডে বিবেচনা করা হলেই কেবল তা সম্ভব হবে। অধুনা ইসলামিক ঐতিহাসিক গবেষণা ও *সীরাত* গবেষণা এখানে বলতে গেলে শিশু অবস্থাতেই রয়েছে। এ অবস্থার উত্তরণে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিক গবেষণার মানে এটিকে উন্নীত করা। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করতে হয়, *সীরাতের* আধুনিক কোন গ্রন্থ পাঠকের কাছে কোন আধুনিক গ্রন্থ ও ইবনে হিশামের *সীরাত* বা ইবনে আল কাইয়্যিমের *যাদ আল মা'আদ* এর মধ্যে কোন আলাদা কিছু মনে হবে না। বর্তমান শতাব্দীর সমাজ বিজ্ঞান গবেষণায় বিশাল উন্নতি সাধিত হলেও এ ধরনের গ্রন্থের পদ্ধতিগত ব্যবস্থাপনায় তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, আমরা এখনো আধুনিক শিক্ষা জগতের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি। অধুনা জ্ঞান-ভাণ্ডারের বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্পদরাজির ভেতরে আমরা এখনো প্রবেশ করতে পারিনি, শুধু তাই নয় আমাদের পূর্ব পুরুষগণ ঐতিহাসিক গবেষণায় যে অবদান রেখেছেন তার মধ্যেও আমরা প্রবেশ করতে পারিনি। আমাদের পূর্ব পুরুষদের জ্ঞানভাণ্ডার

পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের তাদের পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানভাণ্ডারের চেয়েও বেশী সমৃদ্ধশালী।

গবেষণা ক্ষেত্রে আমাদের ঐতিহাসিক সমালোচনা দুর্বল, আমাদের রিপোর্টের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আরও বেশী দুর্বল। বিভিন্ন রিপোর্টের ক্ষেত্রে আমাদের ভাসাভাসা উপস্থাপনা, ঘটনাপঞ্জির সংকীর্ণ বিশ্লেষণ, কার্য ও কারণের ভিত্তিতে বিভিন্ন ঘটনাবলীর বিশে-ষণ করতে না পারা, ইসলামের ইতিহাসের অস্পষ্ট পরিবর্তনের চিত্র ও ইসলামী সমাজে ব্যক্তির ভূমিকা পরিবর্তনের চিত্র এ সবগুলো ঐতিহাসিক সমালোচনার উপস্থাপনার কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়। কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থই আমাদেরকে বিচার বিশ্লেষণের স্পষ্ট ধারণা দিতে পারেনি। এর কারণ প্রথম যুগের ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে শুধুমাত্র রিপোর্ট উপস্থাপনের ওপরই নির্ভর করা হতো। প্রাচীন যুগের মুসলিম ঐতিহাসিকগণ খুব কমই ইতিহাসের চালিকা শক্তি সামাজিক ধারণার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিল। কুরআন প্রথম থেকেই সামাজিক ধারণার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। কোন মুসলিম ঐতিহাসিকই কুরআনের ঐতিহাসিক ধারণা গঠনের চেষ্টা করেননি। ঘটনা, পরামর্শ, ঐতিহাসিক সাক্ষীর ওপর ভিত্তি করে কোন ঐতিহাসিকই ইতিহাস প্রণয়নে চেষ্টা করেন নি। ইবনে খালদুনের *মুকাদ্দিমা* প্রণয়নের পূর্ব পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। তবে মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ প্রথম যুগ থেকেই দর্শন ও তর্কশাস্ত্রের উন্নতি সাধন করেছিলেন। এর ফলে ভাষাবিদ্যা ও *উসূলে ফিকহ'র* গবেষণায় তারা উপকৃত হয়েছিলেন। সতর্কতার সাথে এবং ইসলামী দর্শন ও বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলো পরিহার করে তারা দর্শন ও তর্কশাস্ত্র থেকে কল্যাণকর জিনিসগুলো গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এ কাজে তারা যথেষ্ট সফলকাম হয়েছিলেন। ইসলামে ঈমানের ওপরই তাদের সফলতা নির্ভর করেছিল। *আকিদাই* ছিল সফলতার চাবিকাঠি।

অনেক গবেষক বিশেষ করে প্রাচ্যের গবেষকগণের ধারণা হলো মুসলিম পণ্ডিতগণ শুধু রিপোর্টের সনদ পরীক্ষাতেই ব্যস্ত, তারা মূল বিষয়গুলোর প্রতি যত্নবান ছিলেন না। কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে, এ জাতীয় অনুসন্ধিৎসু মনমানসিকতার কারণেই ইতিহাসের মূল বিষয়ের পরীক্ষা নিরীক্ষার বিষয়টি অবহেলিত থেকে যায়। এ জাতীয় বিচার বিবেচনাকে কোন সাধারণ বিবরণ হিসাবে ধরে নেয়া যাবে না। মুসলিম পণ্ডিতগণ *সনদ* পরীক্ষার কাজে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলেন, তবে তারা মূল বিষয়ের পরীক্ষা নিরীক্ষার বিষয়টিকে অবহেলা করেন নি। তারা এ ব্যাপারে বেশ যত্নশীল ছিলেন। তাদের সাক্ষ্য প্রমাণের বিষয়গুলো এতই বিরাটাকারের ছিল যে, তার হিসাব সম্ভব নয়। তবে আমরা কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার কথা উলে-খ করবো যেগুলোর মাধ্যমে মূল বিষয় পরীক্ষার বিষয়টি জানা যাবে। অনেক সূত্রে বর্ণিত ওহোদ যুদ্ধের সৈন্য সংখ্যার বিষয়টি ইবনে হাযম প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। মূল বিষয়ের যুক্তিগ্রাহ্য বিবেচনার ওপর ভিত্তি করেই তিনি এমনটি করেছিলেন। মূসা ইবনে উকবা *বানুমুস্তালিকের* বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানকে হিজরীর চতুর্থ বৎসরে সংঘটিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর এ বর্ণনা *সীরাত* লেখকদের অনেকের কাছে সঠিক ছিল না। তাদের মতে এ ঘটনার তারিখ ছিল হিজরীর ষষ্ঠ বৎসর। ইবনে আল কাইয়্যিম ও আল যাহাবী এ ব্যাপারে মূসা ইবনে

উকবার সাথে এক মত পোষণ করেন। মূল বিষয়টি পরীক্ষার পরই তাঁরা উকবার সাথে একমত হয়েছিলেন। সা'দ ইবনে মুয়ায এ অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁরা তারিখ সম্পর্কে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিলেন। *বানু কুরাইযার* বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুয়ায শহীদ হয়েছিলেন।

পূর্বেকার ঐতিহাসিকগণ *যাত আল রিকার* অভিযানের তারিখ সম্বন্ধে দ্বিমত পোষণ করেন। আল বুখারী তারিখ নির্ধারণের ব্যাপারে খায়বার এর বিজয়কে অনুসরণ করেন। তাঁর সাথে ইবন আল কাইয়্যিম, ইবনে কাসির ও ইবনে হাজার একই মত পোষণ করেন। এ ব্যাপারে ইবনে ইসহাক ও আল ওয়াকিদির সাথে তাঁরা দ্বিমত পোষণ করেন। একটি ঘটনা এজন্য দায়ী ছিল। আবু মূসা আল আশআরী ও আবু হুরায়রা এ অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এরপর তাঁরা খায়বার জয়ের পর রাসূল (সা) এর কাছে এসে তাদের ইসলাম কবুলের কথা ঘোষণা করেছিলেন।

সালাত আল খাওফ'র বিধির ব্যাপারে অনেক আলোচনা হয়েছিল। তারিখ নির্ধারণের ব্যাপারেই এ আলোচনাগুলো হয়েছিল।

তায়েফে *ওয়াদি উজ্জ* নামের যে একটি পবিত্র স্থান ছিল এ ব্যাপারের ঘোষণা বাতিলকে *আল খাত্তাব* ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি মূল বিষয় যাচাই করেই বাতিলের ঘোষণাটির ব্যাখ্যা করেছিলেন।

এ বিষয়গুলো এ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ, উদাহরণগুলো গ্রন্থটি হতে নেয়া হয়েছে। এরূপ আরও বহু উদাহরণের কথা এখানে বর্ণনা করা যাবে। তবে প্রথম তিন শতকের ঐতিহাসিকগণ বিষয় নির্বাচন করেছেন ও ইতিহাস লিখেছেন। ঐতিহাসিকগণের বিষয় নির্বাচনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে যখন কোন কাজের সাথে এর সূত্রের বিষয়টি আমরা মিলিয়ে দেখি। কোন কোন গ্রন্থে কোন অতীত রিপোর্ট বাদ পড়ে যেতে পারে। এরূপটি ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাকের বেলায় করেছিলেন এবং আল তাবারী তাঁর অনেক তথ্য সূত্রের বেলায় করেছিলেন।

এরপরও তথ্য বাছাই একটি খাটুনির কাজ। ইতিহাস লিখা ও তথ্য সংরক্ষণের কাজে আগেকার ইতিহাসবিদগণ যথেষ্ট শ্রম ও মেধা ব্যয় করেছেন। পরের দিকের ইতিহাসবিদগণ আগেকার ইতিহাসবিদদের কাজগুলোকে সংক্ষেপ করে নিয়েছেন। আর এগুলোর সাথে ভাষ্য সংযোজন করেছেন। পরের দিকে যেসব কাজ হয়েছে সেগুলোকে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। ইবনে কাসিরের *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া* বা ইবনে হাজার'র *ফতহুল বারী* পড়লে যে কারো কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ইবনে হাজার'র *ফতহুল বারী সহীহ বুখারীর* ভাষ্য। *মাগাযী* অধ্যায়ে এর বর্ণনা রয়েছে।

এত কিছুর পরও এগুলো দ্বারা মূল বিষয়গুলোকে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় ইতিহাসের মূল বিষয়ের ন্যায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছিল এমন বুঝা যায় না। তবে আধুনিক মান অনুযায়ী পূর্ববর্তী ইতিহাসবিদদের কর্মকাণ্ডকে বিচার করা কি ঠিক হবে?

বর্তমানের অগ্রগতি শিক্ষা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শত বছরের উন্নয়নের ফল। কাজেই পূর্ববর্তীদের কার্যাবলী মূল্যায়নে এ বিষয়টি ভেবে দেখতে হবে।

পূর্ববর্তী মুসলিম পণ্ডিতদের মননশীলতাকে একমাত্র তাদের ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী বিবেচনা করেই মূল্যায়ন করতে পারি না। তাদেরকে মূল্যায়নের জন্য *ফিকহ* ও তুলনামূলক *ফিকাহ (আহাদিস আল আহকাম)* এর ক্ষেত্রে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক অবদানকে বিবেচনায় আনতে হবে। এটা সত্য যে, *ফিকহ'র* গ্রন্থগুলোতে ইতিহাসের মূল বিষয়, মূল বিষয়ের আলোচনা, এগুলোর বৈয়াকরণিক বিশ্লেষণ ও এর মধ্য থেকে প্রাপ্ত বিধিবিধান-এর ওপরই আলোচনা স্থান পেয়েছে। এটা স্পষ্ট যে, মুহাদ্দিস ও ফিকহবিদদের কার্যাবলী পরস্পরের পরিপূরক। এখানে এটাই বলা সবচেয়ে ঠিক হবে যে, রাসূল (সা) এর হাদীসের ব্যাপারে মুসলিম পণ্ডিতগণ ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করেছেন।

উসূল আল ফিকহ্-এর গ্রন্থসমূহে মূল বিষয়গুলোর পুংখানুপুংখ পরীক্ষা নিরীক্ষা করার বিষয়টি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এগুলোর মধ্য থেকে তাদের চমৎকার মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। আগেকার অনেক ইতিহাসবিদ জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে অবদান রাখলেও এসব ইতিহাসবিদের মূল্যায়নের সময় তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সার্বিক অবদানের বিষয়গুলোকেও আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে। ইতিহাসবিদদের বিবেচনায় সময়কে আমাদের হিসাব করতে হবে যাতে তাদেরকে অবমূল্যায়ন করা না হয় (তাদের পূর্বকার অবদান বিবেচনায়)।

আমাদেরকে বিষয়টি স্পষ্ট করে ভাবতে হবে যে, মূল বিষয়ের তাত্ত্বিক আলোচনা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে শতাব্দির প্রথম দিকে হাদীস গ্রন্থের আলোচনা এবং পদ্ধতির গ্রন্থবলীতে *মুদাররাজ, মুয়াল্লাল, মুযতারিব, সাদাহ, মুনকার, মাওযূ* (যে শব্দগুলি দ্বারা কোন বিশেষ হাদীসের সনদ ও মূল বিষয় আলোচিত হয়) এর ন্যায় শব্দাবলীতে পর্যালোচনা করা হয়েছে। সমস্যা হলো ঐতিহাসিক রিপোর্টগুলো হাদীসের ন্যায় তেমনভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় নি। ইতিহাস বর্ণনায় রাসূল (সা)-এর অলৌকিক ঘটনাবলী এবং এর সাক্ষ্য প্রমাণাদি আমাদেরকে বর্ণনা করতে হবে। অনেকগুলো অলৌকিক কর্মকাণ্ডই রাসূল (সা)-এর সময়ে সংঘটিত হয় যদিও কুরআন তাঁর সময়ের চিরন্তন অলৌকিক ঘটনা।

কুরআনের অলৌকিকতাকে স্বীকার করে নিয়ে অন্য কোন কিছুর অলৌকিকতাকে বাতিল করে নেয়ার অর্থ হলো বস্তুবাদী ও ধর্ম নিরপেক্ষ দর্শনের কাছে আত্মসমর্পণ না করা। *সহীহ* সূত্রগুলোর মাধ্যমে তাই প্রমাণিত হয়েছে। মুসলিমদেরকে সম্পূর্ণভাবে বিদেশী হস্তক্ষেপমুক্ত হয়ে অধ্যয়ন করতে হবে ও শিক্ষাবিষয়ক গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এ গ্রন্থে *সহীহ* সূত্রগুলোর মাধ্যমে প্রমাণিত অলৌকিক ঘটনাগুলো যাচাই করা হবে।

এ গ্রন্থে আইন শাস্ত্র (*আল আহকাম আল ফিকহ*) ও এগুলোকে আইন হিসাবে গ্রহণের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। এর কারণ *সীরাত* গ্রন্থের ইতিহাস বর্ণনা করতে

গেলে সাথে এর বিধানিক দিকটির ওপরও আলোচনা করতে হবে। গ্রন্থের নৈতিক ও আইন বিষয়ক আলোচনায় বিধানের বিষয়টিও স্পষ্ট করা দরকার। এর কারণ এটি ব্যক্তি ও সমাজের আন্দোলনকে পরিচালিত করে। নৈতিক ও বিধানগত বিষয় হতে রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয় আলাদা করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে ইসলামি ইতিহাসের প্রথম দিকে এটা মোটেও সম্ভব ছিল না। এর কারণ তখন *আকীদা* ও আইনের বিষয়গুলো সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক সম্পর্কের সাথে পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ছিল । এগুলো একটির সাথে আরেকটি এমনভাবে জড়িয়ে ছিল যে, ঐ সময় ইসলামের চেতনা ও নীতি না বুঝে ইতিহাসের গতিবিধি বুঝা ছিল কষ্টকর।

ব্যক্তি ও সমাজের গতিবিধি এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। ইতিহাসের গতিবিধির বৈশিষ্ট্য ও প্রেক্ষাপট কোন কোন ব্যক্তি ও তাদের প্রভাবের গতিশীল কর্ম তৎপরতার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠে। সমাজের বৃহত্তর আন্দোলনের দাবার গুটি মনে করে ইতিহাস-বিখ্যাত বীরদের ঘটনাবলীকে উপেক্ষা করা যাবে না। কোন কোন ব্যক্তি তাদের নিজস্ব প্রতিভা, কার্যক্ষমতার কারণে সমুজ্জ্বল। ব্যক্তির এসব গুণাবলী তাদের হৃদয়স্পর্শী *আকীদার* কারণেই সম্ভব হয়েছে। তাদের *আকীদা* তাদের কল্পনা শক্তিতে পরিবর্তন এনে দিয়েছে। এ *আকীদা* আরব সমাজ ও ব্যক্তির জীবনে বিরাট পরিবর্তন সাধন করে। এ *আকীদার* কারণে ব্যক্তির গুণগানের অতিবাড়াবাড়ি থেকে দূরে থাকা সম্ভব হয়েছে। রাসূল (সা) ছিলেন সকল বীরদের মধ্যে মহাবীর। তিনি নিজেই আল-াহর সিজদায় রত থাকতেন, তাঁর আরাধনায় মগ্ন হতেন, সকল বিজয়ে আল-াহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করতেন।

সিরাতের কিছু কিছু আধুনিক গবেষণায় যুক্তি খন্ডন করার নিমিত্ত প্রাচ্য গবেষকগণ যে অবতারণা করেছেন পাঠকগণ এর কোন কিছুই এখানে পাবেন না। প্রাচ্যের *সীরাত* প্রণেতাগণ ইচ্ছা করেই সীরাতের মূল বিষয়ের এবং ঘটনাসমূহের ভুল ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। আরবী ভাষার ইসলাম ও ইসলামী আইনসমূহ ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। *সীরাতের* আসল একটি চিত্র উপস্থাপনই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। *সীরাতের* ওপর গবেষণা করতে হলে এর কলেবর পুরো একটি গ্রন্থের বিষয় হয়ে যাবে। পূর্বেকৃত কাজগুলোর সংশোধনের বিরুদ্ধে আমি বলবো না তবে এর ওপর অন্য গ্রন্থগুলোর সংশোধনের বিষয়টি এখানে সম্পন্ন করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস বড় বড় যুক্তি উপস্থাপনের আগে ইসলামের ইতিহাস আলোচনায় সর্ব প্রথম ইতিহাসের পুনর্গঠনের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

আমার মনের আসল ইচ্ছাটা এ গ্রন্থে প্রকাশ করা যাবে না। ইতিহাস বিষয়ক রিপোর্টগুলোর সমালোচনায় মুহাদ্দিসগণের পদ্ধতি অনুসরণ করে এর মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করা হবে। এ গ্রন্থে সনদ ও বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে আলোচনা করা হবে। যে পদ্ধতিতে অনেক বড় পরিসরে রিপোর্ট বাছাই করা হয়েছে, তাতে পূর্বেকার *সীরাত* গ্রন্থ রচয়িতাদের রিপোর্টের বিষয়টি এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণা কর্মটি প্রথম দিকের সমালোচকদের সত্যায়নকৃত রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রিপোর্ট মূল্যায়নে তারা যে পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন তা থেকে ভাল কিছু বের করে উপকৃত হওয়া। যে রিপোর্টগুলো তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা

করেন নি সে পদ্ধতিগুলো থেকেই উপকৃত হওয়ার প্রক্রিয়া করা হয়েছিল। আমার বিশ্বাস পাঠকগণ এর থেকে উপকৃত হবেন আর এর মাধ্যমে *সীরাতের* একটি সার্বিক চিত্র পাবেন।

ধর্ম ও নৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী অনেকগুলো রিপোর্টকে শুধুমাত্র দুর্বল ভিত্তির কারণে আমি বাদ দিয়েছি। *সহীহ* ও *হাসান* রিপোর্টের ভিত্তিতে সীরাতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের একটি সামষ্টিক চিত্র এখানে পাওয়া যাবে। এর জন্য দুর্বল হাদীসের দ্বারস্থ হতে হবে না।

দুর্বল হাদীসগুলোকে এখানে একেবারে বাদ দিয়ে দেয়া হবে না। আমি এ হাদীসগুলোকে ইসলামী তত্ত্ব ও আইনের (*আকীদা ও শরীয়া*) বিচার না করেই গ্রহণ করেছি। *মুহাদ্দিসগণের* নির্ধারিত মানে আমি যখন *সহীহ* হাদীস পাইনি তখনই কেবল দুর্বল হাদীসগুলো গ্রহণে তৎপর হয়েছি। ঐতিহাসিক সমালোচনার ভিত্তিতে এ রিপোর্টগুলোকে যাচাই বাছাই করা হয়েছে।

বাগদাদ বিশ্বাবিদ্যালয়ের কলা অনুষদের স্নাতকোত্তর বিভাগ এবং মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পনের বৎসরেরও বেশী সময় ধরে *সীরাত* বিষয়ে আমি শিক্ষা দান করেছি। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের জন্য আমি আমার লেখা বহুবার সংশোধন করেছি। লেখাগুলোর বেশীরভাগই প্রকাশিত হয়েছে[২]।

আশা করি ভবিষ্যতে এগুলো সংশোধন করে প্রকাশ করা হবে। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের স্নাতকোত্তর ও পিএইচডির থিসিস দেখার পর আমি আমার *সীরাতের* ওপর লেখা অধ্যায়ের সংশোধন করেছি। আমি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে *সীরাতের* ওপর প্রকাশিত রিপোর্টগুলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে বলেছি এবং মুহাদ্দিসগণের সমালোচনামূলক পদ্ধতি অনুসারে সেগুলোকে যাচাই করতে বলেছি। *সীরাতের* সব রিপোর্টের বেলাতেই এ নিয়ম প্রয়োগ করা হয়েছে। *হাদীস*, ইতিহাস, জীবনীগ্রন্থ ও সাহিত্যের গ্রন্থগুলোতে এ পদ্ধতির কথা উলে-খ করা হয়েছে। এ সব নিয়ম কানুন থিসিসের পাঁচশ'রও বেশী পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

এ থিসিসগুলো আমার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে। এর জন্য গত ছয় বছরে আমি *সীরাত* গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করেছি। এগুলোকে যাচাই বাছাই করার কাজও করেছি। ইতোমধ্যে আমার তত্ত্বাবধানে অনেকগুলো অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত হয়েছে। আশা করি *সীরাত* লেখকগণ আরও গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্লেষণমূলক গবেষণার কাজ করতে পারবেন। বুদ্ধিজীবীগ ও এ বিষয়টির ওপর কাজ করতে পারেন। নতুন প্রজন্মের জন্য *সীরাতের* উন্নয়নে এবং প্রজন্মের কল্যাণ সাধনে বর্তমান প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সীরাতের কার্যক্রম যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। আত্মার বিষয় আর বুদ্ধিই মানুষের ধ্যান-ধারণাকে সমৃদ্ধ করে এবং মানুষের দেহাবয়বকে পরিপুষ্ট করে। এটি ছাড়া আগামীর মানুষ হবে আত্মা ছাড়া খালি দেহের অন্তঃসারশূন্য মানুষ।

ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের এই পশ্চাদমুখিনতার কারণে নতুন প্রজন্ম তাদের আত্মিক সমৃদ্ধির জন্য পশ্চিমা বুদ্ধিবৃত্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এভাবে শতাব্দীর

পর শতাব্দী নতুন প্রজন্ম প্রাণহীন জড়বাদে আবিষ্ট হয়। এ জড়বাদিতা আল্লহভীরুতা থেকে প্রজন্মকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহী করে তুলেছে এবং বর্তমানে তাদেরকে ধর্মনিরপেক্ষ দর্শনে আসক্ত করে তুলছে। আজকের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ঝুঁকি যা পশ্চিমা সমাজ আমাদের মাঝে গড়ে তুলছে তা আর কিছুই নয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সে বিষবৃক্ষই তাকে পুষ্ট করে তুলছে। ইউরোপের কুপ্রভাব থেকে আমাদের প্রজন্মকে বাঁচানোর জন্য আমাদের বুদ্ধিজীবীগণকে এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমান প্রজন্মকে আমরা ইসলাম আর ইসলামী দর্শনের মাধ্যমে রক্ষা করতে পারি। এর মাধ্যমেই বস্তুবাদের বিপদ থেকে প্রজন্মকে সুরক্ষা সম্ভব।

আল্লাহর কাছে আমার কাজগুলোকে ভাল কাজ হিসেবে এ জীবনে এবং মৃত্যুর পরেও কবুলের জন্য দোয়া করছি। আল্লাহই আমাদের আশা, তাঁর কাছেই আমাদের সব আরাধনা। আমাদের আরাধনা হলো ঃ "*আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।*"

ডঃ আকরাম জিয়া আল উমরী
মদীনা মনোয়ারা

পাদটীকা ঃ

1. *গুস্তাভ লিবন, Hadarat al Arab (The Civilization of the Arabs) p. 26*
2. They include : *Awwal Dustur A'Lanahual Islam, Dirasah Kitabahu (SAAS) bayna al Muhajirun waa l Ansar wa al Yahud fi al Madinah, (The first constitution announced by Islam, a study of the Prophet's document between the Muhajirun, the Ansar and the Jews in Madinah), published in Majallat Kuliyat al Imam al A'zam (the magazine of the college of the Great Imam), 1972*

   Ahl al Suffah, publ. in Majallat Kuliyat al Dirasat al Islamiyah (the magazine of the College of Islamic Studies), 1968.

   Musa ibn 'Uqbah, one of the early pioneers of Majallat Kuliyat al Dirasat al Islamiyah, 1967.

   Nazrah fi Masadir wa Dirasat al Sirah al Nabawiyyah, (A Glimpse at the Sources and Study of al Sirah al Nabawiyyah), publ. in Majallat Kuliyat al Dirasat al Islamiyah, 1970.

অধ্যায় ১

জিহাদের বিধান

জিহাদ একটি ইসলামী বিধান। আল্লাহর *শরীয়া* প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহর পথে যুদ্ধের নামই *জিহাদ*। ইসলামের লক্ষ্য অর্জনই *জিহাদের* উদ্দেশ্য। রাসূল (সা)-এর মক্কী যামানায় *জিহাদ*-এর বিধান চালু হয়নি। তখনো *মুশরিকদের* বিরোধিতা করা বা তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের জন্য বলা হয়নি। তখন মুসলিমদের জন্য এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় ঃ

> ...তোমরা তোমাদের হস্ত সংবরণ কর, *সালাত* কায়েম কর এবং *যাকাত* দাও। (৪ ঃ৭৭)

ইসলাম প্রচারের মিশন যখন নতুন অবস্থায় তখন মুসলিমগণ এ পদ্ধতি অবলম্বন করে। চারাগাছ যেমন তার পুষ্টি ও মযবুত শিকড় গজানো ও পরিবেশের মোকাবেলার জন্য পানির প্রয়োজন অনুভব করে তেমনি ইসলামের প্রথম যুগে মুসলিমগণ এরূপ পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ঐ সময়ে তারা তলোয়ার দিয়ে *মুশরিকদের* মোকাবেলা করলে *মুশরিকরা* ইসলামকে প্রথম অবস্থাতেই সমূলে ধ্বংস করে দিত।

মুসলিমগণ ঐ মুর্হূতে বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিল। তারা তখন ধৈর্যের সাথে *মুশরিকদের* নির্যাতন সহ্য করে তাদের প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যান, আর আল্লাহর বন্দেগীর মাধ্যমে তাদের ঈমানের শক্তি বাড়াতে থাকেন। নিজেদের *নফসের* বিরুদ্ধে লড়াই করে যেতে থাকেন আর অন্যদেরকে ইসলামের *দাওয়াত* দিতে থাকেন এবং তাদের সংখ্যা বাড়াতে থাকে। ঐ সময়ে *মুশরিকদের* তুলনায় মুসলিমদের সংখ্যা এতই নগণ্য ছিল যে, ইসলাম কবুল করার সাথে সাথে একই বিশ্বাসের মানুষদের সাথে মিশতে পারার কোন সুযোগ তাদের ছিল না। এ সময়ে তারা ইসলামের শিক্ষা গ্রহণে *দার-আল-আরকাম* ও অন্যান্য স্থানে মিলিত হতেন। ঐসময়ে *জিহাদকে* আবশ্যকীয় করা হলে তখন ইসলাম কবুলকারীদের সাথে প্রতি ঘরে ঘরে লড়াই বেধে যেত। মুসলিমগণ মদীনায় হিজরত করলে *আনসারগণ* তাদেরকে সমর্থন করেন। এভাবে দারা তাদের অধীনে একটি ভূ-খন্ডের মালিক হন। তখন মুসলিমদেরকে আল্লাহ *জিহাদ* করার নির্দেশ দেন। প্রথমে নিজেদের রক্ষার্থেই *জিহাদের* অনুমতি দেয়া হয়।

> যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সমর্থ। (২২ ঃ ৩৯)

এরপর আত্মরক্ষাও তাদের ঈমান রক্ষার্থে মুসলিমদেরকে লড়াইয়ের অনুমতি দেয়া হয়।

> যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। কিন্তু সীমা লংঘন করো না। আল্লাহ সীমা লংঘনকারীকে ভালবাসেন না। (২ ঃ ১৯০)[১]

এটা ছিল *জিহাদের* বিধানের দ্বিতীয় পর্যায়। মানব সমাজের যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে এসবের বিবেচনায় *জিহাদ* ভিন্নতর। কোন ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠির জন্য এ *জিহাদ* রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে নিয়োজিত।

যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না (২৮ ঃ ৮৩) তাদের *জিহাদের* লক্ষ্য সত্যের বাধ্যবাধকতা, ন্যায় বিচার ও দয়া প্রদর্শনের শর্তে *জিহাদকে* অন্যান্য সকল যুদ্ধ থেকে আলাদা করে দিয়েছে। আল্লাহর কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

> "যারা মু'মিন তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং যারা *কাফির* তারা সংগ্রাম করে তাগুতের পথে; সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর; শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল।" (৪ ঃ ৭৬)

এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন -

> আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে লড়াই কর, সামরিক অভিযানে অংশ গ্রহণ কর তবে লুণ্ঠনে শরীক হইয়ো না। তোমরা শপথ ভংগ করো না, বা কারো অংগহানি বা শিশু হত্যা করো না।[২]

এরপর আসে তৃতীয় পর্যায়। মুসলিমদেরকে এ সময়ে *মুশরিকদের* বিরুদ্ধে লড়াই করতে নির্দেশ করা হয়েছে, ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে মুসলিমদের সকল বাধা দূর করে দুনিয়ায় সুযোগ করে নেয়ার জন্য লড়াইয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। *মুশরিকরা* যাতে মুসলিমদেরকে কোন অত্যাচার করতে না পারে বা তাদের ঈমান গ্রহণে কোন সমস্যার সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য তাদেরকে *মুশরিকদের* বিরুদ্ধে লড়াই করতে অনুমতি দেয়া হয়েছে ঃ

> এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না *ফিতনা* দুরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যদি তারা বিরত হয় তবে তারা যা করে আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। (৮ ঃ ৩৯)
>
> "তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেয়া হলো যদিও তোমাদের নিকট ইহা অপ্রিয়; কিন্তু তোমরা যা পছন্দ কর না সম্ভবত তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা পছন্দ কর সম্ভবত: তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। (২ ঃ ২১৬)
>
> যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না ও পরকালেও নয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে *জিয্‌য়া* দেয়। (১০ ঃ ২৯)

জিহাদ ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। *জিহাদের* মাধ্যমে মুসলিমগণ তাদের সবচেয়ে বড় লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করে। এর মাধ্যমে দুনিয়ার সর্বত্র তারা ইসলাম কবুলের স্বাধীনতা অর্জন করে। ইসলামের প্রসারে তাদের রাজনৈতিক ও সামরিক আধিপত্য অর্জন করে আর নিজেদের রক্ষায় কার্যকর পন্থা অবলম্বন করে। বল প্রয়োগে ব্যক্তি পর্যায়ে ইসলাম কবুল করানো সম্ভব নয়।

ইসলামে কোন জোরজবরদস্তি নেই। (২ ঃ ২৫৬)

ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে ইসলামকে সংহত করতে হবে এবং দুনিয়াব্যাপী এর সমর্থনকারীদেরকে রক্ষা করতে হবে। ইসলামকে দুনিয়ার সব রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির ওপর শ্রেষ্ঠ করে গড়ে তুলতে হবে। চৌদ্দশত বছরপূর্বে যেখানে ইসলাম প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল সেখানে ইসলামের অবদানকে সংহত করে তুলতে হবে। ঐ সময়ে দেশের সরকার জনগণকে ইসলাম কবুলে নিষেধ করতো। মক্কার কুরাইশগণ মুসলিমদেরকে নির্যাতন করত। পার্সীয়ান ও বায়জেন্টাইনের মানুষেরাও এদের ওপর নির্যাতন চালায়। আরব উপদ্বীপে সিরিয়া ও মিশর সীমান্তের লোকজন এরূপ অত্যাচার চালাতো। কুরআনে এটা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, *জিহাদের* বিষয়টি কোন সামরিক বিষয় নয়। রাসূল (সা)-এর *হাদীস* অনুযায়ী মুসলমানদের জন্য এটা ফরজ।

> পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত *জিহাদ* মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক। যে মৃত্যুবরণ করলো অথচ আল্লাহর রাস্তায় *জিহাদ* করলো না বা *জিহাদের* জন্য কোন সংকল্পও ব্যক্ত করলো না সে যেন *মুনাফিক* হিসাবে মৃত্যুবরণ করলো।[৩]

ফিকহের গ্রন্থে *জিহাদের* বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। *জিহাদের* বিভিন্ন বিধি-বিধানের আলোচনা করা হয়েছে। *সালাত, সাওম, হাজ্জ, যাকাতের* ন্যায় বিষয়টি ফিকহ শাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে। ইসলামের অন্যান্য রোকনের ন্যায় মুসলিমদের জন্য *জিহাদও* একটি গুরুত্বপূর্ণ রোকন।

জিহাদের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর সবগুলো গ্রুপ একতাবদ্ধ হয়েছে ও শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের শক্তি নিয়োজিত করেছে। মুসলিমদল যেখানেই গিয়েছে সেখানেই তারা মানুষকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়ার আহবান জানিয়েছে। আল্লাহর ইবাদত করার দিকে আহবান করেছে, জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে সমানভাবে সম্মান দেখাতে শিখিয়েছে। ইসলামের সুমহান আদর্শ আর আহবান মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছে। ইসলামের আহবান তলোয়ারকে জয় করেছে। ইসলামের বিজয়ের এটাই রহস্য। এটাই বিজয়ের মূল কারণ।

ইসলামের বিজয় অভিযানের বহু কারণের কথা বলা হয়েছে। দ্রুত ও সফল বিস্তারের বহু কারণের উল্লেখ হয়েছে। ঐতিহাসিক সিতানী ও অন্যান্য পশ্চিমাদের মতে এর কারণ অর্থনৈতিক। তাদের মতে আরব উপদ্বীপে খরা আর আবহাওয়ার ন্যায় বিরূপ পরিবেশের কারণে লোকেরা গরীব এলাকা থেকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সমৃদ্ধশালী এলাকায় দেশান্তরিত হয়। *ফুতাহাত* ছিল এরূপ একটি অভিযান। গবেষণা করলে দেখা যাবে ইসলামের পূর্বে আরব উপদ্বীপে আবহাওয়ার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এ ছাড়া এ অঞ্চলে তখন কোন অর্থনৈতিক বিপ্লবও ঘটেনি। আরবের লোকেরা ইসলামের পূর্বে এত বিরাট আকারে দেশ ত্যাগ করেনি। ইসলামের আবির্ভাবের কারণেই তারা ইসলামের পতাকা তলে সমবেত হয় আর ইসলামের নীতি ও আদর্শের অনুসরণ করে। খলিফা ও *ফুতাহাত* নেতাদের মধ্যে বিনিময়কৃত পত্রের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, ধর্মীয় বিশ্বাস আর আদর্শই সামরিক বাহিনীর মধ্যে বিশ্বাস ও আদর্শকে সমুন্নত রেখেছে এবং তাদের মধ্যে শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করেছে। যে চেতনা নেতাদেরকে পরিচালিত করেছে, যে মহান আদর্শ সেনাবাহিনীকে পরিচালিত করেছে সে আদর্শই বিশেষ করে বেদুঈনদের মধ্যে ও ইসলামের প্রসার ঘটিয়েছে। এসব সত্ত্বেও *ফুতাহাতের* প্রসার এবং সাধারণ চেতনায়

উদ্বুদ্ধ নেতৃবৃন্দ যে বিষয়ে অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলেন তা কোন বেদুঈন যোদ্ধাদের কারো কারো ব্যক্তিগত মনোভাবের কারণে সংগঠিত হয়নি। এ সমাজের নেতৃবৃন্দ তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ও উদগ্রীব ছিলেন, এখানে যুদ্ধে লব্ধ গণিমত তাদের মধ্যে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি।

মুক্ত দেশের অধিবাসীদের ওপর থেকে মুসলিম মুক্তিদাতাগণ করভার হ্রাস করেছিল। মুক্তিপ্রাপ্তদের কাছ থেকে তারা কোন সম্পদ দখল করেনি। বিজিত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে পূর্বাবস্থাতেই রাখা হয়েছিল। গঠনমূলক চেতনার মাধ্যমে তাদের পরিকল্পনা পরিচালিত হয়েছিল।

ইসলামের প্রসারের জন্য রাজনৈতিক উপাদানের ভূমিকাও আছে। রাসূল (সা) ও *খোলাফায়ে রাশেদিন* এ সময় নওমুসলিমদের স্বধর্ম ত্যাগের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাঁরা মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন। এ কাজে তাঁরা তাদের শক্তি ইসলামের কাজে নিয়োজিত করেন। তা না করা হলে ইসলাম প্রচারে সমস্যার সৃষ্টি হতো। পরিস্থিতির এরূপ ব্যাখ্যা ইসলাম প্রচারের জন্য ইতিবাচক হলেও *জিহাদের* বিধানের জন্য এটা ছিল বুদ্ধিদীপ্ত কাজ। তবে ইসলামের প্রসারের জন্য এটা পুরোপুরি কোন উদ্দীপনার কাজ ছিল না। এ সময়ে সবচেয়ে বেশী সমস্যার সৃষ্টি হয় আবুবকর (রা) এর সময়ে বেদুঈন *মুরতাদদের* ইসলাম পরিত্যাগের ফলে। আবুবকর তাদেরকে রাষ্ট্রের অধীনে নিয়ে আসার পর তাদেরকে সামরিক বাহিনীতে যোগদানে নিষেধ করেন এবং শাস্তি স্বরূপ তাদের অস্ত্র কেড়ে নেন। তাদের আনুগত্যের ব্যাপারে এবং তাদের ইসলামী আচরণ ও পরিপূর্ণ ইসলামী ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন বিধায় তাদের ব্যাপারে এরূপ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। মুক্ত জনপদের মধ্যে এ পরিস্থিতিতে ইসলামের প্রকৃত চিত্র দেখা যেত না। আবু বকর (রা) মদীনা, মক্কা ও তায়েফের লোকজনের ওপর বেশী নির্ভর করতেন। এ স্থানের জনপদে নীতিবোধ ও ইসলামের ওপর প্রজ্ঞা ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। এ সময়ে সেনাবাহিনীর নিমিত্ত *সাহাবীদের* মধ্য হতে নেতা গ্রহণ করা হতো।

এ সময়ে *ফুতাহাতের* পেছনে আরও একটি যুক্তির কথা বলা হয়। *ফুতাহাত* ছিল আত্মরক্ষামূলক। ইসলামী রাষ্ট্রকে তার শক্তিশালী শত্রুদের হাত থেকে রক্ষার জন্য *ফুতাহাতের* প্রয়োজন ছিল। বেশীর ভাগ আরব আর মুসলিম ঐতিহাসিক এ ধারণাই পোষণ করেন। তাদের এ ধারণা ছিল বিংশ শতাব্দীর ধারণার মত, নিন্দনীয় যুদ্ধের আদর্শের ন্যায়, মানব সভ্যতা ধ্বংসকারী কর্মকান্ডের ন্যায়, উদ্বাস্তু সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ডের অনুরূপ। এরূপ কর্মকাণ্ড জাতিসমূহের বিভিন্ন স্বার্থ রক্ষণাবেক্ষণে সৃষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহকে জন্য ক্ষতিগ্রস্থ করে। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ যুদ্ধের বদলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

ফুতাহাতের ওপর অনেক লোককে *জিহাদের* চেতনায় বর্তমান যামানার প্রেক্ষাপটে নমনীয় মনোভাব গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে। পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কারণই লেখকদের এরূপ মর্মপীড়ার কারণ। বেশীর ভাগ শিক্ষিত মুসলিমানের মনে পশ্চিমা ধ্যানধারণাও এর কারণ। এ আধিপত্যের সূত্রপাত হয় বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণের কারণে। এ বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ মুসলমানদেরকে পশ্চিমাদের মুখোমুখী করে দিয়েছে।

এর জন্য পশ্চিমা সভ্যতার চেতনা এবং এর বুদ্ধিবৃত্তিক ও মননশীল ধারণার সাথে ইসলামের সাংঘর্ষিক অবস্থার সৃষ্টি করে। আরেকটি সমস্যা হলো *জিহাদের* উদ্দেশ্য ও এর যথার্থতা সম্পর্কে বুঝতে না পারা। মুসলমানগণ এটা বুঝতে পারে না যে, ইসলামকে জোর করে চাপিয়ে দেয়া যায় না বরং ইসলাম প্রচারে যে সব বাধা রয়েছে তা দূর করাই *জিহাদের* উদ্দেশ্য। সে জন্য প্রয়োজনে ইসলাম প্রচারে বাধা দানকারী রাজনৈতিক শক্তিকে দূর করতে হবে, না হয় ধ্বংস করে দিতে হবে যাতে মুসলিমগণ জয়ী হয়ে অমুসলমানদের নির্যাতনকে প্রতিহত করতে পারে।

জিহাদ ও মানুষের মধ্যে জোর করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার বিষয়টি প্রথম দেখা যায় প্রাচ্যের ইতিহাসসমূহে। এ সব ইতিহাস অপপ্রচার আর মিথ্যা বর্ণনায় ভরপুর। সত্য ঘটনা বর্ণনায় এগুলো প্রচার করতে হবে। কুরআনে এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষ স্বাধীনভাবে ধর্ম হিসাবে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে বা ইচ্ছে করলে খ্রিস্টান ধর্ম বা ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করতে পারে। তারা কোন ইসলামী সমাজে থেকে বা ইসলামী রাষ্ট্রে থেকেও তাদের ধর্ম গ্রহণের এ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। কুরআন ও সঠিক ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ইসলামের কারণে বায়জেন্টাইন ও পার্সীয়ান আধিপত্যবাদীদের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া মানুষ ইসলামের বিধানকে স্বাগত জানিয়েছে। মিশর ও সিরিয়ার খ্রিস্টানরা ইসলামের প্রদত্ত স্বাধীনতাকে স্বাগত জানায়। যদি ইসলামের এ ঘোষণা সত্য না হতো তা হলে মুসলিম সমাজে সংখ্যালঘুরা হারিয়ে যেত এবং সংখ্যালঘুরা আর বাঁচতে পারতো না। ইসলাম প্রচারের চৌদ্দশত বছরপরও সংখ্যালঘুরা যেভাবে বেঁচে আছে ইসলামের উদারতা না থাকলে তা সম্ভব হতো না।

ফুতাহাতকে আত্মরক্ষামূলক পন্থা হিসেবে উপস্থাপন করা অনুশোচনামূলক পদ্ধতি ছাড়া আর কিছু নয়। *ফুতাহাতের* এ অবস্থা কঠিন যুক্তির কাছে ধোপে টিকে না। আন্দালুশিয়া বা ট্রান্সঅক্রিয়ানার লোকেরা কি দেশ জয়ে মুসলিমদের দেশের সীমান্ত অতিক্রম করছে? সীমান্তে সুযোগ পেয়ে কি তারা এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার দেশগুলোর গভীরে ঢুকে পড়তে পারে? এ সব দেশে আরব উপদ্বীপের দেশগুলোর চাইতেও অনেক ভয়াবহ ও চূড়ান্ত পর্যায়ের যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। এসব যুদ্ধের মধ্যে দক্ষিণ ফ্রান্সের পয়টারে ট্যুর-এর যুদ্ধ, ক্রিয়েট ও দক্ষিণ ইটালীর বিজয়, ট্রান্সঅক্রিয়ানায় তালাজ নদী তীরে তিরাজের যুদ্ধ, অবশেষে ভিয়েনা দখলের যুদ্ধের উল্লেখ করা যায়।

ফুতাহাতের আসল ব্যাখ্যা হলো *জিহাদের* মাধ্যমে ধর্মীয় দায়িত্ব পালন। রাসূল (সা) এ *জিহাদকে* ইসলামের শীর্ষ কাজ বলে অভিহিত করেছেন।

পাদটীকা :

১. *সাবাব আল নুযুলের* জন্য দেখুন, আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল মুসনাদ* ৭/১২২। দেখুন আরো দেখুন : ইবন আল কাইয়্যম।
২. *হাদীস*, সহীহ মুসলিম, ৩/১৩৫৭।
৩. মুসলিম, ইবনে আল হাজ্জাজ, *সহীহ*, ৩/১৫১৭।

অধ্যায় ২

জিহাদের শুরু

জিহাদের প্রথম কাজগুলো ছিল যুদ্ধ (*গাজওয়া*) এবং মদীনার পশ্চিমের বিভিন্ন স্থানে পরিচালিত ছোট ছোট অভিযান *(সরিয়্যা)*। যুদ্ধ ও অভিযানের তিনটি ছিল মূল লক্ষ্য ঃ

০১. মক্কার অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে তোলার লক্ষ্যে সিরিয়ার বাণিজ্য পথকে হুমকিপূর্ণ করে তোলা।

০২. মুসলিম ও কুরাইশদের মধ্যেকার বিবাদের সময়ে সমর্থন বা নিরপেক্ষতা আদায়ের লক্ষ্যে ঐ এলাকায় বসবাসকারী বিভিন্ন গোত্রের সাথে শান্তি চুক্তি ও সন্ধি স্থাপন করা। পরিকল্পনাটি ছিল মুসলিমদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এরূপ চুক্তি সম্পাদন তাদের জন্য ছিল একটি সাফল্য। এর কারণ, মূলত এ গোত্রগুলো ঐতিহাসিকভাবে মিত্রতার অংশ হিসাবে কুরাইশদেরকে আনুকল্য দেখাতো। কুরআনে এ ব্যাপারে *ইলাফ* (নিরাপত্তার চুক্তি) বা চুক্তির (১০৬ ঃ ১) কথা বলা হয়েছে। এ চুক্তির মাধ্যমে কুরাইশরা বাণিজ্যের জন্য সিরিয়া ও ইয়েমেনের কাছ থেকে নিরাপত্তা কামনা করে। কাবাগৃহের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে গোত্রগুলো কুরাইশদেরকে খাতির করতো। কুরাইশদের কাবাগৃহে সব গোত্র মূর্তিপূজা করতো। ধর্মীয় উপাসনা করতো। বিভিন্ন গোত্র ও কুরাইশরা ইসলামের বিরোধিতায় একই ধর্ম বিশ্বাসে কাজ করতো। মুসলিমরা এ পরিস্থিতিতে এসব গোত্রের সাথে চুক্তি করতে পারতো এবং বিবাদের সময়ে তাদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারতো। ঐ সময়ে মুসলিমদের জন্য এটা ছিল একটা বিজয়।

০৩. ইহুদী ও কুরাইশদের বিরুদ্ধে মদীনার মুসলিমদের শক্তি প্রদর্শন শুধু মদীনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তারা এখন আশেপাশের এলাকা ও বিভিন্ন গোত্রের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও বিভিন্ন স্বার্থ ও সম্পর্কের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ লাভ করে। প্রথম অভিযানটি ছিল আবওয়ার যুদ্ধ (*গাযওয়া আল আবওয়া*)[১]। এ যুদ্ধটি আবার *গাযওয়া উদ্যান* নামেও পরিচিত। এখানে ছিল দু'টো যুদ্ধের স্থান। ছয় বা সাত মাইলের ব্যাবধানে ছিল স্থান দু'টো। আবওয়া ছিল মদীনা থেকে আনুমানিক চৌদ্দমাইল দূরে। এ *গাযওয়া* অভিযানের সময় কোন যুদ্ধ সংগঠিত হয়নি। তবে এ সময়ে বানু দামা'র (কিনান হতে) সাথে একটি শান্তি চুক্তি স্থাপিত হয়। হিজরীর দ্বিতীয় সনের ১২ সফর এ *গাযওয়া* সংঘটিত হয়। মাদায়নির রিপোর্ট মোতাবেক[২] রবিউল আউয়াল পর্যন্ত সৈন্যবাহিনী মদীনার বাইরে অবস্থান করতে থাকে।[৩]

উরওয়া ইবনে আল জুবায়ের বলেন, উবায়দাহ ইবনে আল হারিস ষাট সদস্য সমন্বয়ে আল-আবওয়া হতে একটি অভিযান পরিচালনা করেন।[৪] ইবনে ইসহাক বলেন, মদীনায় ফিরে আসার পর সাইফ-আল বাহারে অভিযান পরিচালিত হয়। একটি কুরাইশ কাফেলার গতিরোধ করার জন্য হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে ত্রিশ সদস্য সমন্বয়ে আরেকটি অভিযান পরিচালিত হয়। তবে দু'টো অভিযানেই কুরাইশরা যুদ্ধে জড়ায়নি। এর কারণ হামযার অভিযানের সময়ে উভয় গোত্রের সাথে পূর্বে কৃত চুক্তির জন্য তারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে। উবায়দার অভিযানের সময় মুসলিম ও কুরাইশদের মধ্যে তীর ধনুকের যুদ্ধ হয়।[৫]

এটা সত্য যে, প্রথম দিকে দুটো অভিযানই পরিচালিত হয় কুরাইশদের বাণিজ্যকে হুমকিগ্রস্ত করার জন্য। কুরাইশদের প্রতি এটা ছিল প্রথম হুমকি যে, ইসলামের প্রতি তাদের একগুঁয়ে মনোভাব দূর না করলে তাদের অবস্থা খারাপ হবে। রবিউস সানিতে মুসলিমরা বিভিন্ন বাণিজ্য পথে তাদের অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখে। ইয়ানবুর কাছে রিদায় দু'শ যোদ্ধার সাথে বুয়াতের যুদ্ধ *(গাযওয়াবুয়াত)* সংগঠিত হয়। এ যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলায় বাধা দান করা। আশিয়াযর যুদ্ধ *(গায্ওয়া আল আশিয়াহ)* (ইয়ানবু) সংগঠিত হয় জমাদিউল আউয়ালে। রীদা ও আল আশিরায় কোন যুদ্ধ সংগঠিত হয়নি তবে জুমাদিউল উখরায় বানু মুদলাযের সাথে আশিরায়[৬] একটি শান্তি চুক্তি স্থাপিত হয়। আশিরার পরপরই কারাজ ইবনে জাবির আল ফিহরি মদীনার বাইরে উট ও গরু ছাগল চুরি করতে আসে। রাসূল (সা) বদরের কাছাকাছি সাফওয়ানে তাকে আক্রমণ করেন। এটিকে বদরের প্রথম যুদ্ধ বলা হয়। কারাজ এ আক্রমণ থেকে বেঁচে যায়[৭]। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে মুসলিমরা তাদের প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে। এভাবে মুসলিমদের অভিযান অব্যাহত থাকে। মুসলিমরা শুধু সিরিয়ার সাথেই কুরাইশদের ব্যবসায় বাণিজ্যে বাধা দান করেনি তারা ইয়েমেনের সাথেও কুরাইশদের বাণিজ্য পথে বাধা দান করে।

কুরাইশদের খুঁজে বের করতে এবং তাদের শক্তি নিরূপণের লক্ষ্যে রজব মাসের শেষ দিকে মক্কা নগরীর দক্ষিণে অবস্থিত নাকলায় আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ-এর নেতৃত্বে আট মুহাজিরের একটি অভিযান পরিচালিত হয়। এখানে তারা কুরাইশদের একটি বাণিজ্য কাফেলার গতিরোধ করে ঐটি দখল করে নেয় এবং এর নেতাকে হত্যা করে। এ কাফেলার দু'জনকে বন্দী করে মদীনায় নিয়ে আসে।[৮] এ ঘটনাটি পবিত্র মাসে সংগঠিত হয়। এ ঘটনায় *মুশরিকরা* বিরাট হট্টগোল বাধায়। তাদের মতে মুসলিমরা পবিত্র মাসের নিষেধাজ্ঞা লংঘন করে। এ ঘটনা নগরবাসী ও যাযাবরদের উপর বিরাট প্রতিক্রিয়া করে। এর কারণ এতে আরব উপদ্বীপে ইসলামের পূর্ব হতে প্রতিষ্ঠিত একটি ঐতিহ্য ভঙ্গ হয়। তবে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ এ মারাত্মক লংঘন সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং সাহাবীদের সাথে আলাপ করে তিনি লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নেন।

তিনি মদীনায় ফিরে গিয়ে যুদ্ধে প্রাপ্ত মালামাল রাসূল (সা) এর কাছে হস্তান্তর করতে চাইলে তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান আর বলেন, "আমি তোমাদেরকে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছি। কুরাইশরা প্রচার করছে যে, মুহাম্মদ ও তার সাহাবীগণ পবিত্র মাসের অঙ্গীকার ভংগ করেছে, রক্তারক্তি করেছে, মানুষের সম্পদ লুট করেছে, এ মাসে মানুষদেরকে কারারুদ্ধ করেছে।"

এ সময়ে কুরআনের নাযিলকৃত আয়াতে মুসলিমদের অবদানকে স্পষ্ট করা হয়েছে। এরপর রাসূল (সা) যুদ্ধে লব্ধ গণিমত গ্রহণ করেন এবং কুরাইশদের মুক্ত করে দেন দু'বন্দীকে আল্লাহ বলেন,

> পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, বলুন, 'উহাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দান করা, আল্লাহকে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে বাধা দেয়া এবং এর বাসিন্দাকে তা থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহর নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়; ফিতনা হত্যা অপেক্ষা ভীষণতর অন্যায়। (২ঃ২১৭)

মুসলিমদেরকে কুরাইশদের নির্যাতনের বিষয়টি এবং মক্কা থেকে তাদেরকে বের করে দেয়ার বিষয়টি যে "পবিত্র মাসে"[৯] যুদ্ধ করার চেয়ে বেশী খারাপ ছিল তা কুরআনের আয়াতটিতে বর্ণনা করা হয়েছে। মুসলিমদের সাথে কাজকারবারে কুরাইশরা বিভিন্ন ঐতিহ্যগত আচার আচরণের ধারক বাহক হওয়া সত্ত্বেও কেন সেগুলো তারা ব্যবহার করেনি?

কোন কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত মুসলিমদের দ্বারা *মুশরিকদের* বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণকে দস্যুর কাজ বলে অভিহিত করে। এসব সন্দেহের মূলে বলা হয় যে, মুসলিমরা কুরাইশদের সাথে যুদ্ধাবস্থায় ছিল, তারা কুরাইশদের মানবিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করতে চেয়েছিল। যুদ্ধের সময় এগুলোর প্রয়োজন ছিল। যুদ্ধের আরেকটি কারণ ছিল মুসলিমগণ মক্কা থেকে হিজরত করে আসার সময় কুরাইশরা তাদের সম্পত্তি লুটপাট করে। বর্তমান যামানাতেও যুদ্ধের সময় মানবিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের ওপর আক্রমণের বিষয়টি স্বীকৃত।

রজব মাসের আরেকটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখযোগ্য, কেননা মুসলিমদের স্বকীয়তা ও সালাতের কিবলা নির্ধারণের স্বাধীনতার বিষয়টি এসময়ে ঠিক করা হয়। এ সময়ে মুসলিমদের *কিবলা* বায়তুল মোকাদ্দাস (জেরুসালেম) থেকে কাবার (মক্কা) দিকে নির্ধারিত হয়।

পদটীকা ঃ

১. জায়েদ ইবনে আরকাম বর্ণিত *সহীহ্ বুখারীর* এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, প্রথম *গাজওয়া* ছিল আল আশিরার যুদ্ধ। ইবনে ইসহাকের রিপোর্টের সাথে আল হাফিয ইবনে হাযার একমত হয়ে বলেন যে, জায়েদ ইবনে আরকাম আল আশিরার যুদ্ধকে প্রথম যুদ্ধ বা গাজওয়া বলে বর্ণনা করেছেন, যে যুদ্ধে জায়েদ ইবনে আরকাম অংশগ্রহণ করেছিলেন। *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৩/১৪৬

২. খলিফা ইবনে খায়্যাত আল উসফুর, *আল তারিখ*, ৫৬

৩. ইবনে হাজার আল আসকালানী *ফুতহুল বারি* ৭/২৭৯/ খলিফা: *আল তারিখ* ৫৬, ইবনে ইসহাকের একটি রিপোর্ট হতে বর্ণিত, এটির কোন সনদ নেই।

৪. ইবনে হাজার, *ফতহুল বারি*, ৭/২৭৯

৫. খলিফা, *আল তারিখ* ৬১-৬২, আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালিক ইবনে হিশাম আল হিমিয়ারী, *আল সিরাহ আল নাবাওয়িয়াহ* ১/৫৯১-২, সনদ ছাড়া ইবনে ইসহাক বর্ণিত একটি রিপোর্ট হতে উদ্ধৃত। আল উমওয়াবী, *মাগাযী*, এটিও সনদ ছাড়া উদ্ধৃত। *ফতহুল বারি* ৭৬/২৭৯ এ বর্ণিত।

৬. খলিফা, *আল তারিখ*, ৫৭, সনদ ছাড়া ইবনে ইসহাকের মাধ্যমে বর্ণিত।

৭. পূর্বোক্ত।

৮. পূর্বোক্ত, ৬৩, *হাসান* সনদ সহকারে উরওয়ার রিপোর্টের *মুরসাল* হতে গৃহীত।

৯. ইবনে হিশামের *আল সিরাহ*, ১/৫৯-৬৯, উরওয়ার *মুরসাল হাদীস* হতে গৃহীত। আল বায়হাকী আবু বকর আহমাদ ইবনে আল হুসায়েন ইবনে আলী *আল সুনান আল কুবরা*, ৯/১২, ৫৮-৯, উরওয়া-এর *সহীহ সনদ* সহকারে বর্ণিত। *হাসান* বা অন্য *সনদ* সহকারে তাবারানীতে একই রিপোর্ট বর্ণিত। (দেখুন, *আল ইসাবাহ* ২/২৭৮; ইবনে কাসির, ৩/২৫১; আল হায়ছামী, আযমা আল জাওয়ায়েদ ৬/৬৬-৭। সকল বর্ণনা কারীর বিষয়টি বিবেচনা করা হলে হাদীসটি *সহীহ লি গায়রিহী* হিসেবে বিবেচিত হয়।

অধ্যায় ৩

কিবলা পরিবর্তন

হিজরী সনের পূর্বে বায়তুল মোকাদ্দেস ও কাবার মাঝামাঝি থেকে জেরুজালেমের দিকে মুখ করে রাসূল (সা) সালাত আদায় করেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের[১] এক হাদিসে *সহীহ* সনদে বিষয়টি বর্ণিত হয়। কারো কারো মতে রাসূল (সা) মক্কা থাকাকালীন কাবার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেন। মদীনায় হিজরতের পর তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত পড়েছেন। আল হাফিয আবু ওমর ইবনে আবদাল বার আল কুরতুবী শেষের বক্তব্যটিকে সমর্থন করেন। আল হাফিয ইবনে হাজার আবার এ মতের বিরোধিতা করে বলেন, "এ বক্তব্য দুর্বল। এর কারণ এর সমর্থনে দু'টো বাতিলের রিপোর্ট আছে।"[২] প্রথম রিপোর্টটি অপেক্ষাকৃত বেশী সঠিক। এর কারণ এ রিপোর্টে দু'টো বক্তব্যের কথাই বলা হয়েছে। আল হাকীম ও অন্যরা এটিকে *সহীহ* বলে অভিহত করেছেন।[৩]

সৈয়দ ইবনে আল মুসায়্যাবের মতে *হিজরীর*[৪] তিন বছরপূর্বে *আনসারগণ* বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত পড়তেন।

রাসূল (সা) মদীনায় হিজরত করে ষোলমাস[৫] যাবৎ বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করেছেন। হিজরীর দ্বিতীয় বৎসরের রজবের মাঝামাঝি সময়ে কাবার দিকে ফিরে সালাত আদায়ের জন্য আল্লাহ রাসূল (সা) কে কাবার দিকে ফিরে সালাত আদায়ে নির্দেশ দেন। ইবরাহীম, ইসমাইলও কাবার দিকে ফিরে সালাত আদায় করেছেন। বদর যুদ্ধের[৬] দু' মাস পূর্বে কাবার দিকে কিবলা করার তারিখের উল্লেখ পাওয়া যায় সৈয়দ ইবনে আল মুসায়্যাবের বর্ণনায়। এ তারিখটি হবে দু'হিজরীর ১৭ রজব, আরো সংক্ষেপে বলতে গেলে এটি হবে রজব মাসের মাঝামাঝি। বেশীরভাগ পণ্ডিত ব্যক্তি দু'দিন[৭] কম বেশ করে এ মতই দিয়েছেন। রাসূল (সা)-এর মদীনায়[৮] পৌছার সতের মাস পরে রজব মাসে *কিবলা* পরিবর্তনের তারিখ বিষয়ে ইবনে ইসহাক মতামত ব্যক্ত করেন। ইবনে ইসহাক *কিবলা* পরিবর্তনের ব্যাপারে রাসূল (সা)-এর হিজরতের[৯] আঠার মাস পরের একটি তারিখ সম্পর্কে অসমর্থিত একটি তারিখের উল্লেখ করেছেন।

আল ওয়াকিদের মতে *কিবলা* পরিবর্তনের তারিখ হলো হিজরতের[১০] সতের মাস পরের রজব মাসের মাঝামাঝি সময়ে। এ ব্যাপারে আরো অনেকগুলো অসমর্থিত তারিখও রয়েছে। মূসা ইবনে উকবার মতে *কিবলার* বিষয়টি সংগঠিত হয় জুমাদাল আখিরায়। আবার অন্যান্যদের মতে কিবলার বিষয়টি হয় বিভিন্ন সময়ে, যেমন হিজরতের[১১] দু'বছরপরের তের মাস, উনিশ মাস, কুড়ি মাস, দু'মাসের[১২] ব্যবধানে।

অপ্রচলিত রিপোর্টগুলোর কথা বাদ দিলেও সতের মাস আর ষোল মাসের যে অমিল তাকে দুটো মতামতের সমন্বয়ের মাধ্যমে সমাধান করা যায়। যারা ষোল মাসের কথা বলেন তারা রাসূল (সা) এর আগমনের মাস এবং *কিবলা* পরিবর্তনের মাসের কথা বলেন, আর অতিরিক্ত দিনের ধারণাকে বাদ দিয়ে বলেন। আর যারা সতের মাসের কথা বলেন তাঁরা এ দু' মাসের হিসাব ধরে বলেন। আবার কোন কোন পণ্ডিত একটা তারিখ[১৩] উল্লেখের ব্যাপারে দ্বিধা-সংকোচের কথা বলেন।

রাসূল (সা)-এর সাথে শান্তি চুক্তিকারী ইহুদীরা রাসূল (সা)-এর বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত পড়ার বিষয়টিকে স্বাগত জানায়। মুজাহিদের মতে ইহুদীরা এ বিষয়টির সুযোগ গ্রহণ করে। তিনি বলেন, "মুহাম্মদের সাথে আমাদের মতবিরোধ থাকলেও তিনি *কিবলার* দিকে সালাত আদায় করেন"।[১৪] এ রিপোর্টটি সঠিক হতে পরে। তারা ভাবলো নতুন ধর্মটি *কিবলার* ব্যাপারে তাদেরকে অনুসরণ করছে আর তাদের কোন কোন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানও মুসলিমরা গ্রহণ করছে। নতুন ধর্মটি তাদের দিক নির্দেশনায় চলছে এমন চিন্তাও তারা করতে থাকে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে হিজরীর প্রথম বৎসরে বায়তুল মোকাদ্দাসকে কিবলা করার অর্থ হলো ইহুদীদেরকে[১৫] ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা। বিষয়টি আসলে তা নয়। হিজরীর পূর্বে মক্কায় মুসলমানগণ বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে ফিরেই সালাত পড়তো। হিজরতের পরেও মুসলমানগণ তাই করতে থাকে।

রাসূল (সা) এ সময়ে *ওহির* জন্য অপেক্ষা করছিলেন। রাসূল (সা) কাবার দিকে অর্থাৎ ইব্রাহিম (আ) এর কিবলার দিকে ফিরে সালাত আদায় করতে যাচ্ছিলেন। ইব্রাহিমের (আ) কিবলার স্থানেই আল্লাহর ইবাদতের জন্য প্রথম পবিত্র ঘর নির্মিত হয়। রাসূল (সা) এর ইচ্ছা ছিল মুসলমানগণ তাদের নিজস্ব কিবলা ঠিক করে নেবে। এভাবে তিনি ইহুদীদের প্রচারের ইতি টেনে দিলেন। রাসূল (সা)-এর আবেদনের জবাব দিলেন আল্লাহ আর আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করলেন।

> আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করি। সুতরাং তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরায়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ কর। অতএব মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তার দিকে মুখ ফিরাও। (২ ঃ ১৪৪)

রাসূল (সা) কাবার দিকে মুখ করে প্রথম জোহরের সালাত আদায় করেন। তিনি বানু সালমা গোত্রের মানুষদের মধ্যে থেকে তা সালাত আদায় করেন। মসজিদুন নববীতে তিনি প্রথম আসরের সালাত আদায় করেন। কুবা গোত্রে থেকে রাসূল প্রথম ফজর সালাত আদায় করেন। এ সময়ে তার কিবলা পরিবর্তনের খবরে ইহুদীরা খুব বিভ্রান্ত হয়।[১৬] তারা রাগান্বিত হয় ও গুজব রটাতে থাকে। এ সময়ে তাদের দাবি খন্ডন করে কুরআনের কিছু কিছু আয়াত নাযিল হয়। তারা যখন প্রচার করতে থাকে যে, *মুত্তাকীগণ* কেবল বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করেই সালাত আদায় করছে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হলো ঃ

নির্বোধ লোকেরা বলবে যে, তারা এযাবৎ যে কিবলা অনুসরণ করে আসছিল তা হতে কিসে তাদেরকে ফিরায়ে দিল? বল 'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। (২:১৪২)[১৭]

বায়তুল মোকাদ্দেস থেকে কাবার দিকে কিবলা পরিবর্তন করার বিষয়ে কুরআনে বলা হয়েছে যে, এটা ইমানদারদের জন্য পরীক্ষা, এটা তাদের ঈমানের শক্তি পরীক্ষা, তারা আল্লাহর নির্দেশের প্রতি কত তাড়াতাড়ি সাড়া দেয় তার পরীক্ষা।

... তুমি এযাবৎ যে কিবলা অনুসরণ করছিলে তাকে এ উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যাতে জানতে পারি কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে ফিরে যায়। আল্লাহ যাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন তারা ব্যতীত অপরের নিকট এটা নিশ্চয় কঠিন। আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমানকে ব্যর্থ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। (২:১৪৩)

এ আয়াতের দ্বারা এটাই বুঝানো হলো যে, আল্লাহ পরীক্ষামূলকভাবে রাসূলকে প্রথম কিবলা বায়তাল মোকাদ্দাস থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। কিবলা পরিবর্তনের ফলে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা অনুধাবন বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়।

উদাহরণ স্বরূপ বলতে হয়, *মুশরিকরা* এসময় বলাবলি করতে লাগলো যে, মুহাম্মদ তার ধর্ম সম্পর্কে বিভ্রান্ত এবং সে তাদের *কিবলার* দিকে ফিরে গিয়েছে। *মুনাফিকরা* মদীনায় মুসলিমদের মধ্যে বলে বেড়াচ্ছিল যে, "কেন মুহাম্মদ আমাদেরকে এক দিক থেকে আরেক দিকে সরিয়ে নিচ্ছে?" ঈমানদাররা দুশ্চিন্তায় ছিল। তারা বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে ফিরে যে সালাত আদায় করেছে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না।[১৮] এ আয়াতের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট করা হলো যে, বায়তাল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে যে সালাত আদায় করা হয়েছে এবং কিবলা পরিবর্তনের পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছে ও কাবার দিকে ফিরে সালাত আদায় করতে পারেনি তাদের সালাত বৃথা যাবে না। দশজন সাহাবী আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল এর নির্দেশ মোতাবেক কিবলা অনুযায়ী সালাত আদায় করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তারা বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ ফিরায়ে সালাত আদায় করেছিলেন। আল্লাহ রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক যারা কাবামুখী হয়ে সালাত আদায় করছে তাদের মতই তারা কাজ করেছিলেন।[১৯]

পাদটীকা ঃ

১. ইবনে সাদ মুহাম্মদ, *আল তাবাকাত* ১/২৪৩। আল হাকীম ও অন্যান্য পন্ডিতগণ ইবনে আব্বাসের হাদীসকে প্রত্যয়ন করেছেন। এই সংক্রান্ত অধ্যায়ে বুখারী বলেন যে, মুসলিমগণ যখন কাবাগৃহে সালাত আদায় করেছে তারা যেন বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছে। ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ১/৯৫-৬।

২. ইবনে হাজার, *ফতহুল বারী* ১/৯৭

৩. পূর্বোক্ত, ১/৯৬

৪. আল তাবারী, আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরীর, *তারিখ আলরাসূল ওয়া আল মুলুক*, ২/৪, *হাসান সনদসহকারে*, এটিতে কাতাদাহ *মুয়ানান* হলেও সে আসলে মুদালি-স।

ইবনে আল মাদিনী সাইয়েদ ইবনে আল মুসায়্যাব থেকে প্রাপ্ত তার বর্ণনাকে দুর্বল বলেছেন, এগুলো যদি মুখে মুখে প্রচারিত না হয়ে থাকে যেভাবে কাতাদা'র জীবনীগ্রন্থ *তাহযীব আল তাহজীব* এ বর্ণিত হয়েছে? *মুফাসসীর* গ্রন্থে সাইয়েদ ইবনে আল মুসায়্যাব-এর ন্যায় তাবারীও একই রকম বক্তব্য দিয়েছেন (তাবারী, *তাফসীর*, ২/৫)। যে কেউ লক্ষ্য করবেন যে, ইবন আল মুসায়্যাব *সালাত সানাওয়াত* (তিন বৎসর)-এর পরিবর্তে *সালাত হুয়াজ* (তিন হজ্জ) শব্দ ব্যবহার করেছেন।

৫. বেশ কিছু সাহাবা এর উল্লেখ করেছেন। মুয়ায ইবনে যাবাল, আনাস ইবনে মালিক, আল বারা ইবনে আজীব, সাইয়েদ ইবনে আল মুসায়্যাব *মুরসাল* সনদসহকারে এটি বর্ণনা করেছেন। এ সনদে বর্ণিত বিষয়গুলো সাহাবীদের বর্ণনায় *সহীহ (সহীহ মুসলিম*, ১/৩৭৪), মুসলিম শরীফে এটিকে নিশ্চিত করা হয়েছে। *সহীহ বুখারী* (ইবনে হাজার *ফতহুল বারী*, ১/৯৫), তবে বুখারী বর্ণনায় আছে "১৬ বা ১৭ মাস।" তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নন।

৬. খলিফা, *আল তারিখ*, ৬৪, ইবনে সাদ *আল তাবাকাত*, ১/২৪২, এর *সনদ সহীহ* তবে *মুরসাল* সাইয়্যেদ ইবনে আল মুসায়্যাব মুরাসাল শক্তিশালী। আরও দেখুন আল তাবারী, *তাফসীর*, ২/৩।

৮. *তারিখ খলিফা* (৬৪) সনদ ছাড়া

৯. ইবনে হিশাম, *আল সীরাহ*, ৬৪, সনদ ছাড়া

১০. ইবনে সাদ, *আল তাবাকাত*, ১/২৪২; তিনি বলেন যে, আল ওয়াকিদি *মাতরুক*।

১১. ইবনে হাজার, ফতহুল বারী ১/৯৭; আল তাবারী তফসীর, *২/৩-৪;* খলিফা, *তারিখ*, ৬৪; তাদের *সনদে* রয়েছে উসমান ইবনে সাদ আল কাতিব, যাকে দুর্বল বলে অভিহিত করা হয়।

১২. হাসান আল বসরী হতে বর্ণিত মুরসাল হাদীসটি দুর্বল। খলিফা ইবনে খাইয়্যাত, *তারিখ*, ৬৫।

১৩. ইবনে হাজার, *ফতহুল বারী*, ১/৯৬.

১৪. আল তাবারী, *তফসীর*, ২/২০,

১৫. এ সংক্রান্ত বর্ণনা *তফসীর* তাবারীতে বর্ণিত আছে, এটি মুহাম্মদ ইবনে হামিদ আল রাযী কর্তৃক বর্ণিত, তাকে দুর্বল সূত্র বলা হয়, মুসান্না ইবনে ইবরাহিম আল আমালীকে *মাজহুল* বলা হয়েছে।

১৬. ইবনে হাজার, *ফতহুল বারী*, ১/৯৭।

১৭. আল তাবারী, *তফসীর* ১/১-২।

১৮. পূর্বোক্ত, ২/১১-১২

১৯. ইবনে সাদ, *আল তাবাকাত* সহীহ সনদসহ। ইবনে হাজার, *ফতহুল বারী* ১/৯৮; *আল তাবারী তফসীর* ২/১৭

অধ্যায় ৪

বদরের মহা অভিযান

মুসলিমানগণ সিরিয়ার বাণিজ্য পথে হুমকির সৃষ্টি করলেও ত ারা তখনও কুরাইশ মরুযাত্রীদলের কাফেলাকে কোন চূড়ান্ত যুদ্ধে নিয়োজিত করেনি। কুরাইশরা তাদের মরু কাফেলাকে নিরাপত্তা রক্ষীর পাহারায় পাঠাতে থাকে। মুসলিমগণ কুরাইশ কাফেলার গতিবিধি পর্যবেক্ষণে রাখে। সিরিয়া থেকে কুরাইশদের কাছে বিরাট কাফেলা আসছে শুনে মুসলিমরা তাদের দেখার জন্য স্কাউট পাঠিয়ে দেয়। কাফেলাটি আবু সুফিয়ান সাখর ইবনে হারব'র নেতৃত্বে কুরাইশদের জন্য বিপুল পরিমাণ মালপত্র নিয়ে আসছিল। ত্রিশ চল্লিশজন কাফেলাটি পাহারা দিয়ে আসছিল।[১] রাসূল (সা) কাফেলাটির খোঁজ খবর নিতে বিসবাসকে পাঠান। কাফেলাটি পৌঁছলে রাসূল (সা) তাঁর সাহাবীদেরকে যাত্রা করতে বলেন। যারা হাজির ছিল তাদেরকে নিয়ে তিনি দ্রুত বের হয়ে গেলেন। নগরীর কেন্দ্রস্থলে আরও যারা যেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল তাদেরকে ছাড়াই কাফেলাটি চলে যেতে পারে এ ভেবে তারা বের হয়ে পড়লেন।[২]

মুসলিম সৈন্যবাহিনী তাদের পুরো শক্তি প্রদর্শন করেনি। তাদের কাফেলাটি অবরোধ উপেক্ষা করে বের হয়ে গেল। তারা জানতো না যে, তাদেরকে কুরাইশ সৈন্যবাহিনীর মুখোমুখি হতে হবে। ইকরিমার মতে রাসূল (সা) আদী ইবনে আল জাগবা ও বিসবাস ইবনে আমরকে স্কাউট হিসাবে বদর ময়দানে প্রেরণ করেন। তাদেরকে কাফেলাটির খোঁজ খবর নিতে পাঠানো হয় তারা কাফেলার খবরাখবর নিয়ে আসে।[৩] *সহীহ মুসলিমে* বিসবাসকে পাঠানোর ব্যাপারে জানা যায়। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, মুসলিমরা কাফেলার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছিল। এ ব্যবস্থার মধ্যে একটি হলো শত্রুর ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি করা আর নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে শত্রুর গোপন সংবাদ সংগ্রহ করা।

মুসলমানগণ ৩১৯ জন[৪] নিয়ে বদর যুদ্ধে শরীক হন। এর মধ্যে ১০০ জন *মুহাজিরদের* মধ্য হতে এবং অবশিষ্টজন *আনসারদের* মধ্য হতে যুদ্ধে শরীক হন। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী জুবায়ের ইবনে আল আওয়ামের কাছ থেকে এ তথ্যটি জানা যায়। অত্যন্ত ছোট হওয়ায় রাসূল (সা) আল বারা ইবনে আজীবকে যুদ্ধে শরীক হতে দেননি। আল বারার মতে এ যুদ্ধে ৬০ জন *মুহাজির* ও ২৪০ জনের বেশী *আনসার* যোগদান করেন[৫] এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৩৪০ জন সাহাবার নাম জানা যায়। তবে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে মতভেদ আছে।[৬]

পথিমধ্যে জনৈক *মুশরিক* মুসলমানদের সাথে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে চাইল। রাসূল (সা) তাকে ফেরত পাঠান আর বলেন, "আমি কোন *মুশরিকের* কাছ থেকে সাহায্য নেব না।"

মুশরিক লোকটি পুনরায় চেষ্টা করলে রাসূল (সা) পুনরায় তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। লোকটি ইসলাম কবুল করে মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে।[৭] এ ঘটনা থেকে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ যে আদর্শগত যুদ্ধ ছিল এবং একটা লক্ষ্যে পৌঁছার যুদ্ধ ছিল তা প্রমাণিত হয়।

মুসলমানদের সাথে ছিল ৭০টি উট। এগুলোতে তারা পালাক্রমে চড়তেন।[৮] রাসূল (সা) আবু লুবাবা ও আলী ইবনে আবু তালিব পালাক্রমে একটি উটে চড়তেন। আবু লুবাবা ও আলী চেয়েছিলেন রাসূল (সা) উটটিতে চড়ুন, কিন্তু রাসূল (সা) এ প্রসঙ্গে বলেন, "তোমরা[৯] আমার চেয়ে যে শক্তিশালী নও, আল্লাহর পুরস্কারে আমার কি কম অধিকার আছে? নেতা ও সাধারণ সৈন্য যে কষ্ট স্বীকার ও একনিষ্ঠতার দিক দিয়ে সমান, আল্লাহর মহব্বত ও পুরস্কার পাওয়ার ব্যাপারে সমান এ ঘটনার দ্বারা তাই প্রমাণিত হলো। সাধারণ সৈন্যরা তাদের নেতার সাথে একই রকম কষ্ট স্বীকার এবং নেতা সাধারণ সৈন্যের চেয়ে বেশী ত্যাগ স্বীকার করবে এ যুদ্ধে তাই শিক্ষা হলো। নেতা যখন কষ্ট স্বীকার করবেন তখন তার অনুসারী সৈন্যরা কেন কষ্ট স্বীকার করবে না? রাসূল (সা) বাস্তবেই এ শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূল (সা) এর এ সময়ে বয়স ছিল পঞ্চাশ বছর।

রাসূল (সা) আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে তাঁর অনুপস্থিতিতে মদীনায় ইমামতি করতে নির্দেশ করেন। এর পর রাসূল (সা) মদীনা থেকে চল্লিশ মাইল দূরবর্তী রাওহা থেকে আবু লুবাবা কে ডেকে আনেন এবং তাঁকে মদীনার *আমীর* নিযুক্ত করেন। সফরে থাকা আর না থাকার সময়ে এবং যুদ্ধ ও শান্তির সময়ে নেতৃত্বের গুরুত্বের বিষয়টি এ ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হলো।

আবু সুফিয়ান বণিকদলকে অবরোধের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের আগমনের কথা শুনে উপকূলবর্তী সাগর পথে রওয়ানা দেয় আর দামাম ইবনে আমীরুল গিফারীকে মক্কার লোকদের সাথে লড়াইয়ের নির্দেশ দেয়। কুরাইশরা এ খবর শুনে তাদের বণিকদলকে রক্ষার জন্য বেরিয়ে পড়ে।[১০]

ইবনে আব্বাস ও উরওয়া ইবনুল জুবায়ের বর্ণনা করে যে, আতিকা বিনতে আবদুল মুত্তালিব এ মর্মে একটি স্বপ্ন দেখেন যে, জনৈক ব্যক্তি কুরাইশদেরকে যুদ্ধে আহবান করছে এবং মক্কার আবু কুরাইশ চূড়া থেকে পাথর নিক্ষেপ করছে। পাথর খন্ড প্রত্যেক কুরাইশের ঘরে ঢুকছে। এ স্বপ্ন আল আব্বাস ও আবু জাহলের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি করল। দামাম ফিরে এসে তাদের কাছে বণিকদলের ঘটনার বর্ণনা দেয়ার পর এ বিতর্কের অবসান হলো।[১১]

খবরটি কুরাইশদেরকে হতবিহবল করে দেয়। পূর্বে মুসলিমরা বণিকদলকে ভয় দেখানোর জন্য বাধা দিয়েছিল। তখন ছোটখাট সংঘর্ষ হয়েছিল মাত্র। এবার মুসলমানগণ বণিকদলটিকে আটক করতে চাইল। এ ব্যাপারে রাসূল (সা) মুসলমানদেরকে বলেছেন ঃ

"মালপত্রে বোঝাই কুরাইশদের উট; এগুলোর জন্য এগিয়ে যাও। আল্লাহ যাতে গণিমত হিসাবে এগুলো তোমাদেরকে দান করেন।"[১২] কুরাইশরা সেজন্য দ্রুত তাদের

সেনাবাহিনী নিয়ে প্রস্তুত হলো। সকল অশ্বারোহী বা লোকজন অপেক্ষা করতে লাগলো। আবু লাহাবসহ অল্প কিছু লোক ছাড়া সবাই সমবেত হলো। আবু লাহাব তার জায়গায় একজন পাঠিয়েছিল। কুরাইশরা ক্ষুব্ধ হলো। তারা অপমানিত বোধ করলো। আরবদের মধ্যে তাদের অবস্থানকে একটি হুমকি হিসাবে মনে করলো। অর্থনৈতিক স্বার্থেও তারা এটাকে হুমকি মনে করলো। এ অবস্থায় কোন কুরাইশ যুদ্ধে না এলে তারা তাকে গালাগাল করলো আর তাদেরকে যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করলো।[১৩]

অবিশ্বাসী কুরাইশদলে ১,০০০ জন যোগ দিল।[১৪] আবু ইসহাক সনদ ছাড়া ৯৫০ জনের সেনাবাহিনীর কথা বলেছেন। এছাড়া ছিল ২০০ জনের অশ্বারোহী বাহিনী, ঢোল বাজিয়ে বাদকদল, মুসলিমদের অপমানকারী গায়কদল।[১৫]

কুরাইশ সেনাবাহিনীর রসদ সম্পর্কে আল উসওয়ারী সনদ ব্যতীত বলেন, ধনীরা রসদের জন্য উট যবহ করে। এ সংখ্যা কখনো নয় কখনো দশে পৌঁছে।[১৬]

পথিমধ্যে বানু জাহরা দলছুট হয়ে আল আখনাস ইবনে শরীক-এর কথামত মক্কায় ফিরে আসে। এর কারণ আখনাস শুনেছিল যে, বণিকদলটি বেঁচে গেছে। তারা যখন ফিরে আসে[১৭] তখন বণিকদলটি রাবিগ-এর পূর্বে আল জাহফায় অবস্থান করে। তবে বদর নামক স্থানে না পৌছা পর্যন্ত সেনাবাহিনীর বেশীরভাগই অগ্রসর হতে থাকে। বণিকদলকে বাঁচানো ছাড়া তাদের এখন আর কোন কাজ থাকলো না। তারা এখন তাদের বাণিজ্য পথে আবার বাধা দেয়ার জন্য মুসলমানদেরকে শাস্তি দিতে চাইল। তারা আরবদের মধ্যে তাদের শক্তি সামর্থ সম্পর্কে অপপ্রচারে লিপ্ত হলো। বদর প্রান্ত থেকে তাদের কোন কোন গোলামকে মুসলমানগণ আটক করে। রাসূল (সা) কুরাইশবাহিনীর সংখ্যা, তাদের নেতা, তাদের অবস্থান, প্রতিদিনের যবহকৃত উটের সংখ্যা সম্পর্কে অভিহত হন। রাসূল (সা) আরও বলেন, সেনাবাহিনীর সংখ্যা ১,০০০; প্রতিটি পুরুষ উট ও তার বাচ্চা একশ জনের আহারের জন্য যথেষ্ট।[১৮]

কোন কোন মুসলমান বণিকদলটি বেঁচে যাওয়ায় অসন্তুষ্ট হলো। তারা *মুশরিকদেরকে* মোকাবেলা করতে না পারায় অখুশি হলো। এ সময়ে *মুশরিকরা* যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। কুরআনে তাদের মনোভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> ইহা এরূপ, যেমন তোমার প্রতিপালক তোমাকে ন্যায়ভাবে তোমার গৃহ হতে বের করেছিলেন অথচ বিশ্বাসীদের এক দল তা পছন্দ করেনি। সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়; মনে হচ্ছিল তারা যেন মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে আর তারা যেন তা প্রত্যক্ষ করছে। স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দু'দলের একদল তোমাদের আওতাধীন হবে; অথচ তোমরা চাইছিলে যে, নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তাধীন হোক, আল্লাহ চাইছিলেন যে, তিনি সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফিরদেরকে নির্মূল করেন। (৮ঃ ৫-৭)

আকাবার দ্বিতীয় শপথ-এ মদীনার *আনসারগণকে* রাসূল (সা) তাদের নিজের দেশে প্রতিরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তবে রাসূল (সা)-এর সাথে মদীনার বাইরে যুদ্ধ

করতে তারা অপারগতা প্রকাশ করলেন। সেজন্য বদরের পূর্বে যে অভিযানগুলো পরিচালিত হয় সেগুলোতে *মুহাজিরগণ* অংশগ্রহণ করেছিলেন। বদরে *আনসারগণ মুহাজিরদের* সাথে উপস্থিত ছিলেন। এ জন্য তারা সংখ্যায় বেশী ছিলেন।

এ অবস্থায় নতুন অবস্থার প্রেক্ষিতে তারা কি করতে চায় তা রাসূল (সা) দেখতে চাইলেন। সেজন্য তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় বসলেন। তবে বিশেষ করে তিনি *আনসারদের* মতামত জানতে চাইলেন। ইবনে ইসহাক *সহীহ* সনদ সহকারে বিষয়টি নিম্নরূপ বর্ণনা করেন ঃ

কুরাইশরা তাদের বণিকদলকে বাঁচানোর জন্য বেরিয়ে পড়েছে এ খবর এসে গেল। রাসূল (সা) তার লোকদেরকে বিষয়টি বলে তাদের মতামত চাইলেন, আবুবকর ও পরে উমর উঠে দাঁড়িয়ে ভালভাবে বললেন। এরপর আল মিকদাদ ইবনে আমার উঠে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ আপনাকে যেদিকে যেতে বলেছেন আপনি সেদিকে যান, আমরা আপনার সাথে আছি। ইসরাইলের ছেলেমেয়েদের মত আমরা চলবো না। তারা মূসাকে বলেছিল, "তুমি ও তোমার প্রভু যেতে পার, গিয়ে যুদ্ধ কর, আমরা গৃহে অবস্থান করবো।" আমরা বলবোনা আপনি ও আপনার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ করুন। আমরা আপনার সাথে যুদ্ধে শরীক হব। আল্লাহর শপথ যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, আপনি যদি আমাদেরকে বার্ক আল গিমাদেও নিয়ে যান আমরা আপনার সাথে দৃঢ় প্রত্যয়ে এর বিরোধীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো যে পর্যন্ত না এটা আপনার করায়ত্ত হয়।"

আল্লাহর রাসূল (সা) তার কথা শুনে খুশি হলেন। তার প্রশংসা করলেন। তাকে দোয়া করলেন। এর পর রাসূল (সা) *আনসারদের* উদ্দেশে বললেন, "হে মানুষগণ, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও।" তাদের উদ্দেশে রাসূল (সা)-এর বলার উদ্দেশ হলো *আনসারগণ* ছিলেন সংখ্যায় বেশী। *আনসাররা* আকাবায় এ মর্মে শপথ গ্রহণ করেন যে, রাসূল (সা) তাদের ভূ-খন্ডে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তারা তাঁর নিরাপত্তার জন্য দায়ী থাকবে না। রাসূল যখন তাদের ভূ-খন্ডে অবস্থান করবেন তখন তারা তাঁকে তাদের নিজেদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের মত রক্ষা করবেন। রাসূল (সা) এ ভেবে চিন্তিত হলেন যে, মদীনায় শত্রু দ্বারা আক্রান্ত না হলে তাঁকে *আনসারগণ* সাহায্য করবে না। মদীনার বাইরে কোন শত্রুর মোকাবেলায় তারা রাসূল (সা) কে সাহায্যের ব্যাপারে কোন সহায়ক ভূমিকা নেয়ার কথা তারা চিন্তা করবে না। রাসূল (সা) যখন এ কথাগুলো বলছিলেন তখন সা'দ ইবনে মুয়ায বললেন, "এ কথাগুলো দ্বারা আপনি আমাদেরকে কিছু বলার চেষ্টা করছেন।" তখন রাসূল (সা) কথাগুলো তাঁকেই বলছেন বুঝালেন।[১৯] এরপর মুয়ায বললেন, "আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি, আপনার প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করছি, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি যা ঘোষণা করছেন তা সত্য, আমরা আপনাকে আমাদের ওয়াদা দিয়েছি, আপনার সাথে চুক্তি করেছি। আপনার কথা আমরা শুনবো ও আপনাকে মান্য করবো; সুতরাং যেখানে আপনার ইচ্ছা হয় যান, আমরা আপনার সাথে আছি। আল্লাহর শপথ আপনি যদি সাগর পাড়ি দিতে বলেন আমরা পাড়ি দেব, আপনি

যদি এ সাগরে ডুবে যান আমরাও আপনার নির্দেশে সাগরে ডুবে যাবো। কোন একজনও পেছনে দাঁড়িয়ে থাকবে না। আগামীতে শত্রুদের সাথে আপনার মোকাবেলার ধারণাকে আমরা অপছন্দ করি না। আমরা যুদ্ধে অভিজ্ঞ, যেকোন অভিযানের ব্যাপারে আমরা সিদ্ধহস্ত। আল্লাহ আমাদের দ্বারা এমন কিছু করাবেন যাতে আপনি খুশি হবেন, সুতরাং আল্লাহর আশীর্বাদের সাথে আমাদেরকে যুক্ত করুন।" তাদের কথায় রাসূল (সা) খুশি হলেন, রাসূল (সা) অনুপ্রাণিত হলেন। এরপর বললেন, "সামনে তোমাদের জন্য খুশির খবর আছে, আল্লাহ আমাকে একটি ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহর শপথ আমি দেখতে পাচ্ছি যে, শত্রুরা নত হয়ে আছে"।[২০]

রাসূল (সা) ইসলামের জন্য যুদ্ধ করার ব্যাপারে তাঁর সৈন্যদের আনুগত্য, সাহসিকতা ও সম্মতিতে খুশি হলেন। তিনি তাদের কুরবানীর কথা শুনে খুশি হলেন। রাসূল (সা) তাদেরকে সংগঠিত করলেন। তিনি সাদা একটি পতাকা মু'সাব ইবনে উমায়েরকে হস্তান্তর করলেন। দু'টো কালো বর্ণের পতাকা দিলেন আলী ইবনে আবু তালিব ও সা'দ ইবনে মু'য়াযের হাতে। তিনি কায়েস ইবনে আবু সা'য়াহকে পেছনের রক্ষীর সামনে রাখলেন।[২১]

উতবা ইবনে রাবিয়াহ মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ না করে ফিরে যেতে চাইলে কুরাইশ সৈন্য বাহিনীর মধ্যে বিরোধ বেধে গেল। উতবা দু'পক্ষের মধ্যে অযথা রক্তারক্তি চায়নি। এর কারণ হলো কোন কোন মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যে আত্মীয় সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। অবশেষে তার সংকল্পই কার্যকর হলো।[২২] *মুশরিকরা* একজন গুপ্তচর পাঠালো মুসলমান সৈন্যদের সংখ্যা জেনে আসার জন্য।[২৩] আবু জাহেল রাসূল (সা) এর বিরুদ্ধে তার সৈন্য বাহিনীকে উত্তেজিত করতে লাগলো। আবু জাহল বলছিল, "হে আমাদের প্রভু! দু'দলের যেকোনটি তার আত্মীয় স্বজনদের প্রতি কম দয়াবান হতে পারে, আমাদেরকে তুমি এখানে এনেছ যা আমরা জানতাম না, তুমি তাকে আগামী কালের মধ্যে ধ্বংস করে দাও।" এটাই ছিল আবু জাহেলের বিজয়ের জন্য দোয়া। কুরআনে এ ব্যাপারে উল্লেখ করা আছে ঃ

> তোমরা মীমাংসা চেয়েছিলে, তা তো তোমাদের নিকট এসেছে; যদি তোমরা বিরত হও তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা পুনরায় কর তবে আমিও পুনরায় শাস্তি দিব এবং তোমাদের দল সংখ্যায় অধিক হলেও তোমাদের কোন কাজে আসবে না। এবং আল্লাহ মু'মিনদের সাথে রয়েছেন। (৮ঃ১৯)[২৪]

মুসলমানগণ বদরে উপস্থিত হয়ে *মুশরিকরা* পৌঁছার পূর্বে জায়গাটি পরীক্ষা করে নিলেন। উরওয়া *হাসান সনদ* সহকারে এর বর্ণনা দেন। তবে বর্ণনা ছিল *মুরসাল* ধরনের। এ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, আল হাবীব ইবনে আল মুন্ধির রাসূল (সা) কে পানির কূপগুলোর পেছনে রেখে প্রস্তুতি নিতে বলেছিলেন যাতে *মুশরিকরা* কূপগুলোর পানি ব্যবহার করতে না পারে। রাসূল (সা) তার পরামর্শ মেনে নিলেন।[২৫] বর্ণনাটির

দুর্বলতা সত্ত্বেও কুরআনের আয়াত আর সীরাতের ঘটনাবলীর মাধ্যমে *শূরার* নীতি প্রতিষ্ঠিত হলো।

প্রায়ই যেসব বিষয়ে কুরআন নাযিল হয়নি বা কোন দিক নির্দেশনা ছিল না রাসূল (সা) সেসব বিষয়ে তাঁর সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন। সাধারণ সমস্যাগুলোর ব্যাপারে চিন্তা করতে অভ্যস্ত করে তোলার জন্য তিনি এ রূপ করতেন। এর কারণ রাসূল (সা) তাদেরকে দায়িত্ববোধ শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে সবসময় উদ্বিগ্ন থাকতেন। তিনি আল্লাহর নির্দেশে *শূরা* বাস্তবায়নেও উদ্যোগী ছিলেন। তিনি তাঁর উম্মাহকে *শূরা* পদ্ধতি অনুশীলনের চেষ্টা করতেন।

বদর ময়দানে ১৭ রমাযানের রাত *মুশরিক* সেনাবাহিনীকে সামনে রেখে কিভাবে কেটেছে সে ব্যাপারে আলী বর্ণনা করেছেন ঃ

"বদরের দিনগুলোতে আমরা সবাই ঘুমাচ্ছিলাম। রাসূল (সা)ই শুধু জেগে থাকতেন। একটি বৃক্ষের দিকে মুখ ফিরায়ে সকাল না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন। রাতের বেলায় কিছু বৃষ্টি হলো। আমরা এ সময়ে বৃক্ষের তলায় চামড়ার তাঁবুর দিকে চলে গেলাম। আল্লাহর রাসূল সারারাত আল্লাহর দরবারে ইবাদত করে কাটালেন, রাসূল (সা) বললেন "হে আল্লাহ, এ দল যদি আজ ধ্বংস হয়ে যায় তোমার ইবাদত করার কেউ থাকবে না।" ভোর হলে তিনি সবাইকে ডাকলেন, "আল্লাহর বান্দারা সালাত পড়তে এস"। সাহাবীগণ গাছের তলা আর চামড়ার তাঁবু হতে সালাতের জন্য সমবেত হলেন। আল্লাহর রাসূল (সা) ইমামতি করলেন আর আমাদেরকে *জিহাদের* দাওয়াত দিলেন"।[২৬]

দুর্বল সূত্র থেকে সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি সম্পর্কে জানা যায় সেনাবাহিনীর অবস্থান ঠিক করে দেয়ার কাজটি রাতের মধ্যেই শেষ করা হয়।[২৭] এ প্রেক্ষাপটে বদর ময়দানে বৃষ্টি হওয়ার পর বিষয়টি কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

> স্মরণ কর, তিনি তাঁর পক্ষ হতে শক্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ হতে তোমাদের উপর বারি বর্ষণ করেন তা দ্বারা তোমাদের পবিত্র করার জন্য, তোমাদিগ হতে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্য, তোমাদের হৃদয় দৃঢ় করার জন্য এবং তোমাদের পা স্থির রাখার জন্য। (৮ঃ১১)

মনে হচ্ছিল রাসূল (সা) তাঁর সেনাবাহিনীর বিশ্রাম চাচ্ছিলেন। সে জন্য রাসূল (সা) নিজেই ঐ রাতে তাদেরকে পাহারা দিয়েছিলেন।

১৭ রমাযানের সকালে রাসূল (সা) তাঁর সেনাবাহিনীকে যুদ্ধ করার নিমিত্ত সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করালেন।[২৮] তাঁর এ যুদ্ধ কৌশল আরবদের থেকে ছিল ভিন্ন ধরনের। *মুশরিকরা* বদর যুদ্ধে যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল তার থেকে এটা ছিল আলাদা। সেনাবাহিনী সাজানোর কৌশলের কারণে দুর্ঘটনার সংখ্যা কমে যায় এবং *মুশরিকদের* সংখ্যার তুলনায় কম হওয়ার পরও মুসলমানগণ কম ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এখানে সুবিধা ছিল এই যে, সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ছিল নেতার হাতে। তিনি পেছনের

বাহিনীকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। নেতা হওয়ার কারণে তাঁর সাথে সব সময় কন্টিনজেন্সী বাহিনী থাকতো যাতে তিনি অজানা কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারেন।[২৯]

রাসূল (সা)-এর জন্য একটি চওড়া বা উঁচু স্থান তৈরী করা হলো যাতে তিনি ঐ স্থান হতে সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করতে পারেন। সা'দ বিন মুয়াযের পরামর্শে এ চওড়া স্থান তৈরি করা হয়।[৩০] যুদ্ধকালে নেতার জীবন বাঁচানোর গুরুত্বটাই মুয়াযের এ পরামর্শের মাধ্যমে ফুটে ওঠে।

মুশরিকরা যখন মুসলমানদের মুখোমুখি হয় তখন রাসূল (সা) মুসলমানদের উদ্দেশে বলেন, "আমার নির্দেশ ব্যতীত তোমরা কেউ আক্রমণ করবে না"। *মুশরিকরা* সামনে অগ্রসর হলে রাসূল (সা) কুরআন থেকে তেলাওয়াত করলেন ঃ

> তোমরা ধাবমান হও স্বীয় প্রতিপালকের নিকট হতে ক্ষমা এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায়, যা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। (৩ঃ১৩৩)

উমায়ের ইবন আল হাম্মাম কুরআনের এ আয়াত শুনে রাসূল (সা) কে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল একটি বাগান যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান?" রাসূল (সা) বললেন, "হ্যাঁ"। উমায়ের বললেন, "চমৎকার, চমৎকার!" রাসূল (সা) বললেন, "তুমি কেন চমৎকর চমৎকার বলছ? উমায়ের তখন বললেন, "কিছুই না, আল্লাহর রাসূল ঐ বাগানের লোকদের মধ্যে আমি থাকব কিনা এ ছাড়া আর কিছুই বলছি না।" আল্লাহর রাসূল (সা) তখন বললেন, "তুমি ঐ লোকদের মধ্যে আছ"। এরপর উমায়ের তার ঝুড়ি থেকে কিছু খেজুর নিয়ে খেলেন। এরপর বললেন, "খেজুর খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্তও যদি আমি বেঁচে থাকি তা হলে এটাও আমার জন্য দীর্ঘ সময় নয় কি"? হাত থেকে তিনি খেজুর ছুড়ে মারেন আর কুরাইশদের বিরুদ্ধে *শাহাদাত* বরণ না করা লড়াই চালিয়ে যান।[৩১]

উমর ইবনুল খাত্তাব বললেন, রাসূল (সা) বদর দিবসে সব সময় দোয়া করতেন। উমর বললেন ঃ

বদর দিবসে রাসূল (সা) *মুশরিকদের* দিকে তাকিয়ে দেখলেন তাদের সংখ্যা ১,০০০ আর তাঁর সঙ্গীদের সংখ্যা মাত্র ৩১৯ জন। রাসূল (সা) কিবলার দিকে মুখ ফিরায়ে হাত তুলে আল্লাহর দরবারে কাঁদতে লাগলেন: "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে ওয়াদা করেছ তা পূরণ কর, মঞ্জুর করো যা তুমি ওয়াদা করেছো, হে আল্লাহ তুমি যদি এ মানুষগুলোকে ধ্বংস করে দাও দুনিয়ার কেউ তোমার ইবাদত করবে না।" আল্লাহর রাসূল (সা) হাত উঠিয়ে আল্লাহকে ডাকাডাকি করতে থাকেন, তাঁর স্কন্ধ হতে তাঁর গামছা পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত কেবলামুখী হয়ে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করতে থাকেন। এরপর তিনি পেছন দিক থেকে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। আর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহর দরবারে অনেক কেঁদেছেন। আল্লাহ আপনাকে যে ওয়াদা করেছেন তা তিনি অবশ্যই পূরণ করবেন।

এরপর কুরআনের নিম্ন বর্ণিত আয়াত নাযিল হয় ঃ

> স্মরণ কর, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে; তিনি তা কবুল করেছিলেন; এবং বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব এক সহস্র ফিরিশতা দিয়ে যারা একের পর এক আসবে। (৮ ঃ ৯)

ফেরেশতাদেরকে তাঁর সেনাবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির জন্য আল্লাহ প্রেরণ করেন।[৩২-৩৩] রাসূল (সা) নিম্নবর্ণিত আয়াত তেলাওয়াত করতে করতে তাঁবু থেকে বের হয়ে আসেন।

> এ দলতো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। (৫৪ ঃ ৪৫)

রাসূল (সা) নিজেই যুদ্ধে শরীক হন। আলী বলেন, "বদর যুদ্ধের দিন আমরা রাসূল (সা)-এর পেছনে নিরাপদ অবস্থায় ছিলাম। তিনি শত্রুদের সবচেয়ে কাছে ছিলেন, ঐদিন তিনি আমাদের সবার মধ্যে সবচেয়ে বেশী বলীয়ান লোক ছিলেন।"[৩৪]

দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। উতবা ইবনে রাবিয়া'র সাথে তার ছেলে ওয়ালিদ এবং তার ভাই শায়বা সামনে এসে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল। কিছু আনসার তাদের মোকাবেলা করতে চাইলেন। কিন্তু তারা তাঁদের সাথে লড়তে চাইল না। তারা রাসূল (সা) এর আপন লোকদের সাথে লড়তে চাইল। রাসূল (সা) হামজা, আলী ও উবায়দা ইবনুল হারিসকে তাদের সাথে লড়াইয়ের নির্দেশ দেন। হামজা উতবাকে আর আলী শায়বাকে হত্যা করলেন। উবায়দার সাথে ওয়ালিদের লড়াই চলতে লাগলো। তারা একে অপরকে আহত করে ফেলল। এরপর আলী ও হামজা ওবায়দাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। এবার ওয়ালিদ নিহত হলো। এরপর ওবায়দাকে মুসলিম শিবিরে ফিরিয়ে নেয়া হলো।[৩৫]

ব্যক্তি পর্যায়ে এ রূপ লড়াই কুরাইশদের চরম ক্ষতি সাধন করলো। কুরাইশরা এরপর বড় ধরনের আক্রমণ পরিচালনা করলো। রাসূল (সা) অগ্রসরমান কুরাইশ বাহিনীর দিকে তীর নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। তীরের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য তিনি বললেন, "তোমাদের শত্রুরা যখন একেবারে তোমাদের কাছে এসে যাবে তখনই তোমরা তাদের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। তবে বুঝেশুনে তোমাদের তীর ব্যবহার করবে।"[৩৬] উরওয়া ও কাতাদার বর্ণনা মতে, রাসূল (সা) *মুশরিকদের* বিরুদ্ধে নুড়িকণা নিক্ষেপ করেন। এ ব্যাপারে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়। তাতেই বিষয়টির সত্যতা পাওয়া যায়।[৩৭]

> তোমরা তাদেরকে বধ করনি, আল্লাহই তাদেরকে বধ করেছেন এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ করনি। আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন এবং মু'মিনগণকে আল্লাহর পক্ষ হতে উত্তম পুরস্কার দান করার জন্য আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৮ঃ১৭)

দু'বাহিনী যুদ্ধে লিপ্ত হলো। আবু জাহল আমর ইবনে হিশামসহ, (যাকে রাসূল (সা) এ জাতির ফেরাউন বলে আখ্যায়িত করেছিলেন) অনেক *মুশরিক* নেতা নিহত হলো।[৩৮]

মুয়ায ইবনে আমর ইবনুল যামু ও মুয়ায ইবনে আকরার হাতে আমর ইবনে হিশাম নিহত হয়। তারা ছিল যুবক, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ যে পর্যন্ত তাদেরকে আমর ইবনে হিশামের পরিচয় দেন নি সে পর্যন্ত তারা তাকে চিনতে পারেনি। তারা তাকে বলেছিলেন যে, তারা আবু জাহলকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, কারণ আবু জাহল রাসূল (সা) কে অপসারিত করেছিল। বালক দু'টি তাকে আহত করার পর ইবনে মাসউদ তাকে শেষ করে দেন।[৩৯]

উমাইয়া ইবনে খালাফ ছিল আরেক মুশরিক নেতা। যুদ্ধ শেষে আবদুর রহমান বিন আউফ তাকে ও তার ছেলেকে কারারুদ্ধ করেন। বিলাল উমাইয়াকে আঘাত করেন। উমাইয়া বিলালকে মক্কায় নির্যাতন করেছিল। বিলাল তার উদ্দেশে বলেছিলেন "বর্বর নাস্তিক উমাইয়া ইবনে খালাফ। আমি বেঁচে থাকতে সে বাঁচতে পারে না।" তিনি *আনসারদেরকে* সাথে নিয়ে উমাইয়া ও তার ছেলে আলীকে হত্যা করেন।[৪০]

কুরআনের মাধ্যমে এটা সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত যে, আল্লাহ বদর যুদ্ধে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য ফিরিশতা পাঠিয়েছিলেন। *সহীহ* বর্ণনা থেকে জানা যায় ফিরিশতারা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

> বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে আল্লাহ তো তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। স্মরণ কর, যখন তুমি মু'মিনগণকে বলছিলে, 'ইহা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তাঁর প্রেরিত তিন সহস্র ফিরিশতা দ্বারা তোমাদেরকে সহায়তা করবেন'? হ্যাঁ, নিশ্চয় যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং সাবধান হয়ে চল তবে তারা দ্রুতগতিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করলে আল্লাহ পাঁচ সহস্র চিহ্নিত ফিরিশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। ইহাতো কেবল তোমাদের জন্য সুসংবাদ ও তোমাদের চিত্ত-প্রশান্তি-হেতু আল্লাহ করেছেন। এবং সাহায্য শুধু পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতেই হয়। (৩ঃ১২৩-৬)
>
> স্মরণ কর, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে; তিনি তা কবুল করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব এক সহস্র ফিরিশতা দিয়ে যারা একের পর এক আসবে।(৮ঃ৯)
>
> স্মরণ কর, তোমাদের প্রতিপালক ফিরিশতাগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন 'আমি তোমাদের সাথে আছি সুতরাং মু'মিনগণকে অবিচলিত রাখ'। যারা কুফরী করে আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব; সুতরাং তাদের স্কন্ধে ও সর্বাঙ্গে আঘাত কর। (৮ঃ১২)

'*ইদরিবূ*'কে এখানে ফিরিশতা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

তাবারীতে *ইদরিবূ* বলতে মানুষকে বুঝানো হয়েছে বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিভাবে আঘাত করতে হবে তা আল্লাহ শিখিয়েছেন।[৪১]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন ঃ

ইবনে আব্বাস বলেন, ঐদিন যখন জনৈক মুসলিম এক *মুশরিকের* পিছু ধাওয়া করছিলেন, তিনি তার মাথার উপর বেত্রাঘাতের শোঁ শোঁ শব্দ শুনছিলেন। আর আরোহী বলছিল ঃ "হাইজাম এগিয়ে যাও।[৪২] তিনি মাটিতে পড়ে থাকা *মুশরিকের* দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তিনি যখন সাবধানে তার দিকে দেখছিলেন, দেখলেন তার নাকের উপর আঘাতের দাগ। তার মুখমন্ডল এমনভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে যে, যেন তার মুখের উপর বেত্রাঘাত করা হয়েছে। তার মুখ নীলাভ হয়ে গেল।" এ সময় জনৈক আনসার রাসূল (সা)এর কাছে এসে ঘটনাটি বললেন। রাসূল (সা) উত্তরে বললেন, "তুমি সত্যিই বলেছ। এটা ছিল তৃতীয় এক দুনিয়ার সাহায্য"।[৪৩] (সহীহ মুসলিম থেকে অনুদিত)

আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকে জনৈক *আনসার* আটক করলো। আব্বাস বললো-

> "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম করে বলছি এ লোক আমাকে আটক করেনি। জনৈক টাকওয়ালা, সুন্দর মুখশ্রী, চিত্রবিচিত্র ঘোড় সওয়ারী ব্যক্তি আমাকে আটক করে। আমি এখানে তাকে দেখতে পাচ্ছিনা। *আনসার* লোকটি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল লোকটিকে আমি ধরেছি।"রাসূল জবাবে বললেন, শান্ত হও। আল্লাহ তোমাকে জনৈক মহান ফিরিশতার সাহায্যে শক্তিশালী করেছেন।[৪৪]
>
> আল উমাবীর *মাগাযী* গ্রন্থে হাসান সনদসহকারে এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন :
>
> রাসূল (সা) তার তাঁবুতে ঝিমুনি খাচ্ছিলেন। তিনি জেগে উঠে বললেন, "আবু বকর, আনন্দ কর, তোমার প্রতি আল্লাহর সাহায্য সমুপস্থিত। এটি হলো জিবরাঈল। মাথায় পাগড়ি, ঘোড়ার লাগাম হাতে, কালো ধুলোতে সওয়ার হয়েছেন। তোমার জন্য আল্লাহর সাহায্য ও শক্তি প্রেরণ করা হয়েছে।"[৪৫]
>
> নীচের হাদীস *সহীহ* বুখারীতে বর্ণিত আছে-
>
> জিবরাঈল রাসূল (সা) এর কাছে এসে বললেন, "আপনার সাথে বদর ময়দানে যারা যুদ্ধ করেছে তাদের ব্যাপারে আপনি কেমন মনোভাব পোষণ করেন? রাসূল (সা) উত্তরে বললেন, "মুসলমানদের মধ্যে তারা সবচেয়ে সেরা মুসলমান (অথবা তিনি এ জাতীয় কিছু বলেছিলেন) জিবরাঈল বললেন, "যেসব ফিরিশতা বদর যুদ্ধে সাহায্য করেছে তাদের ব্যাপারে আমি একই মনে করি।[৪৬]

বদর যুদ্ধে ফিরিশতাদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে এগুলো হলো *সহীহ* হাদীস। জিবরাঈল একাই যখন *মুশরিকদের* ধ্বংস করে দিচ্ছিলেন তখন আল্লাহ অনেকগুলো ফিরিশতা প্রেরণ করেন। বিষয়টি আল সুবকী বয়ান করেন।

প্রকৃত যুদ্ধ যাতে রাসূল (সা) ও তার সাহাবীগণ চালিয়ে নিতে পারেন সে জন্য এরূপ ঘটনা ঘটানো হয়। ফিরিশতাদেরকে তাদের শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশে তাদের সাহায্যে প্রেরণ করা হয়। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির জন্য যেসব নিয়ম কানুন বেঁধে দিয়েছেন তার মাধ্যমেই আল্লাহ এরূপ সাহায্য প্রেরণ করেন। সব কাজই আল্লাহর নির্দেশে হয়। আল্লাহ সব কিছুর পেছনে সর্ব শক্তিমান হিসাবে কাজ করেন। তিনি সর্বজ্ঞ।[৪৭]

কোন কোন মুসলিম লেখক বদর যুদ্ধে ফিরিশতাদের অংশগ্রহণের বিষয়টিকে এড়িয়ে গেছেন। বস্তুগত দর্শনের কাছে এভাবে এড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টি আমাদের জন্য পরাজয়ের নমুনা। বস্তুগত বিষয়ের উপর বিশ্বাস তো ক্ষণস্থায়ী। রাসূল মুহাম্মদ (সা) এর উপর বিশ্বাস থাকলে ফিরিশতাদের অংশগ্রহণের বিষয়টির ওপর বিশ্বাস করতে হবে।

মুশরিকদের পতন শুরু হয়ে গেল। ৭০ জন নিহত হলো, ৭০ জন বন্দী হলো[৪৮]। *মুশরিকদের* কেউ কেউ রাসূল (সা) এর পূর্ব নির্দেশিত স্থানে পতিত হলো। সাহাবীদের সাথে রাসূল (সা) ঐসব *মুশরিকদের* পতনের কথা যুদ্ধের পূর্বেই বর্ণনা করেছিলেন।[৪৯] *মুশরিকরা* যুদ্ধে নিয়ে আসা অনেক মালপত্র যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল।

রাসূল (সা) যুদ্ধে নিহত *মুশরিকদের* মৃত দেহ এক কুয়ার কাছে নিয়ে আসতে বললেন। মৃত *মুশরিকদেরকে* এ কুয়ার মধ্যে নিক্ষেপ করা হলো। রাসূল (সা) তিনদিন বদর প্রান্তরে অবস্থান করেন। শহীদ মুসলিমদের তিনি এখানে সমাধিস্থ করেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় চৌদ্দজন এখানে শহীদ হয়েছেন।[৫০] ইবনে হাজার *আল ইসাবাহ* গ্রন্থে আরও দু'জন শহীদের কথা উল্লেখ করেছিলেন।[৫১] রাসূল (সা) তাদের উপর জানাযা করেছেন এমন কোন তথ্য উল্লেখ করা হয়নি; শহীদদের উপর জানাযা না করা রাসূলের সুন্নাত। মদীনায় সমাধিস্থ করার জন্য কোন শহীদকেই বদর থেকে স্থানান্তর করা হয়নি।

যে ২৪ জন কুরাইশ নেতার মৃতদেহ কুয়ায় ফেলে দেয়া হয়েছিল রাসূল (সা) তাদের ও তাদের পিতার নাম ধরে ধরে বলছিলেন, "তোমরা কি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের কথামত কাজ করে খুশি হয়েছ? দেখ, আমাদের প্রভুর ওয়াদা কিভাবে সত্যে পরিণত হয়। তোমরা কি তোমাদের প্রভুর কোন ওয়াদা সত্যে পরিণত হতে দেখেছ?" রাসূল (সা) কে উমর (রা) এ অবস্থায় দেখে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কেন মৃত দেহদের কাছে কথা বলছেন, তাদের তো কোন প্রাণ নেই?" রাসূল (সা) জবাব দিলেন, "যার হাতে মুহাম্মদের জীবন তার নামে শপথ করছি, তারা যা শুনছে তুমি তাঁর চেয়ে বেশী শুনছ না।"

কাতাদা বললেন, "আল্লাহ তাদেরকে (আবার) জীবন দান করেছেন, যাতে তারা রাসূলের ঘৃণার, অপমানের ও ভর্ৎসনার, অনুশোচনা ও দুঃখবোধের কথা শুনতে পায়।"[৫২]

বদর যুদ্ধের পর রাসূল (সা) আর আবু সুফিয়ানের বর্ণিত দলকে অনুসরণ করেননি। আল্লাহর রাসূল (সা) দু'টি দলের একটির উপর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আল্লাহ *মুশরিক* সেনাবাহিনীর উপর তাঁকে জয়ী করে তাঁর ওয়াদা পূরণ করেন।[৫৩]

রাসূল (সা) কোন কোন *মুশরিককে* না মারতে বলেন। এর কারণ ঐ লোকগুলো অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের দলের লোকদের ভয়ে যুদ্ধে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এ লোকগুলোর কেউ কেউ মক্কায় থাকা অবস্থায় রাসূল (সা) কে সাহায্য করেছিল। রাসূল (সা) এদের মধ্যে আব্বাস ইবনে আব্দুল মোত্তালিব, আবু বকতারী ইবনে হিশামের নাম উল্লেখ করেন।[৫৪] তিনি তাদেরকে আটক করতে বলেন, এবং হত্যা করতে নিষেধ করেন।[৫৫] আল আব্বাস ইবনে আব্দুল মোত্তালেবকে বন্দী করা হলো। আবু আল বকতারী যুদ্ধ করতে চাইলে তাকে হত্যা করা হয়।[৫৬]

রাসূল (সা), আবু বকর ও উমর (রা) বন্দীদেরকে নিয়ে কি করবেন পরামর্শ করলেন। আবু বকর তাদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়ার কথা বললেন।[৫৭] তাঁর যুক্তি ছিল তাদের এ মুক্তিপণ কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের সামর্থ বাড়াবে। আল্লাহ তাদেরকে ইসলামের সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারেন।" উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাদের হত্যার কথা বললেন। তাঁর যুক্তি ছিল, "তারা *কাফিরদের* নেতা"। রাসূল (সা) মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত করে দেয়ার পরামর্শটিকে সমর্থন করলেন। কিন্তু এর পরক্ষণেই নিম্নবর্ণিত *আয়াত* নাযিল হয়-

> সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়; মনে হচ্ছিল তারা যেন মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে আর তারা যেন তা প্রত্যক্ষ করছে। স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দু'দলের একদল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে। অথচ তোমরা চাচ্ছিলে যে, নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তাধীন হোক আর আল্লাহ চাচ্ছিলেন যে, তিনি সত্যকে তাঁর বাণী যারা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফিরদেরকে নির্মূল করেন। ইহা এজন্য যে তিনি সত্যকে সত্য ও অসত্যকে অসত্য প্রতিপন্ন করেন, যদিও অপরাধীগণ তা পছন্দ করে না। স্মরণ কর, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে; তিনি তা কবুল করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব এক সহস্র ফিরিশতা দিয়ে যারা একের পর এক আসবে। (৯ঃ৬ - ৯)।

এ আয়াতে কাফির নেতাদেরকে হত্যা করার বদলে মুক্তিপণ আদায়ের বিষয়টিকে ভর্ৎসনা করা হলো। তবে তারা মুক্তিপণ হিসাবে যা গ্রহণ করেছে তাকে জায়েয বলা হয়েছে। ইসলামের প্রথম যুগে এটা রীতি ছিল; এরপর নেতাদেরকে হত্যা করা বা মুক্তিপণ নেয়া বা মুক্তিপণ ছাড়া মুক্ত করে দেয়ার ব্যাপারে এখতিয়ার দেয়া হলো! তবে নারী ও শিশুদের জন্য এটা প্রযোজ্য ছিল না। তাদেরকে হত্যা করা ছিল নিষিদ্ধ।[৫৮]

বন্দীদের মুক্তিপণ ছিল বিভিন্ন রকমের। যারা ধনী ছিল তারা ৪,০০০ (চার হাজার) দিরহাম পর্যন্ত মুক্তিপণ দিয়েছে।[৫৯] রাসূল (সা) এর কন্যা জয়নব তার স্বামী

আবু আল আস ইবনে আল রাবীর মুক্তিপণ দেন তাঁর নিজের গলার হার। সাহাবীগণ রাসূল (সা)-এর প্রতি সম্মানস্বরূপ বন্দীকে মুক্তি দিলেন এবং তাঁর গলার হারটিও ফেরৎ দিলেন।[৬০] কোন বন্দী মুক্তিপণ দিতে অসমর্থ হলে তাকে *আনসারদের* ছেলেমেয়েদেরকে লেখাপড়া শিখাতে হতো।[৬১] বন্দীদের মনোবলের কথা বিবেচনা করে মুসলমানগণ তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ নেয়ার ব্যাপারে এতবেশী আগ্রহী ছিলেন না। রাসূল (সা) বললেন "আল মুতিম ইবনে আদী জীবিত থেকে এ মৃত লোকগুলোর পক্ষে মুক্তিপণ পরিশোধ করলে আমি তাদেরকে বিনা মুক্তিপণে মুক্ত করে দিতাম।[৬২]

আল আব্বাসকে *আনসারগণ* রাসূল (সা)-এর চাচা হওয়ার কারণে মুক্তিপণ দেয়া থেকে অব্যাহতি দিতে চাইলেন। তাছাড়া আব্বাসের পিতামহ *আনসারদের* কারোর নিজের লোক ছিলেন। কিন্তু রাসূল (সা) বললেন "তাকে এক *দিরহামও* কম করা যাবে না।"[৬৩] রাসূল (সা) এর চাচা হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য কোন মাফ নেই। আল্লাহ আর আল্লাহর রাসূল (সা) এর কাছে বিচারে সবাই সমান। এর সাথে একটি ঘটনা হলো আল আব্বাস রাসূল (সা)-কে বলেছিলেন যে, তিনি মুসলিম ছিলেন। অনিচ্ছাকৃত ভাবেই যুদ্ধের সময় তিনি বাইরে ছিলেন।[৬৪] আল আব্বাসকে এর জন্য ১০০ *উকিয়া* (কোন ওজনের স্বর্ণ) মুক্তিপণ হিসাবে দিতে হয়েছিল, মুক্তিপণ হিসাবে আকিল ইবনে আবু তালিবকে আমি এবং অন্যান্য অনুরূপ বন্দীদেরকে দিতে হয়েছিল চল্লিশ *উকিয়া* করে।[৬৫]

যুদ্ধে লব্ধ গণিমত সম্পর্কে বিতর্ক দেখা দিল। গণিমত কিভাবে বিতরণ করা হবে এমন কোন দিক নির্দেশনা তখনো আসেনি। উবাদা ইবনে আল সামিত বললেন, "আমরা রাসূল (সা) এর সাথে বেরিয়ে গেলাম। আমি তার সাথে বদর যুদ্ধের অবস্থা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। যুদ্ধ শুরু হলো; আল্লাহ শত্রুদেরকে পরাজিত করলেন। মুসলমানগণ কেউ কেউ শত্রুদের ধাওয়া করেন। কেউ কেউ শত্রু শিবির হতে গণিমতের মাল সংগ্রহে ব্যস্ত ছিল। অন্যরা রাসূল (সা)-কে পাহারা দিচ্ছিল। ভয় ছিল মুশরিকরা রাসূল (সা)-কে আক্রমণ করতে পারে। এ ভয়ে তাঁকে পাহারা দেয়া হচ্ছিল। রাত হয়ে গেলে মুসলমানগণ জড় হলো। যারা গণিমত সংগ্রহ করলো তাদের কেউ কেউ বলল : "আমরাই গণিমত দখল করেছি। সুতরাং এটা আমাদেরই।" যারা শত্রুদেরকে পরাজিত করেছিল তারা বললো, "গণিমতের ওপর আমাদের চেয়ে তোমাদের বেশি অধিকার নেই। আমরাই শত্রুদেরকে পরাজিত করে তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছি।" যারা রাসূল (সা)-কে পাহারা দিচ্ছিলেন তারা বললেন ঃ গণিমতের ওপর তোমাদের চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশী।

আমরা ভয় পাচ্ছিলাম যে কখন হঠাৎ করে শত্রুরা আমাদের ওপর হামলা চালায়, সে জন্যে আমরা তাঁর পাহারার ব্যবস্থা করি।" এ পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত আয়াত নাযিল হয় -

> তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে; বল, যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ আল্লাহ এবং রাসূলের; সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজদের মধ্যে সদ্‌ভাব স্থাপন কর, এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মু'মিন হও। (৯ঃ১)

রাসূল (সা) এ অবস্থার পর যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিলেন।[৬৬] *সহীহ* হাদীসে বর্ণিত আছে রাসূল (সা) যুদ্ধে লব্ধ মালামালের এক পঞ্চমাংশ নিজে গ্রহণ করে বাকীগুলো যোদ্ধাদের মধ্যে ভাগ করে দেন।[৬৭] রাসূল (সা) এর এক পঞ্চমাংশ গ্রহণের সাথে সাথে অন্যান্য আয়াতও নাযিল হয়।[৬৮] এ আয়াতগুলো বদর যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল।

> আরও জেনে রাখ যে, যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর রাসূলের, রাসূলের স্বজনদিগের, ইয়াতীমদের, দরিদ্রদের এবং পথচারীদের। যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহর এবং সত্যাসত্য মীমাংসার দিনে, যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছিলাম যখন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। (৮ঃ৪১)

রাসূল (সা) যুদ্ধে লব্ধ মালামালের একটা অংশ নয়জন সাহাবীর মধ্যে ভাগ করে দিলেন। এ নয়জন যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। তাদেরকে তখন মদীনায় কাজ করতে বলা হয়েছিল, তারা বদর যুদ্ধে আসার সময় আহত হওয়ার কারণে বা অন্য কোন কাজে তাদের মদীনায় থাকতে বলা হয়েছিল। তাদের মধ্যে উসমান ইবনে আফ্‌ফান ছিলেন একজন। তাঁর স্ত্রী রুকাইয়্যা অসুস্থ ছিলেন। রাসূল (সা) তাঁকে দেখাশুনার জন্য আফ্‌ফাসকে বলেছিলেন।[৬৯] যুদ্ধ লব্ধ সম্পদের ব্যাপারে নির্দেশনা স্পষ্ট করে দেয়ার পর আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সা) সিদ্ধান্ত সবাই মেনে নিলেন আর সকল বিবাদ মিটে গেল। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রদত্ত প্রত্যেকটি স্পষ্ট সিদ্ধান্তের ব্যাপারেই সাহাবীগণ একই মনোভাব পোষণ করতেন। মদীনায় ফেরার পথে আল সাফরায় গণিমত ভাগ করা হয়। জায়েদ ইবনে হারিসা শুভ সংবাদ নিয়ে মুসলিম শক্তির অগ্রভাগে মদীনায় ফিরে এলেন। মুসলিমগণ এ শুভ সংবাদে খুশি হলেন। কিন্তু ভয়ে ভয়ে ছিলেন এভাবে যে, এ সংবাদ সঠিক নাও হতে পারে। উসামা বললেন, "আল্লাহর কসম করে বলছি, বন্দীদের না দেখা পর্যন্ত আমি এ সংবাদ বিশ্বাস করবো না।[৭০] তার কথা শুনে সবাই হতবাক হয়ে গেল। কুরাইশরা কি পরাজিত হয়েছে? তাদের নেতাদেরকে কি কারারুদ্ধ করা হয়েছে? তাদের দম্ভ কি চুর্ণবিচূর্ণ হয়েছে? তাদের দেব দেবীর অসারতা কি মানুষের কাছে উম্মোচিত হয়েছে? রাসূল (সা) এর স্ত্রী সওদা (রা) ও এরূপ বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। তিনি আবু ইয়াজিদ সুহাইয়েল ইবনে আমরের হাত গলার সাথে বাঁধা অবস্থায় দেখে বলেছিলেন, "তুমি কি এত তাড়াতাড়ি আত্মসমর্পণ করলে? তোমার কি মহান মৃত্যু কাম্য ছিল না"? তাঁর এ কথা শুনে রাসূল (সা) জবাবে বললেন, "তুমি কি আল্লাহ আর আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে বিবাদ উস্কে দিচ্ছ?" সওদা তখন বললেন "হে আল্লাহর রাসূল, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর কসম করে বলছি, আমি যখন আবু ইয়াজিদকে এ অবস্থায় দেখেছি তখন আমি নিজকে সংবরণ করতে পারছিলাম না, সেজন্যই আমি এ রূপ বলেছি"।[৭১]

মদীনার দিকে আসতে আসতে রাসূল (সা) দু'বন্দীকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। দু'জন বন্দী ছিল নাদির ইবন আল হারিছ ও উকবা ইবনে আবু মুইয়িত। এ লোকগুলো

মক্কায় মুসলমানদেরকে নির্যাতন করে এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের প্রতি চরম ঘৃণা পোষণ করে।[৭২] তারা কাফের ও যুদ্ধাপরাধীদের নেতা ছিল। তাদের মৃত্যুদণ্ড নির্যাতনকারীদের জন্য ছিল বিভীষিকার উদাহরণ। তাদের মৃত্যুদণ্ড দেখে উকবা তার সব অহমিকা ভুলে গিয়ে চিৎকার করে বলল "হে আল্লাহর রাসূল! আমার সন্তানদেরকে কে দেখাশুনা করবে?" রাসূল (সা) উত্তরে বললেন, " দোযখের আগুন"।[৭৩] উতবা কি সেদিনের কথা মনে করছিল না যেদিন সে রাসূল (সা)কে নামায আদায়ের সময় তাঁর ঘাড়ের উপর উটের নাড়িভূড়ি নিক্ষেপ করেছিল আর ফাতিমা রাসূল (সা) এর এ আবর্জনা ধুয়ে দিয়েছিলেন?[৭৪]

রাসূল (সা) অবশিষ্ট বন্দীদের সাথে ভাল আচরণের জন্য তাঁর সাথীদেরকে নির্দেশ দিলেন। মুসাব ইবনে উমায়েরের হাতে তার ভাই আবু আজিজ বন্দী হয়। দুপুরে ও রাতে সময় তাকে খাবার হিসাবে রূটী দেয়া হতো আর খেজুর তাদের নিজেদের জন্য রেখে দেয়া হতো। রাসূল (সা)-এর নির্দেশ অনুসারেই তাঁর অনুসারীগণ বন্দীদের সাথে উত্তম আচরণ করেছিলেন। তারা যে রুটি তাদের ভাগে পেতেন তার পুরোটাই তাকে দিয়ে দিলেন। আবু আজীজ সাহাবীদের এ অবস্থা দেখে বলেছিল "এ অবস্থা দেখে আমি বিব্রত হলাম। সে জন্য আমি রুটী ফেরত দিতে চাইলাম। কিন্তু মুসলিম সাহাবী তা নিতে চাইলেন না এবং ধরে দেখতেও চাইলেন না।"[৭৫] এ ব্যাপারটির মাধ্যমে ইসলামে বন্দীর প্রতি কিরূপ আচরণ করা হতো তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বন্দীকারী তার বন্দীকে তার যা ছিল তা দান করে উত্তম আচরণ করেছিল। অন্য কোন জাতির ইতিহাসে এরূপ উদাহরণ বিরল।

বদর যুদ্ধ একটি ছোট্ট যুদ্ধ হলেও ইসলামের ইতিহাসে এটা ছিল একটা যুগান্তকারী ঘটনা। এ জন্যে কুরআনে এটাকে পার্থক্য সৃষ্টিকারী দিন বা *ইয়াওমুল ফুরকান* বলা হয়। সত্য ও মিথ্যার মধ্যে প্রভেদকারী দিন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এদিন ইসলাম বিরাট সাফল্য অর্জন করে। দুনিয়াবী স্বার্থ উচ্চাকাংখা বা সম্পর্কের বেলায় ইসলাম এখন ঈমানদারদের হৃদয়ে সম্মানজনক স্থান লাভ করলো। যুদ্ধ শুরুর পূর্বে আনসারগণ ঘোষণা করেছিলেন যে, লিখিত চুক্তির মধ্যেই শুধু তাদের আকীদা সীমাবদ্ধ ছিল না, যে আকীদার কথা তারা আকাবার দ্বিতীয় শপথের সময় গ্রহণ করেছিলেন, তারা ছিলেন অনুগত সৈনিক দ্বীনের জন্য কোন শর্ত ছাড়াই তারা যেকোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন। যুদ্ধের সময় *মুহাজিরগণ* তাদের আত্মীয় স্বজনের মোকাবেলা করেছিলেন। এ সময়ে পুত্র পিতার, ভাই-ভাইয়ের মোকাবেলা করেছিলেন। পারিবারিক বন্ধন *মুহাজিরদেরকে* যুদ্ধের সময়ে আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করতেও বাধা সৃষ্টি করেনি। এর কারণ ঈমানী শক্তি তাদের সকল সম্পর্কের ও অঙ্গীকারের উর্ধ্বে স্থান পেয়েছিল। যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তারা সবচেয়ে বড় সম্মান সূচক উপাধী '*বদরী*' লাভ করেছিলেন। উমর (রা) সাহাবীদের যে তালিকা প্রণয়ন করেছিলেন সে তালিকায় বদর যুদ্ধে যারা শরীক হয়েছিলেন তাদের নামই সর্বাগ্রে স্থান পায় আর তাঁরা রাষ্ট্র থেকে সবচেয়ে বেশী ভাতা লাভ করেছিলেন। এসব সাহাবীদের নামই জীবনেতিহাসের প্রথম

পৃষ্ঠায় স্থান লাভ করে। তাদের জীবদ্দশায় তারা বস্তুগত পুরস্কার, সম্মান ও স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।

রাসূল (সা)-এর সহীহ হাদীস সমূহে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাদের স্থান হবে বেহেশতে হাদীসে এর উল্লেখ করা হয়েছে।

বদর যুদ্ধে হারিছা ইবনে সুরাকা আল আনসারী শহীদ হন; তিনি ছিলেন বয়সে তরুণ। তাঁর মা রাসূল (সা) এর কাছে এসে আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি জানেন হারিছা আমার কাছে কেমন ছিল। সে যদি বেহেশতে গিয়ে থাকে আমি আমার কষ্ট ভুলে যাবো আর আল্লাহর কাছে আমার পুরস্কার চাইব। কিন্তু সে যদি বেহেশতে না যায় তখন আপনি আমাকে দেখবেন।" রাসূল (সা) তাঁর এ কথা শুনে বললেন। "আপনার উপর রহমত বর্ষিত হোক। আপনি কি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন? বেহেশতের অনেকগুলো শ্রেণী আছে, তাঁকে সবচেয়ে উচ্চতম শ্রেণীতে স্থান দেয়া হবে।"[৭৬]

হাতিব ইবনে বালতা'র ব্যাপারে বলা হয় যে, মুসলমানগণ মক্কা জয় করতে আসছেন এ সংবাদটি তিনি কুরাইশদেরকে দিয়েছিলেন। রাসূল (সা) বলেছিলেন, যারা বদর যুদ্ধ করেছিলেন, তাদেরকে আল্লাহ দেখবেন। রাসূল (সা) বলেন, "বেহেশতে তোমরা যাই ইচ্ছা তাই কর। বেহেশত তোমাদের জন্য অথবা আমি তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিয়েছি।"[৭৭]

হাতিবের ভৃত্য বললেন, " হে আল্লাহর রাসূল, হাতিব অবশ্যই দোযখে যাবে।" রাসূল (সা) এ সময় বললেন, "তা ঠিক নয়। সে কখনো দোযখে যাবে না, কারণ সে বদরযুদ্ধ ও হুদায়বিয়ার সন্ধি দেখেছে।"

বদর যুদ্ধের ফলাফল মক্কা মদীনার উপর বিরাট প্রভাব ফেলে। পুরো আরব উপদ্বীপের উপরই এ যুদ্ধ প্রভাব ফেলেছিল। মদীনার মুসলমানগণ ইহুদী ও *মুশরিকদের* উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করছিল। ইহুদীরা বদর যুদ্ধের ফলাফলে হতাশ হয়ে উষ্মা প্রকাশ করছিল। যুদ্ধের অপ্রত্যাশিত ফলাফল তাদেরকে ক্রুদ্ধ করে তুললো এবং তাদের মধ্যে সুপ্ত বিরুক্তি ও ক্রোধের ভাব সৃষ্টি করলো। তারা এমন শত্রুতাপূর্ণ কাজ করতে লাগলো যে, মদীনা থেকে বানু কায়নুকাকে বের করে দিতে হলো।[৭৮]

এ সময় অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করলো। তবে তাদের অনেকের মনেই ছিল গোপন স্বার্থ। তাদেরকে বাঁচানোর জন্য তারা তখন ইসলাম কবুলের কথা ঘোষণা করেছিল, মুসলমানগণ ছিলেন তখন ক্ষমতার শীর্ষে। তারা ছিল মুনাফেক। তারা তাদের অন্তরে কুফরীকে গোপন রেখেছিল। মুনাফিকদের নেতা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল।

কুরাইশদের কাছে বিষয়গুলো বিশ্বাস হচ্ছিল না। তাদের নেতা ও বীরদের এ যুদ্ধে হত্যা করা হয়। মুরসাল বর্ণনা থেকে জানা যায় এ সময় তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। মৃতদের জন্য কান্নাকাটি আর শোক প্রকাশ করতে কুরাইশদেরকে না করা হয়েছিল।

তাদের শোক প্রকাশে মুসলমানগণ স্ফুর্তি করতে পারে এ ভয়ে তাদেরকে শোক প্রকাশে নিষেধ করা হয়েছিল[৭৯]। তারা রাসূল (সা) কে হত্যার জন্য উমায়ের ইবনে ওহাব আল যুমাহীকে নিয়োগ করে। উমায়েরের মৃত্যু হয়ে গেলে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া তার পরিবারের দায়িত্ব নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিল। উমায়ের রাসূল (সা) কে হত্যার জন্য তরবারী হাতে মদীনায় যায়। উমায়ের মদীনার মসজিদে হাজির হলে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাকে ধরে ফেলেন, এবং রাসূল (সা) এর কাছে নিয়ে যান। রাসূল (সা) তাকে সে কি জন্য এসেছিল জিজ্ঞাসা করেন। উমায়ের রাসূল (সা)-কে মিথ্যা বললো। সে কয়েকজন বন্দীর মুক্তির জন্য এসেছিল বলে রাসূল (সা)-কে জানায়। রাসূল (সা) তাকে তার আসল উদ্দেশের কথা বললেন, মারওয়ান ও সাফওয়ানের মধ্যেকার চুক্তির কথা জানালেন। তাদের মধ্যেকার গোপনীয় চুক্তির কথা রাসূল (সা) এর মুখ থেকে শোনার পর উমায়ের ইসলাম কবুলের কথা ঘোষণা করলো। আর মক্কার লোকদেরকে ইসলামের পথে আহবানের অনুমতি চাইল।[৮০] কুরাইশদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য কুরাইশরা দু'জন মুসলিম বন্দীকে নিয়ে এলো। এ দু'জন মুসলিমকে আল বাজীর ঘটনার সময় বন্দী করা হয়। কুরাইশরা তাদের দু'জনকে হত্যা করে, এ দু'জনের নাম খুবাইব ও জায়েদ ইবনু দাসিনা।[৮১]

বদর যুদ্ধের পর প্রচারাভিযান

কারকারা আল কুদর

কুরাইশদের উপর মুসলমানগণ যে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করেছিলেন তা বজায় রাখার কাজে তারা ব্যস্ত ছিলেন। কোন কোন গোত্র যারা কুরাইশদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভবান হয়েছিল এবং তাদের দেশের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া বাণিজ্য পথ দিয়ে উপকৃত হয়েছিল তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য সৈন্যবাহিনী গঠনের চেষ্টা করলো। যেমন, বণি সালিম ও গাতাফান এ উদ্দেশে কারকারাহ আল কুদর-এ সমবেত হলো। কারকারাহ ছিল বনি সালিমের অধীনে একটি পানি সরবরাহের স্থান। রাসূল (সা) এ পানি সরবরাহের স্থানে হঠাৎ করে এক অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু সেখানে কেবল উটই পাওয়া যায়। রাসূল (সা) এর আগমনের কথা শুনে বিরোধী যোদ্ধারা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। রাসূল (সা) সেখানে তিন দিন অপেক্ষা করে ফিরে আসেন। ইবনে সাঈদ সনদ ছাড়াই বলেন, এখানে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ হিসাবে ৫০০ উট আর ২০০ যোদ্ধাকে পাওয়া যায়।[৮২]

সাবিকের অভিযান

আবু সুফিয়ান প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশে মক্কা থেকে ২০০ অশ্বারোহীসহ এসে মদীনার পার্শ্ববর্তী স্থানে বনি নাযিরের কাছে এসে আশ্রয় নিল। এর পর আবু সুফিয়ান মদীনার বাইরে হাব্বা ওয়াকিমের পার্শ্বে উবায়েদ উপত্যকায় এক আক্রমণ পরিচালনা করে। এ আক্রমণে দু'জন শহীদ হন[৮৩]। খেজুর বৃক্ষ ধ্বংস হয়। এরপর সে আবার মক্কার দিকে পালিয়ে যায়। মুসলমানগণ কারারাহ আল কুদর পর্যন্ত তাকে ধাওয়া করে

নিয়ে যান, তবে তাকে ধরা যায়নি। পথিমধ্যে *মুশরিকদের* ফেলে যাওয়া *সাবিক* (এক প্রকার খাদ্যদ্রব্য বিশেষ) নিয়ে মুসলিম যোদ্ধাগণ ফিরে আসেন। *মুশরিকরা* তাদের বাহনকে হাল্কা করার জন্য ও দ্রুত পালিয়ে যাবার জন্য এ খাদ্যদ্রব্য রাস্তায় রেখে যায়। এরপর থেকে এ অভিযান সাবিকের অভিযান নামে খ্যাত হয়।[৮৪]

যু আমরের অভিযান

সাবিকের অভিযানটি পরিচালিত হয় হিজরীর তৃতীয় বৎসরের জিলহাজ্জ মাসে। এক মাস পরে রাসূল (সা) গাতাফা গোত্রের বিরুদ্ধে নজদে এক অভিযান পরিচালনা করেন। এ অভিযানের জন্য যু আমর এ রাসূল (সা)-এর বাহিনী সমবেত হন। রাসূল (সা) অভিযান পরিচালনার পূর্বেই গাতফানরা পালিয়ে যায়, ফলে সেখানে আর কোন যুদ্ধ হয়নি। সফর মাস রাসূল (সা) তাদের ভূ-খন্ডে অবস্থান করে মদীনায় ফিরে আসেন। এ অভিযানটি যু আমরের অভিযান নামে পরিচিত।[৮৫] আল ওয়াকিদ ও ইবনে সা'দ বলেন যারা যু আমরের জলাধারের স্থানে সমবেত হয়েছিল তারা ছিল বনি সালাবাহ ইবনে মুহারিবের লোক। এরা ছিল আবার গাতাফান-এর উপগোত্রের লোক। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৪৫০ এর মতো। সীরাত বিশেষজ্ঞ ইবনে হিশাম এর তারিখ সম্বন্ধে দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁর মতে হিজরীর তৃতীয় বৎসরের বৃহস্পতিবারই রবিউল আওয়াল তারিখে যু আমরে তারা সমবেত হয়েছিলেন।[৮৬]

বাহ্‌রানের অভিযান

রাসূল (সা) মক্কা ও সিরিয়ার বাণিজ্যপথের মাঝামাঝি ফুরু এলাকায় বাহরানের অভিযান পরিচালনা করেন। তবে এখানে কোন যুদ্ধ হয়নি।[৮৭] আলওয়াকিদীর মতে রাসূল (সা) এ অভিযানের সময় মদীনা থেকে দূরে দশদিন অবস্থান করেন।[৮৮] ইবনে সা'দের মতে এ সময় মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩০০।[৮৯]

কারাদা অভিযান ঃ

কুরাইশগণ নজদ থেকে ইরাকের দিকে চলে যাওয়া বাণিজ্য পথ ব্যবহারের মাধ্যমে মুসলমানদের আরোপিত বাণিজ্য অবরোধকে পরিহার করতে চেয়েছিল। আবু সুফিয়ান ও কুরাইশ কিছু বণিকদল বাণিজ্য পথে রওয়ানা হয়। রাসূল (সা) তাদের গতিরোধ করার জন্য কায়েদ ইবনে হারিছাকে পাঠান। তিনি নজদ এর কারাদাহ নামক জলাধার এলাকায় আবু সুফিয়ানের বণিক দলের সাথে মুখোমুখি হন। কুরাইশরা এসময় সব মালামাল রেখে পালিয়ে যায়। বদর যুদ্ধের ছয়মাস পর এ ঘটনা সংগঠিত হয়।[৯০] ইবনে সা'দের মতে যায়েদ ইবনে হারিছার সাথে ছিল মাত্র ১০০ জন মুসলিম সৈন্য। বণিকদল ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) দিরহাম রৌপ্য মুদ্রা নিয়ে যাচ্ছিল। এ মুদ্রার মূল্য ছিল ১,০০০ (এক হাজার) দিরহাম।[৯১] এ ঘটনার মাধ্যমে মুসলমানগণ নতুন বাণিজ্যপথ খোলার কুরাইশ পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেন। অর্থনৈতিক অবরোধকে আরও সংহত করা হলো। এর ফলে মক্কার বাণিজ্যিকে অর্থনীতিতে এ অবরোধের বিরাট একটা প্রভাব পড়ে। কুরাইশদের সামনে অন্য কোন বিকল্প পথ খোলা রইল না। তাদের অর্থনীতি আর সুখ্যাতির স্বার্থে তাদেরকে চূড়ান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়েছিল।

পাদটীকা ঃ

১. আলী ইবনে আহমাদ ইবনে সা'দ ইবনে হাজম, *জাওয়ামী আল সীরাহ*, ১০৭। এ সম্পদের মূল্য ধরা হয়েছিল, ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) দিরহাম, তারা তাদের বাণিজ্যে এক দিনারের বদলে এক দিনার উপার্জন করে। (আল ওয়াকিদী, *আল মাগাযী*, ১/২০০; আল বালা যুরী, *আনসাব আল আশরাফ*, ১/৩১২।

২. মুসলিম, *আল সহীহ, হাদীস* নং ১১৫৭ এ হাদীসে "বিসবাসের" বদলে বাসিসাহ উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনে হাজার বলেন, শুদ্ধ হলো "বিসবাস"। *আল ইসাবাহ* ১/১৫১।

৩. ইবনে সা'দ *আল তাবাকাত*, ২/২৪, মিশরীয় সংস্করণ, ইকরিমার সমর্থনে *সহীহ মুরসাল ইসনাদ* যুক্ত।

৪. *শারাহ আল নাবাবী আলা সহীহ মুসলিম (সহীহ মুসলিমের* ওপর আল নবাবীর ভাষ্য), ১২/৮; আল বুখারী তাঁর রিপোর্টে বলেছেন, ২১৬ এবং ২১৯ এর মধ্যে"। ইবনে হাজার *ফতহুল বারি* ২/২৯০-২।

৫. পূর্বোক্ত, ৭/২৯১-২, ৩২৪-৬।

৬. ইবনে কাছির আল কুরাশি আল দিমাশকী, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৩/১৪, দেখুন, আর আলিমী, আর বিয়াত গাজাত বদর, ৩৬৫-৪১৯।

৭. আল নবাবী আবু জাকারিয়া মহী আল দীন ইয়াহিয়া ইবনে শরীফ, *শারহ সহীহ মুসলিম*, ১২/১৯৮।

৮. *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ২/২৬০, সনদ ছাড়া ইবনে ইসহাক হতে উদ্ধৃত; ইবনে হাযম, *জাওয়ামী আল সীরাহ*, ১০৮।

৯. আহমাদ, আল মাসুদ ১/৪১১, সনদ সহকারে আল হাদীস এটিকে *সহীহ* বলেছেন। তিনি মুসলিমের শর্ত অনুসারে (আল মুসতাদরাক, ৩.২০) এটাকে *সহীহ* বলেছেন। আল হায়সামী বলেন, আহমাদ ও আল বাজ্জার এটি বর্ণনা করেন। এর সনদের অন্তর্ভুক্ত আসিম ইবনে বাহ দালাহ, তার হাদীসগুলো হাসানের অন্তর্ভুক্ত। আহমাদের সনদে বর্ণিত ব্যক্তিদের বর্ণিত হাদীস *সহীহ*। (*মাজমা আল জাওয়ায়েদ* ৬/৬৯)

১০. *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৩/২৬০, সনদ ছাড়াই ইবনে ইসহাক হতে বর্ণিত; আল হাকীম, আল মুসতাদরাক, ৩/৬৩২, তার সনদের অন্তর্ভুক্ত ইবনে লাহিয়্যা, তিনি ছিলেন, সাদুক, তবে তাঁর গ্রন্থটি পুড়িয়ে ফেলার পর তিনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন (*ইবনে হাজার আল তাগরিব*)। আমি আবু জাফর আল বাগদাদী ও আবু আলাতাহ মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে খালিদ-এ আমি দেখিনি। আল যাহাবী তাঁদের ব্যাপারে কিছুই বলেননি।

১১. আল হাকীম আল নিসাপুরী, *আল মুসতাদরাক* ৩/১৯, ইবনে আব্বাস দুর্বল সনদ সহকারে এটির বর্ণনা করেন। *আল বিদায়া ওয়ান আল নিহায়্যা*, ৩/২৫৭, *হাসান* সনদসহকারে এটি উরওয়া কর্তৃক বর্ণিত হয় বলে ইবনে ইসহাকের বক্তব্য, তবে এটির সূত্র *মুরসাল*। আরও রিপোর্ট রয়েছে যেগুলো দুর্বল, তবে এগুলো একটি আরেকটির সমর্থনকারী এ মর্মে যে, এগুলো *সহীহ* (*আল ইসাবাহ* ৪/৩৪৭ এবং *মাজমা আল জাওয়ায়েদ*, ৬/৭২।

১২. ইবনে হিশাম, *আল সীরাহ* ২/৬১ ইবনে ইসহাক, ইবনে আব্বাস *সহীহ* সনদ সহকারে এটির বর্ণনা করেন।

১৩. ইবনে হাজার, *ফতহুল বারী*, ৭/২৮৩
১৪. আল নবাবী, *শারহ, সহীহ মুসলিম*, ১২/৮৪
১৫. ইবনে কাসির, *আল বিদ্যায়া, ওয়া আল নিহায়্যা*, ৩/২৬০,
১৬. প্রাগুক্ত।
১৭. ইবনে হিশাম, *আল সীরাহ*, ২/৩০১; *আল তাবারী*, আল তারিখ *আল রাসূল ওয়া আল মুলুক*, ২/৪৪৩
১৮. আহমাদ, *আলমুসনাদ*, ২/১৯৩, ৯৪৮। ভাষ্যকার আহমাদ শাকীর বলেন, "এর *সনদ সহীহ*"। আল হায়সামী বলেন, হারিসা ইবনে মুদরীব এর তুলনায় আহমদ বর্ণিত ব্যক্তি *সহীহ* যাকে সিকাহ বলা হয়।" (*মাজমা আল জাওয়ায়েদ*, ৬/৭৬)।
১৯. সূরা আনফাল (৮:৫.৭)।
২০. গুইলাম কর্তৃক অনুদিত, পৃ. ২৯৩-৪। ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়্যা* ৩/২৬২-৩, *সহীহ* সনদ সহকারে ইবনে ইসহাক প্রদত্ত রিপোর্ট। ইবনে কাসীর বলেন, "*আল বুখারী*, আল নাসায়ী ও আহমাদসহ আরও অনেক বর্ণনা আছে।" আল মিকদাদ ইবনে আল আসওয়াদ যা বলেছেন সে ব্যাপারে তাতে আল বুখারী ও ইমাম আহমাদের সম্পর্ক থাকার কথা ইবনে কাসির উল্লেখ করেছেন (*আল ফাতহ*, ৭/২৮৭; মুসনাদে আহমাদ, ৫/২৫৯, হাদীস নং ৩৬৯৮, আহমাদ শাকীর কর্তৃক বর্ণিত)।
২১. প্রাগুক্ত, ৩/২৬০, সনদ ব্যতীত ইবনে ইসহাক বর্ণিত, ইবনে আল কায়্যিম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ, *জাদ আল মা'আদ ফী হুদা খায়রী আল ইবাদ*, ২/৮৫।
২২. আল তারাবী, তারিখ, ২/৪৪৩, ৪২৪-৫, হাসান সনদ সহকারে বর্ণিত।
২৩. *আল বিদ্যায়া ওয়া আল নিহায়্যা*, ২/২৬৯, যাইয়্যিদ সনদ সহকারে ইবনে ইসহাক হতে বর্ণিত, ইসহাক ইবনে ইয়াসারের শায়খগণ কিছু সাহাবাকে সংযুক্ত করতে পারেন। এটা সত্য হলে হাদীসটি সত্য হবে, *সাহাবীকে* জানার প্রয়োজন নেই যদি অনেক *সাহাবী* হয়ে থাকে।
২৪. আল হাদীস, *আল মুসতাদরাক* ২/৩২৮; আল তাবারী, *আল তফসীর*, ১৩/৪৫৪, ভাষ্যটি দিয়েছেন আহমাদ শাকীর। আবদুল্লাহ ইবনে আবু সায়েরুল আধারী'র হাদীস হতে *সহীহ* সনদ সহকারে বর্ণিত, তিনি অল্পসংখ্যক সাহাবীদের একজন। তিনি যে এটা রাসূল (সা) হতে শুনেছেন তার প্রমাণ নেই, তবে সাহাবাদের *মুরসাল ইলাহ কাদিহাহ* নয়, কেননা সব সাহাবী হলো *আদল*।
২৫. ইবনে হাজার, *আল ইসাবাহ ফী মারিফাত, আল সাহাবাহ* ১/৩০৪, আবু ইসহাক হতে বর্ণিত। তিনি এটি শুনেছেন বলে বর্ণনা করেন। সনদ সহকারে আল হাকীম, আল মুসতাদরাকে একটি বর্ণনার কথা বলেন, ২/৪২৬ -৭। এখানে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদেরকে আমি পাইনি। আল জাহাবী এটিকে মুনকার *হাদীস* বলেছেন। ইবনে হিশাম সনদ সহকারে ইসহাক হতে বর্ণনা করেন এর মধ্যে কিছু ইবহাম রয়েছে। মুবহাম জানা গেলে সনদ হাসান হবে।
২৬. *সহীহ* সনদসহকারে আহমাদের *আল মুসনাদ* (*ফতহুর রাব্বানী*, ২১/৩০, ৩২)।
২৭. *তুহফা আল আহওয়াযী*, ৫/৩২৪-৫। আল তিরমিজীর সনদে মুহাম্মদ ইবনে হামীদ আল রাযীর বর্ণনা আছে। এটি যঈফ, সালামাহ্ ইবনে আল ফজল আল আব্বাস হলো *সাদুক*, তবে তিনি প্রায়ই ভুল করতেন। ইবনে হাজার- এর *আল তাকরীব* এ বর্ণিত। ইমাম আহমাদের বর্ণনাকে খণ্ডন করার জন্য এটি তেমন শক্তিশালী নয়।

২৮. *সহীহ* সনদ সহকারে আহমাদ *আল মুসনাদ* ৫/৪২০। আল হায়সামী *মাজমা আল জাওয়ায়েদ*, ৬/৭৫, *সহীহ* সনদ সহকারে ইমাম আহমাদের রিপোর্ট হতে বর্ণিত।

২৯. মাহমুদ শীত খাত্তাব, *আল রাসূল আল কায়েদ*, ৭৮-৯।

৩০. ইবনে হাজার, *ফতহুল বারী*, ৭/২৮৭, আল বুখারীর রিপোর্ট হতে

৩১. মুসলিম, *আল সহীহ*, মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী-র ভাষ্য সহকারে, ৩/১৫০৯-১৫১০, হাদীস নং ১৯০১।

৩২. আল নবাবী, *শারহ সহীহ মুসলিম*, ১২/৮৪-৫

৩৩. *সহীহ আল বুখারীর* বর্ণনা হতে, ইবনে হাজার, *ফতহুল বারী*।

৩৪. আহমদ, *আল মুসনাদ*, ২/২২৮। আহমাদ শাকীর এটাকে *সহীহ* বলেছেন।

৩৫. আবু দাউদ, সুলায়মান ইবনে আল আশাখ আল সিজিস্তানী সুনান ৪/৪৯, ইবনে হাজার এটাকে *সহীহ* বলেছেন। (আল ফাতহ, ৭/২৯৮)।

৩৬. ইবনে হাজার, *ফতহুল বারী*, ৭/৩০৬, আল বুখারীর একটি রিপোর্ট হতে।

৩৭. আল তাবারী, *তফসীর*, ১৩/৪৪২-৩, উরওয়া এবং কাতাদাহ দুটো *সহীহ সনদের* উল্লেখ করেছেন, তবে দু'টোই মুরসাল। এটি পরস্পরকে শক্তিশালী করে। মুরসাল হাদীসের অনেকগুলো সনদ থাকলে সেগুলোর শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৩৮. আল হায়সামী, নূর আল দীন আলী ইবনে আবু বকর, *মাজমা আল জাওয়ায়েদ* তাবারানী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তার লোকজন ছিল *সহীহ*, মুহাম্মদ ইবনে ওহাব ইবনে আবু কারিমাহ ছিলেন সিকাহ বা সাদুক, আল তাকরিব এবং সূত্র অনুযায়ী ২/২১৬।

৩৯. ইবনে হাজার, *ফতহুল বারী*, ৭/২৯৩-৬, ৩২১। মুসলিম শারহ আল নবাবী, ১২/১৫৯-১৬০।

৪০. ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৪/৪৮০, আল বুখারীর ভাষ্য হতে বর্ণিত। ইবনে কাসির *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়্যা*, ৩/২৮৬, *সহীহ* সনদসহকারে ইবনে ইসহাকের রিপোর্ট হতে বর্ণিত।

৪১. আল তাবারী, *তফসীর*, ১৩/৪৩০

৪২. ফিরিশতাদের ঘোড়ার নাম।

৪৩. আহমাদ, আল মুসনাদ, ২/১৯৪, আহমাদ সাকার বলেন, "এর সনদ *সহীহ*," আল হায়সামী বলেন, হারিসা ইবনে মুদবির-এর লোকজন ছাড়া এর লোকজন *সহীহ*, হারিসা ইবনে মুদরিব ছিলেন মকাহ (*মাজমা আল জাওয়ায়েদ*, ৬/৭৫-৬)।

৪৪. প্রাগুক্ত।

৪৫. ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়্যা*, ৩/২৮৪, আল আলবানী, আল কাজালী কর্তৃক এটিকে হাসান বলে মনে করা হয়। দেখুন, বুখারীর আল *সহীহ* বর্ণনা, *ফতহুল বারী*, ৭/৩১২

৪৬. ইবনে হাজর, *ফতহুল বারী*, ৭/৩১১-২

৪৭. প্রাগুক্ত, ৭/৩১৩। মানুষের চেষ্টার উপর ভিত্তি করে লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য ইসলামের ধারণার উপর আল সুবকীর মন্তব্য প্রাকৃতিক ও সামাজিক আইনের গন্ডির মধ্যে থেকে। এ মন্তব্য স্পষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর একটি নির্দেশ আর ইসলামকে গভীর জ্ঞানে হৃদয়ঙ্গম করার উপর একটি বক্তব্য।

৪৮. আল নবাবী *শারহ সহীহ মুসলিম* ১২/৮৬-৭।

৪৯. আহমাদ, আল মুসনাদ, ১/২৩২, *সহীহ সনদসহ*
৫০. ইবনে হিশাম, *আল সারাহ* ২/২৪৮, ইবনে কাসির *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়্যা*, ৩/৩২৭।
৫১. ইবনে হাজার, *আল ইসাবা*, ৩/৩২৮, ৬০৮। তারা হলোঃ মুয়াদ ইবনে আল হারিস এবং হিলাল ইবনে আল মুয়াল্লা ইবনে লধান।
৫২. ইবনে হাজার, *ফতহুলবারী*, ৮/৩০০, বুখারীর একটি রিপোর্ট হতে।
৫৩. দেখুন, আহমাদ, *আল মুসনাদ*, ৩/৩২০; ৪/৩১৩; ৫/৫, সনদ সহকারে যাকে আহমাদ শাকর *সহীহ* বলেছেন, ইবনে কাসির বললেন যাইয়্যিদ, আল তিরমিযী ছিলেন *হাসান* (ইবনে কাসির, *তফসীর*, ২/২৮৮; আল ওয়াহদি, *তুহফাহ*, ৮/৪৭১)
৫৪. তিনি মক্কার মুসলমানদের সাথে কৃত সন্ধি ভংগকারীদের একজন। তাদেরকে হত্যা করা হয়নি। (*আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়্যা*, ৩/২৮৫)।
৫৫. আহমাদ, *আল মুসনাদ* ২/৭৬-৭৭, *সহীহ* সনদ সহকারে যেমন, আহমাদ শাকির বলেন।
৫৬. ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়্যা*, ৩/২৮৫, ইবনে হিশাম সিরাহ ২/৬৯-৭১।
৫৭. *শারহ আল নবাবী আলা সহীহ মুসলিম*, ১২/৮১-৭
৫৮. ইবনে কুদামাহ আল মাকদিসী, আল মুগনী, ৮/৩৭২-৪,
৫৯. আল হায়সামী, মাজমা আল জাওয়ায়েদ ৬/৯০। তিনি বলেন, "আল তাবারানী এর বর্ণনা দেন, তার সনদের ব্যক্তিগণ *সিকাহ*"।
৬০. আহমাদ, *মুসনাদ* যাইয়্যিদ সনদসহ (আল *ফাতহুর বারী*, ১৪/১০০)।
৬১. প্রাগুক্ত। যে সনদে আবি ইবনে আসীন যুক্ত, তিনি সাদিক, তবে তার ভুল-ভ্রান্তি আছে এবং জোর দিয়েই বিষয়টি উল্লেখিত আছে। *আল মুসনাদ*, ৪/৪৮।
৬২. ইবনে হাজার, *ফতহুল বারী*, ৭/৩২১, আল বুখারীর একটি রিপোর্ট হতে।
৬৩. প্রাগুক্ত। ৭/৩২১, আল বুখারীর একটি রিপোর্ট হতে গৃহীত।
৬৪. আল তাবারী, *তফসীর*, ১৪/৭৩, হাসান সনদ সহকারে।
৬৫. ইবনে হাজার *ফাতহুর বারী*, ৭/৩২২, আবু নায়েমকৃত কিতাবুল ওয়ায়েল হতে, হাসান সনদসহকারে আল হাফিয ইবনে হাজার এর বর্ণনানুযায়ী।
৬৬. আহমাদ এটাকে *সহীহ* সনদসহকারে বর্ণনা করেন। (*ফতহুল রাব্বানী*, ১৪/৭৩; এর উপর আল বান্নার ভাষ্য দেখুন।
৬৭. ইবনে হাজার ফত*হুল বারী*, ৭/৩১৬, আল বুখারীর একটি রিপোর্ট হতে ৩১৭।
৬৮. দেখুন, ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়্যা*, ৩/৩০২-৩।
৬৯. আল আলিমী *মারবিয়াত গাসওয়াহ বদর* ৪২০-৪।
৭০. ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়্যা*, ৩/৩০৪, *সহীহ* সনদ সহকারে ।
৭১. ইবনে হিশাম, *আল সীরাহ*, ২/৩৩৫ সহীহ সনদসহকারে।
৭২. *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৩/৩০৫
৭৩. আল হায়সামী *মাজমা আল জাওয়ায়েদ* ৬/৮৯, তিনি বলেন, "আল তাবারানী এটিকে আল কবীর আল আওসাতে বর্ণিত আছে, এই সনদের ব্যক্তিগণ *সহীহ*"। দেখা যেতে পারে, *আল সুনানে* আবু দাউদের রিপোর্ট, ২/৫৫ হাসান সনদসহকারে।
৭৪. *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৩/৩৬৬, আল সাবারীর সাথে সংশ্লিষ্ট *হাসান সনদ*, তবে এটি *মুরসাল*।

৭৫. প্রাগুক্ত, ৩/৩০৬-৭।

৭৬. ইবনে হাজার, *ফতহুল বারী*, ৭/৩০৪, হাদীস নং ৩৯৮২।

৭৭. প্রাগুক্ত, ৭/৩০৪-৫।

৭৮. আল নববী, *শারহ সহীহ মুসলিম*, ৫৫/১৬।

৭৯. ইবনে হিশাম, *আল সীরাহ* ২/৩৪০।

৮০. ইবনে হাজার *আল ইসাবাহ* ৩/৩৬, উরওয়াহ ইবনে আল জুবায়ের ও আল জুহরী হতে বর্ণিত এবং *মুরসাল হাদীস* হতে গৃহীত। উরওয়া হতে আল জুহরী এটি বর্ণনা করেন, শুরার সময়ের ন্যায় দু'টো সনদ একই রকম। তবে এটি মুরসালের কোন জোরালো অবস্থার সৃষ্টি করে না।

৮১. ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৭/৩০৮, আল বুখারীর একটি রিপোর্ট হতে।

৮২. ইবনে ইসহাক মুহাম্মদ, সনদ ব্যতীত, সীরাহ ইবনে হিশাম, (২/৪২১)

৮৩. ইবনে সা'দ তার তাবাকাত, ২/৩১।

৮৪. ইবনে ইসহাক, আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালিকের সূত্র মতে *সহীহ সনদ* সহকারে বর্ণিত, তবে এটি মুরসাল হাদীস। (*সীরাহ ইবনে হিশাম*, ২/৪২২-৩) ইবনে সাদ, আল তাবাকাত, ২/৩০, সনদ ব্যতীত।

৮৫. ইবনে ইসহাক, সনদ ব্যতীত, *সীরাহ ইবনে হিশাম*, ২/৪২৫

৮৬. ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়্যা*, ২/৪ ইবনে সা'দ *আল তাবাকাত*, ২/৩৪।

৮৭. ইবনে ইসহাক, সনদ ব্যতীত, (*সীরাহ ইবনে হিশাম*, ২/৪২৫)

৮৮. ইবনে কাছির, *আল বিদ্যায়্যা ওয়া আল নিহায়্যা*, ৩/৪।

৮৯. ইবনে সা'দ আল তাবাকাত, ২/৩৫, সনদ ব্যতীত।

৯০. ইবনে ইসহাক, সনদ ব্যতীত, (সীরাহ ইবনে হিশাম, ২/৪২৯-৪৩০), ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৫/৪।

৯১. ইবনে সা'দ, *আল তাবাকাত*, ২/৩৬ *সনদ* ব্যতীত।

অধ্যায় ৫

ওহুদের যুদ্ধ

যে পাহাড়ের উপর এ যুদ্ধ হয়েছিল সে পাহাড়ের নামানুসারে এ যুদ্ধের নাম ওহুদের যুদ্ধ। এটি রাসূল (সা)-এর মসজিদের (মসজিদে নববী) পাঁচ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। মসজিদ গেইট থেকে এ যুদ্ধক্ষেত্রের শুরু। ওহুদ পাহাড়টি গ্রানাইট পাথরে তৈরী, এর অনেকগুলো চূড়া রয়েছে। এর দক্ষিণে ছোট আইনান পাহাড়, যুদ্ধের পর এটি জাবালে রুমা নামে খ্যাত হয় (তীরন্দাজদের পাহাড়)। দু'টো পাহাড়ের মাঝামাঝি ভাদি কানা নামে একটি উপত্যকা রয়েছে।

ওহুদের যুদ্ধ সংগঠিত হয় বদর যুদ্ধের বছর দেড়েক পর কুরাইশদের দ্বারা মদীনা আক্রমণের কারণে। বদর যুদ্ধে মৃত কুরাইশদের প্রতিশোধ গ্রহর জন্য মুসলমানদের কাছ থেকে সিরিয়ার বাণিজ্য পথ উদ্ধার এবং বদর যুদ্ধে আরবে কুরাইশদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য ওহুদের যুদ্ধ সংগঠিত হয়। সীরাত গ্রন্থগুলোতে হিজরীর তৃতীয় বৎসরে শাওয়াল মাসে এ যুদ্ধ সংগঠিত হওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে সঠিক দিনের ব্যাপারে মতভেদ আছে। সবচেয়ে বেশী জ্ঞাত সূত্রগুলো থেকে জানা যায় যে, ওহুদের যুদ্ধ শাওয়ালের[১] মাঝামাঝি শনিবারে সংগঠিত হয়।

ইবনে ইসহাক তাঁর শিক্ষকদের কাছ থেকে শ্রুত বিবরণ থেকে বর্ণনা করেন যে, কুরাইশরা বদর যুদ্ধের পরপরই তাদের বেঁচে যাওয়া[২] বণিক দল আর এ বণিক দলের কাছ থেকে প্রাপ্ত মুনাফার অর্থ দিয়ে ওহুদের যুদ্ধের জন্য সেনাবাহিনী দিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল।[৩] ইবনে ইসহাকের মতে তাদের সাথে যুদ্ধে আটজন মহিলা শরীক হয় (তাদের নামও দেয়া হয়)। তবে আল ওয়াকিদীর বর্ণনায় জানা যায় তাদের সাথে ছিল ১৪ জন মহিলা।[৪] কুরাইশদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩০০০। এর মধ্যে ২০০ জন অশ্বারোহী। খালিদ বিন অলিদ ছিল ডানে আর ইকরিমা ইবনে আবু জাহল ছিল সেনাবাহিনীর বাম দিকের বহরে।[৫] এদের মধ্যে ৭০০ জন ছিল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত।[৬]

কুরাইশ ও তাদের অনুসারী কিনান ও তিহামার লোকদের নিয়ে কুরাইশ বাহিনী গঠিত হয়।[৭]

মুসলমানগণ জানতে পারে যে, কুরাইশরা মদীনা দখল করতে আসছে। রাসূল (সা) এ সময় স্বপ্ন দেখেন; রাসূল (সা)এর স্বপ্ন ছিল সত্য, এটা ছিল ওহীর অংশ বিশেষ। রাসূল তাঁর স্বপ্নের কথা সাহাবীদের কাছে বর্ণনা করেছিলেন ঃ

> স্বপ্নে দেখলাম আমি একটি তরবারী উপরে তুলে ধরেছি। তরবারিটি মাঝখান দিয়ে ভেংগে গেল এবং ঈমানদারগণ ওহুদের যুদ্ধের দিনে যে ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন সে অবস্থা দেখতে পেলাম। এরপর আমি আবার তরবারিটি উপরে তুলে নাড়ালাম, এটার অবস্থা আগের চেয়ে ভাল দেখলাম। এরপর দেখলাম মক্কা মুক্ত হয়েছে আল্লাহ যেভাবে মক্কাকে হেফাযত করেছিলেন। আর

> দেখলাম ঈমানদারগণ জড়ো হয়েছে। আমি দেখলাম পশু হত্যা করা হয়েছে, তবে দুনিয়াবী মঙ্গলের চেয়ে আল্লাহ প্রদত্ত পুরস্কার উত্তম। আবার দেখলাম ঐ পশুগুলোকে ওহুদ যুদ্ধের দিনের ঈমানদারদের জন্য প্রতীকের ন্যায় (যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল) দেখা যাচ্ছিল।[৮]

এ স্বপ্নের মাধ্যমে রাসূল (সা) তাঁর সাহাবীদেরকে বলেছিলেন যে, তারা পরাজিত হবে এবং কেউ কেউ নিহত হবে।[৯] আরেক বর্ণনায় রাসূল (সা) বলেন, "স্বপ্নে দেখলাম আমি দুর্ভেদ্য লোহার আংটার বর্ম পরেছি, এটাকে আমি মদীনা বলে মনে করেছি।"[১০]

রাসূল (সা) তাঁর সাহাবীদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন যে, তিনি কি মদীনা থেকে তার বাহিনীকে শক্তিশালী করবেন;"মদীনা শহরটা ছিল অনেকগুলো ভবনে ঠাসা, যেন একটা দুর্গ।"[১১] এ অবস্থায় মদীনা থেকে বের হয়ে গিয়ে কুরাইশদের মোকাবেলা করবেন। তিনি বললেন, "আমি নিরাপদ অবস্থানে আছি।" কোন কোন *আনসার* বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আমরা মদীনার রাস্তায় মরতে চাই না। আমরা *জাহেলিয়ার* যুগের কাউকে মদীনা দখলের সুযোগ দেব না। অর্থাৎ আমরা বাইরে গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করব। এর সামান্য কিছুও ইসলামে আমরা হতে দেব না। আমরা কুরাইশদের সাথে লড়তে রাজী আছি।" রাসূল (সা) যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিলেন। কেউ কেউ *আনসারদেরকে* এর জন্য দোষ দিতে লাগলেন। তারা বললেন, "আল্লাহর রাসূল (সা) একটি বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন; আপনি কি কাউকে পরামর্শ দিয়েছেন? হে হামযা, আপনি আল্লাহর রাসূলের কাছে গিয়ে বলুন, "সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়টি আপনার।" হামযা রাসূল (সা) এর কাছে গিয়ে বললেন, " হে আল্লাহর রাসূল, মানুষ একে অপরকে দোষারোপ করছে আর বলছে এ বিষয়টি একেবারেই আপনার ব্যাপার"। রাসূল (সা) বললেন, "একবার যেহেতু রাসূল যুদ্ধের পোষাক পরিধান করেছে, সে যুদ্ধ করা ছাড়া তা খুলবে না।"[১২]

রাসূল (সা) তার সাহাবীদেরকে খোলামনে তাদের মতামত ব্যক্ত করতে অভ্যস্ত করে তুলেছিলেন। তাদের মতামত ভিন্ন হলেও তারা দ্বিধাহীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারতেন। যে সব বিষয়ে কুরআন নাযিল হয়নি বিশেষ করে সে সব বিষয়ে তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন। মানুষের সমস্যা আর *উম্মাহর* সমস্যা সম্পর্কে সাহাবীদের অভিহত থাকার উদ্দেশেই তিনি সাহাবীদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন। কেউ কারো মতামত প্রকাশ করতে না পারলে পরামর্শ করা অর্থহীন।

কোন সাহাবী মতামত প্রকাশে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভুল করলে রাসূল কাউকে দোষ দিতেন না। নেতা অন্যের সাথে কোন ব্যাপারে আলাপ করতেই পারেন। *শূরার* মূলনীতি প্রয়োগের বেলায় রাসূল (সা) কুরআনের নির্দেশ মেনে চলতেন।

> "... তাদের সাথে পরামর্শ কর অত:পর তুমি কোন সংকল্প করলে আল্লাহর উপর নির্ভর করবে।" (৩:১৫৯)

সাহাবীগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিলেন। তারা তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারলেও তা তাদের নেতার উপর চাপিয়ে দিতেন না। তারা নেতার কাছে তাদের মতামত দিতেন। কোন্ মতামত তিনি গ্রহণ করবেন এ ব্যাপারে তাঁর স্বাধীনতা ছিল। যখন সাহাবীগণ বুঝতে পারতেন যে, তাদের চাপের কারণে রাসূল (সা) যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখন তারা পুনরায় তার কাছে গিয়ে সে জন্য ক্ষমা চাইতেন। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা) সার্থক নেতৃত্বের গুণাবলীর ব্যাপারে বক্তব্য রাখতেন। তিনি বলতেন, নেতা যখন কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তিনি তখন তা থেকে সরে আসতে পারেন না। তাকে গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর কাজ করতে হয়। এর কারণ তা না হলে তার উপর থেকে মানুষের আস্থা চলে যাবে এবং অনুসারীদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে।

যারা যুদ্ধে যেতে চাইত তাদেরকে তিনি প্রণোদিত করতেন। যারা বদর যুদ্ধে যেতে পারেননি তারা অনুরূপ একটি যুদ্ধে শরীক হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন।

রাসূল (সা)-এর নিজস্ব মতামত আর তিনি যাদের সাথে আলোচনা করেছিলেন তারা সবাই মদীনার প্রতিরক্ষার উপরই গুরুত্বারোপ করেছিলেন। আক্রমণকারীদের ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি করতে আর মদীনা রক্ষাকারীদের ক্ষয়ক্ষতি যাতে ন্যূনতম পর্যায়ে থাকে সেজন্যে তিনি সবাইকে বলে দিয়েছিলেন। সকল জনশক্তি ব্যবহারের উপর এবং নারী ও শিশুর যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেজন্যে রাসূল (সা) সবাইকে সতর্ক থাকতে বলেছেন।

একটি কাল[১৩] ব্যানার ও তিনটি পতাকা তৈরী করা হলো। এর প্রথমটি মুহাজিরদের মু'সাব ইবনে উমায়ের ধরেছেন। তিনি যখন শহীদ হলেন তখন এটি ধরেছেন আলী ইবনে আবু তালিব। দ্বিতীয় পতাকাটি ছিল আল আওসের জন্য। এটি ধরেছিলেন উসায়েদ ইবনে হুযায়ের। তৃতীয় পতাকাটি ছিল খাজরাযদের জন্য। এটি ধরেছিলেন আল হাব্বার ইবনে আল মন্দির।[১৪] পতাকাগুলোর নীচে ১০০০ মানুষ জড়ো হলো। তারা ছিলেন মুসলিম আর যারা মুসলিম হতে চেয়েছিলেন সেসব জনতা। তাদের ছিল মাত্র দুটো ঘোড়া ও ১০০ সশস্ত্র সৈন্য।[১৫]

রাসূল (সা) জানতেন যে, আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করবেন এরপরও তিনি দু'টো সশস্ত্র বর্ম[১৬] পরেছিলেন। রাসূল (সা) তাঁর উম্মাহকে শেখানোর জন্য এরূপ করেছিলেন। যথাসাধ্য নিজের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নিজেকে গ্রহণ করে আল্লাহর উপর ভরসা করতে বলেছিলেন।

মুসলিম সেনাবাহিনী আল হাব্বাহ আল সারকিয়াহ'র[১৭] পশ্চিম পাশ দিয়ে ওহুদ প্রান্তরে পৌঁছলেন। এদিকে মুশরিকদের সাথে কোন যুদ্ধ হবে না এ ভেবে ৩০০ মুনাফিকসহকারে আবদুল্লাহ ইবনে উবায় ইবনে সলুলকে এখান থেকে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। আবদুল্লাহ ইবনে উবায় ইবনে সলুল রাসূল (সা) এর যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে বিরোধিতা করে বলেন; তিনি তাদের কথা শুনেছেন আর আমার কথা শুনেননি।[১৮]

আল ওয়াকিদির মতে আল শায়খায়েন হতে মুনাফিকদেরকে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এ জায়গাটি ছিল ওহুদের কাছাকাছি।[১৯] কুরআনে বলা হয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনে

উবাই ও মুনাফিকদের থেকে মুসলমানদেরকে পবিত্র করার লক্ষ্যেই এখান থেকে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। আর মুসলমানদেরকে আলাদা করে নেয়ার জন্যই এ ব্যবস্থা নেয়া হয়। মুসলমানদের মধ্যে যাতে মিথ্যা প্রচার করতে না পারে বা মুসলমানদের মধ্যে হতাশার পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্যই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

> অসৎকে সৎ হতে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রয়েছ আল্লাহ মু'মিনগণকে সেই অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না। (৩ঃ১৭৯)
>
> যেদিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন তোমাদের উপর যে বিপর্যয় ঘটেছিল তা আল্লাহর হুকুমে; ইহা মু'মিনদের জানার জন্য এবং *মুনাফিকদেরকে* জানার জন্য এবং তাদেরকে বলা হয়েছিল আস, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরোধ কর। তারা বলেছিল, যদি যুদ্ধ জানতাম তবে নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করতাম। সেদিন ঈমান অপেক্ষা কুফরীর নিয়ত ছিল। তাদের অন্তরে যা নেই তারা তা মুখে বলে। তারা যা গোপন রাখে আল্লাহ তা বিশেষভাবে অভিহত। (৩ঃ১৬৬-৭)

ইবনে ইসহাক তাঁর শিক্ষকের কাছ থেকে শুনে মুরসাল রিপোর্ট আকারে বয়ান করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম মুনাফিকদেরকে ফিরে যেতে বলেছিলেন কিন্তু এরপর তারা কুরআনে বর্ণিত প্রতিক্রিয়াই ব্যক্ত করেছিল। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হাজাম বলেন, তোমাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ, তোমরা আল্লাহর শত্রু, আল্লাহই তার নবীকে তোমাদের থেকে মুক্ত করে দেবেন।[২০]

> দু'দল মুসলমানকে মুনাফিকদের আচরণ প্রভাবিত করতে পেরেছিল। তারা মদীনায় ফিরে যেতে চেয়েছিল। তবে তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রহমতে তাদের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল এবং তারা ঈমানদারদের সাথে থাকতে পেরেছিল। এর একটি দল আলখারাজের বানু সালমা আরেকটি দল আল আউসের বানু হারিসা। আল্লাহ তাদের দু'দলের আচরণ সম্পর্কে কুরআনে বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে দু'দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল এবং আল্লাহ উভয়ের সহায়ক ছিলেন। (৩ঃ১২২)

মুসলিম বাহিনী তাবু গেঁড়েছিল শায়খায়েন এলাকায়। যারা যুদ্ধ করতে যাবে তাদেরকে রাসূল (সা) এখানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন। যাদের বয়স চৌদ্দ থেকে নীচের দিকে ছিল তাদেরকেই এখানে বাছাই করা হয়েছিল।[২১] তাদের মতে রাফী ইবনে খুদায়েয ছাড়া অন্যদেরকে তিনি মদীনায় ফেরত পাঠালেন। রাফী ছিলেন একজন তীরন্দাজ, এ জন্যই রাসূল (সা) তাঁকে যুদ্ধের জন্য বাছাই করেছিলেন, এ ছাড়া সামুরাহ ইবনে জুনদুবকেও রাসূল (সা) থাকতে বলেছিলেন। এর কারণ সামুরাহ বলেছিলেন তিনি রাফীর চেয়েও শক্তিশালী।[২২] এ জন্যই রাসূল (সা) তাকেও বাছাই করেছিলেন। ইবনে সাইয়েদ আল নামের মতে[২৩] চৌদ্দজন যুবককে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়। সহীহ

সনদ হতে জানা যায় এদের মধ্যে উমরের পুত্রও ছিলেন।[২৪] যে বালকগুলো স্বেচ্ছায় ও সাহসের সাথে যুদ্ধ করতে চেয়েছিল তাদের বিষয়টি বিস্ময়কর। তারা আল্লাহর উদ্দেশে একে অপরের সাথে শহীদ হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করছিল। তাদেরকে কেউ জোর করেনি, কোন অত্যাচারী শাসকের আইন বলেও তারা যুদ্ধ করতে যেতে চায়নি। এগুলো কি রাসূল (সা) এর শিক্ষার আদর্শ পদ্ধতি নয়? এগুলো কি ইসলামী চেতনার সুযোগ নয়?

মুসলিম বাহিনী ওহুদের যুদ্ধের ময়দানে হাযির হলেন, রাসূল (সা)-এর পরিকল্পনা মোতাবেক সেনাবাহনী তাদের যার যার নির্ধারিত স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন। রাসূল (সা) ওহুদ পাহাড়কে পেছনে রেখে মদীনাকে সামনে রেখে বাহিনীকে দাঁড় করালেন। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে আয়নায়েন পাহাড়ের উপরে ৫০ জনের দায়িত্ব দিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো। আয়নায়েন ছিল ওহুদের উল্টাদিকে। মুসলমানদেরকে মুশরিকদের আচমকা আক্রমণের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই যুবায়েরকে ঐ স্থানে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। রাসূল (সা) তাদেরকে তাদের অবস্থানে থাকার জন্য কড়াভাবে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, তোমরা যদি দেখ তোমাদের উপর শকুনি পড়েছে তবুও তোমরা তোমাদের স্থান ত্যাগ করবে না, আমাদেরকে শত্রুদের অতিক্রম করে যেতে দেখলে তোমরা তোমাদের স্থান ত্যাগ করে যাবে না।[২৫] মুসলমানগণ উঁচু স্থানগুলোর উপর তাদের কর্তৃত্ব লাভ করলো। কুরাইশরা নীচে উপত্যকায় পড়ে রইল, তারা মদীনাকে পেছনে ফেলে ওহুদের দিকে অগ্রসর হলো।

হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে দূর্বল এমন কিছু সূত্র থেকে জানা যায় যে, দুটো বাহিনীর যুদ্ধ শুরুর আগে ব্যক্তি পর্যায়ের একটি লড়াই হয়েছিল। লড়াইটা ছিল আলী ইবনে আবু তালিব এবং তালহা ইবনে উসমানের মধ্যে। তালহা ছিল *মুশরিকদের* পতাকাবাহক। সে আলীর হাতে নিহত হয়।[২৬] বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, আল আউসের জনৈক নেতা আবু আমীর আল ফাসিক (সন্ন্যাস) মদীনা থেকে এসে *মুশরিকদের* সাথে যোগ দিয়েছিল। সে আল আউসকে তার স্থানে যোগ দিতে প্ররোচিত করে। তবে তীব্রভাবে তারা এর বিরোধিতা করেছিল।[২৭]

দু' বাহিনীর মধ্যে ঘোরতর লড়াই শুরু হলো। *মুশরিকরা* তাদের তাবুতে ফিরে গেল। মুসলিমরা বিশাল সাহসের পরিচয় দিল। রাসূল (সা) একটি তলোয়ার উচাঁয়ে ধরে বললেন, আমার কাছ থেকে কে এই তলোয়ার নেবে? সব মুসলমান এ মুহূর্তে তলোয়ারটি নেয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল আর বলতে লাগলো, "আমাকে দিন, আমাকে দিন।" এরপর রাসূল (সা) বললেন, "কে এ তলোয়ারের হক আদায় করতে পারবে?" উপস্থিত জনতা এ কথা শুনে পিছিয়ে গেলেন। তবে আবু দুজানা বললেন, "আমি এর হক আদায়ের দায়িত্বসহকারে গ্রহণ করতে রাযি আছি।" তলোয়ারটি নিয়ে আবু দুজানা *মুশরিকদের* বিরুদ্ধে মারাত্মক আঘাত হেনে চললেন।"[২৮]

সাবা ইবনে আব্দুল উজ্জা প্রতিযোগিতার আহবান করলে হামযা ইবনে আবু তালিব সাহসের সাথে লড়ে গেলেন। হামযা তাকে পরাজিত করলেন ও হত্যা করলেন।

জুনায়ের ইবনে মুতিম তার গোলাম ওয়াশীকে মুক্ত করে দিতে চাইল যদি সে হামযাকে হত্যা করতে পারে। হামযা বদর যুদ্ধে তার চাচা তুয়েমাকে হত্যা করেছিলেন। ওয়াশী এ জন্য একটি পাথরের নীচে হামযাকে মারার জন্য ওৎ পেতে রইল। হামযা কাছে আসলেই তাকে বর্শা মেরে হত্যা করা হলো।[২৯] ওয়াশী কি খোলামেলাভাবে এত সাহসের সাথে হামযাকে মোকাবেলা করতে পারতো আর হত্যা করতে পারতো?

যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে আরও কেউ কেউ শহীদ হন, এর মধ্যে একজন ছিলেন মুসলমানদের পতাকা বহনকারী, ইসলামের *দায়ী* প্রশিক্ষক মূসা ইবনে উমায়ের। খাব্বাব বললেন ঃ

আমরা আল্লাহর রাসূলের (সা) দোয়া নিয়ে তাঁকে খুশি করার জন্য দলে দলে বের হয়ে গেলাম। সেজন্য পুরস্কার আমাদের প্রাপ্য, আল্লাহ আমাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। আমাদের কেউ কেউ এ পৃথিবীতে পুরস্কার ভোগ করার আগেই বিজয় নিয়েছেন। তাদের মধ্যে মুসাব ইবনে উমায়ের একজন, তিনি ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি সামান্য এক খন্ড বস্ত্র ছাড়া আর কিছুই রেখে যাননি। এ বস্ত্র দিয়েই তাঁকে আচ্ছাদিত করা হয়েছিল। তাঁর বস্ত্রটি এতই ছোট ছিল যে, তা দিয়ে মাথা ঢাকতে চাইলে পা অনাবৃত হয়ে যেত। আর পা ঢাকতে চাইলে মাথা অনাবৃত হয়ে যেত। আল্লাহর রাসূল (সা) সে জন্যে আমাদেরকে বলেছিলেন, "বস্ত্রটি দিয়ে তাঁর মাথা ঢেকে দাও, আর ইযখির গাছের কিছু পাতা তার পায়ের উপর দিয়ে দাও বা ইযখির তাঁর পায়ের উপর দিয়ে দাও।"[৩০]

মু'সাব ইবনে উমায়ের শহীদ হয়ে গেলে আলী ইবনে তালিব পতাকা তুলে ধরেন।[৩১]

নিচের আয়াতে মুসলমানগণ আল্লাহর নির্দেশে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।

> আল্লাহ তোমাদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন যখন তোমরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিনাশ করছিলে ... (৩ঃ১৫২)

তীরন্দাজগণ যখন দেখলেন যে, শামরা কাবু হয়ে পড়েছে তখন তারা আবদুল্লাহ ইবনে জুহায়েরকে বললেন, "গণিমত! গণিমত! আমাদের সাথীগণ জয়ী হয়েছে, তোমরা আর অপেক্ষা করছ কেন"? আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বললেন, "আল্লাহর রাসূল (সা) তোমাদেরকে যা বলেছেন তোমরা কি ভুলে গিয়েছ?" তারা বললেন, আল্লাহর শপথ আমরা লোকদের সাথে আমাদের গণিমতের ভাগ আনতে যাচ্ছি।[৩২] এ কথা বলে তারা গণিমত সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

আল সিদ্দির কাছ থেকে এটা একটা *মুরসাল* রিপোর্ট। এর মাধ্যমে তীরন্দাজগণ পাহাড় থেকে নীচে নেমে আসার পর কী ঘটেছিল তার বর্ণনা পাওয়া যায়। খালিদ বিন ওয়ালিদ মুসলমানদেরকে পেছন থেকে আক্রমণ করার সুযোগ পেয়ে গেল। *মুশরিকরা* এ অবস্থা বুঝতে পেরে আবার বাড়াবাড়ি শুরু করে দিল।[৩৩] তারা মুসলিম বাহিনীকে দু'দিক থেকে ঘিরে ফেলল। মুসলিমগণ তাদের অবস্থান হারিয়ে ফেললেন। তারা

পরিকল্পনাহীনভাবে লড়াই করতে লাগলেন। কে শত্রু কে মিত্র তারা কাউকে চিনতে পারলেন না। তারা আল ইয়ামানকে হত্যা করে ফেললো। তিনি ছিলেন হুযায়ফা ইবনে আল ইয়ামানের পিতা। বয়সে বৃদ্ধ। হুযায়ফা তাদেরকে চিৎকার করে বললেন, "তিনি আমার পিতা!" কিন্তু ইতোমধ্যে তারা কাজটি শেষ করে ফেলল। এই ঘটনার পর হুযায়ফা বললেন, "আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিন, যিনি রহমানুর রহীম।"[৩৪]

মুসলমানদের সাহস আর উৎসাহ কোন কাজে আসেনি। কেননা লড়াইটা ছিল অপরিকল্পিত ও অসংগঠিত। তারা একে একে শহীদ হয়ে যেতে লাগলেন। তাদের সাথে রাসূল (সা) এর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এই সময়ে গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, রাসূল (সা) কে হত্যা করা হয়েছে।[৩৫]

মুসলমানগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। অনেকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলেন। কেউ কেউ যুদ্ধের ময়দানের পাশে যুদ্ধ না করেই বসে রইলেন।[৩৬] কেউ কেউ রাসূল (সা) কে না পেয়ে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যেতে লাগলেন। আনাস ইবনে আল নাযর ছিলেন তাদের মত একজন। তিনি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে না পেরে দুঃখ করে বলেছিলেন, "আল্লাহর শপথ, আল্লাহ যদি আমাকে রাসূল (সা)-এর সাথে কোন যুদ্ধে শরীক হতে তাওফীক দিতেন তা হলে আমি প্রচণ্ড যুদ্ধ করতাম। আল্লাহ দেখতেন।" যুদ্ধ না করে কিছু মুসলমানকে বসে থাকতে দেখে তিনি চিৎকার করে বলছিলেন, "কত মধুর জান্নাতের সুঘ্রাণ, জান্নাত আমার নিকটে।" শহীদ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি লড়াই চালিয়ে যেতে থাকেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শরীরের আশিটি ক্ষতস্থান দেখা গেল। তীরের আঘাত আর ছুরির আঘাতে তাঁর দেহ দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে গেল। একমাত্র তার বোন আল রাবিয়া বিনতে আল নাদিরই কেবল তাঁর ভাইয়ের আঙ্গুলের মাথা দেখে দেহ সনাক্ত করতে পেরেছিলেন। ও অন্যান্য মুত্তাকী মুজাহিদের ব্যাপারে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছিল,

> মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে তাদের কৃত অংগীকার পূর্ণ করেছে তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি। (৩৩ঃ২৩)[৩৭]

যুদ্ধ শেষে রাসূল (সা) আনাস ইবনে নাদিরের খোঁজে যায়িদ ইবনে সাবিতকে পাঠালেন। আনাস ইবনে নাদিরকে মৃতদের মধ্যে পাওয়া গেল। তাঁর তখনও একটু জীবন ছিল। রাসূল (সা)-এর শুভেচ্ছার জবাবে তিনি বলেছিলেন, "আমি জান্নাতের সুবাস পাচ্ছি। আনসারদের মধ্যে যারা জীবিত আছে তাদেরকে এ কথা বলে দাও যে, তোমাদের কারো জীবন থাকা অবস্থায় রাসূল (সা) এর কোন ক্ষতি হলে আল্লাহর কাছে তোমাদের জবাব দেয়ার কিছু থাকবে না।" এর পর আনাস ইবনে নাদির কাঁদতে লাগলেন।[৩৮] কি আশ্চর্য ধরনের প্রতিশ্রুতি, কত শক্ত ওয়াদা যা মৃত্যু আর ব্যাথা বেদনা কোনটাই ম্লান করতে পারেনি, যারা সাহাবীদের, মুহাম্মদ ও মুসলমানদেরকে কষ্ট দিয়েছে তাদের ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

যেদিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, সেদিন তোমাদের মধ্য হতে যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল তাদের কোন কৃতকর্মের জন্য শয়তানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল। অবশ্য আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম সহনশীল। (৩ঃ১৫৫)

মুসলমানগণ রাসূল (সা) এর মৃত্যুর খবর শুনে পালাচ্ছিল।[৩৯] এ সময়ে কাব ইবনে মালিকই বুঝতে পারলেন যে, রাসূল (সা) তখনও জীবিত আছেন। তিনি চিৎকার করে এ সুসংবাদটি মুসলমানদেরকে জানান দিচ্ছিলেন। রাসূল (সা) তাকে শান্ত থাকতে বললেন, যদি পাশে মুশরিকরা জেনে ফেলে।[৪০]

রাসূল (সা) এর পাশে থাকা একটি ছোট্ট গ্রুপ বের হয়ে গেল। রাসূল (সা) যুদ্ধের মাঠে রয়ে গেলেন; কেউ যেন তাঁকে এ ব্যাপারে বিরক্ত না করেন। এরূপ অবস্থায় রাসূল (সা) সব সময়ে এরূপই করতেন।[৪১] রাসূল (সা) তাঁর সাথীদেরকে ডাকলেন। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

স্মরণ কর তোমরা যখন উপরের দিকে ছুটছিলে এবং পেছন ফিরে কারও প্রতি লক্ষ্য করছিলে না আর রাসূল তোমাদেরকে পেছন দিক হতে আহবান করছিল। ফলে তিনি তোমাদেরকে বিপদের উপর বিপদ দিলেন যাতে তোমরা যা হারিয়েছ অথবা যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে তার জন্য তোমরা দুঃখিত না হও। (৩ঃ১৫৩)

কোন কোন *মুশরিক* নিজেরাই রাসূল (সা) এর কাছে এসে হাযির হলো। এ সময় রাসূল (সা) এর সাথে ছিলেন সাতজন *আনসার* ও দু'জন *মুহাজের*। রাসূল (সা) বললেন, "কারা আছ যে *মুশরিকদেরকে* আমার কাছে থেকে বিতাড়িত করবে আর জান্নাতে আমার সাথী হবে।" তাঁর একথা শুনে সাতজন আনসার একে একে সবাই শহীদ না হওয়া পর্যন্ত লড়ে গেলেন।[৪২] এর পর তালহা ইবনে উবায়েদ আল্লাহর বীরের ন্যায় লড়ে গেলেন। তাঁর হাত তীরের আঘাতে অবশ হয়ে গেল।[৪৩] সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাসূল (সা) এর সামনে থেকে লড়ে গেলেন। রাসূল (সা) লড়াইয়ের জন্য তাঁকে একটি তীর দিয়ে বলেছিলেন, "নিক্ষেপ কর! আঘাত কর! আমার মা ও বাবা তোমার মুক্তি মূল্য হতে প্রস্তুত!"[৪৪] সা'দ ছিলেন বিখ্যাত একজন তীরন্দাজ। তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে আবু তালহা ও রাসূল (সা) কে রক্ষা করেছিলেন। রাসূল (সা) শত্রুদের অবস্থান দেখার জন্য তার মাথা উঁচু করেছিলেন। এ সময় আবু তালহা বললেন, "মাথা তুলবেন না, শত্রুর তীর এসে মাথায় আঘাত করবে। এর চেয়ে আপনার গর্দানের চেয়ে আমার গর্দানে তীর এসে আঘাত করুক তাও ভাল।" রাসূল (সা) এর পাশ দিয়ে যখন তূণী ভর্তি তীর নিয়ে পার হচ্ছিল তখন রাসূল (সা) তাকে বললেন, "আবু তালহার জন্য এগুলো ছড়িয়ে দাও।"[৪৫] রাসূল (সা) আবু তালহার লড়াকু দক্ষতা নিয়ে কথা বলছিলেন। সেনাবাহিনীর প্রতি তালহার গর্জন *মুশরিকদের* জন্য এতই ভয়ংকর যে, যুদ্ধক্ষেত্রের একটি কন্টিনজেন্ট-এর চেয়েও তা ছিল গগন বিদারী।"[৪৬]

সাহাবীদের সাহসিকতা ও রাসূল (সা) এর তেজ বীর্যের পরও রাসূল (সা) এর শরীরে অনেকগুলো আঘাত তাঁকে দীর্ণ বিদীর্ণ করে দিল। তাঁর দাঁত ভেংগে গেল, তিনি মুখমন্ডলে আঘাত পেলেন। তার মুখমন্ডল থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল, তিনি শুধু মুছে দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন," জনগণ কিভাবে তাদের ভাল করবে যে জনগণ তাদের নবীর মুখমন্ডলকে রক্তাক্ত করে। তখনও রাসূল (সা) মানুষকে ইসলামের পথে ডাকছিলেন।" রাসূল (সা) এর এ অবস্থা প্রসঙ্গে কুরআনে আল্লাহ্ বলেন ঃ

> তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দেবেন। এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নেই; কারণ তারা সীমা লংঘনকারী। (৩:১২৮)[৪৭]

রাসূল (সা) প্রায়ই দোয়া করতেন যে, যারা তার প্রতি নির্যাতন করেছে আল্লাহ তাদের যেন একইভাবে শাস্তি না দেন। কিন্তু আল্লাহ বলেন যে, এটা আল্লাহই ঠিক করবেন যে, তিনি তাদেরকে ঠিক পথে পরিচালনা করবেন কিনা। রাসূল (সা) এর আশা ছিল যে, তারা ইসলাম কবুল করবে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা) আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন।" হে আল্লাহ্, আমার উম্মতদের তুমি মাফ করে দাও, তারাতো জানে না।"[৪৮]

হাদীসে পাওয়া যায় এ সময়ে, আবু দুজনা রাসূল (সা) কে আড়াল করে রেখেছিলেন, তাঁর দিকে পিঠ দিয়ে তাঁকে বর্মাচ্ছাদিত করে রেখেছিলেন, আবু দুজনার শরীরে অনেকগুলো তীর বিঁধলো, তাঁর চোখে আঘাত পেলেন। রাসূল (সা) তাঁর হাত দিয়ে চোখ রক্ষা করছিলেন। হাতটা থাকতে তাঁর চোখ রক্ষা পেয়েছে।"[৪৯]

এ সময়ে জনৈক লোক এসে রাসূল (সা) কে বলল, "আপনি কি বলতে পারেন আমার মৃত্যু কোথায় হবে?" রাসূল (সা) বললেন "জান্নাতে"। লোকটি রাসূল (সা) এর কথা শুনে তার হাতের খেজুরগুলি ছুড়ে ফেলে দিল আর শহীদ না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গেল।[৫০]

আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ তার প্রভুর কাছে আরয করলো, "আমি যখন যুদ্ধে যাই আর শত্রুর সাথে লড়াই করি তখন আমি দোয়া করতে থাকি যাতে তারা আমাকে হত্যা করে। আমার পাকস্থলি কেটে আমার নাড়ি-ভূঁড়ি খুলে নেয়। এর পর আমি যখন তোমার সাথে দেখা করবো তখন তুমি আমাকে বলবে, "তোমার এরূপ হয়েছে কেন?" আমি তখন বলবো, "তোমার জন্যই আমার এরূপ হয়েছে।" মুসলিমরা যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুদের মোকাবেলা করে আব্দুল্লাহ তখন লড়াই করতে করতে শহীদ হন। *মুশরিকরা* তাঁর দেহ ছিঁড়ে ফেলে, নাড়ি-ভূড়ি বের করে ফেলে। তাঁর দোয়া এখানেই পুরণ হয়েছে।[৫১]

আমর ইবনুল জামু ছিলেন খোঁড়া। তাঁর শারীরিক অক্ষমতার জন্য তিনি যুদ্ধে যাওয়া থেকে অব্যাহতি পান। কিন্তু এর পর তিনি জিদ ধরলেন যে, তিনি যুদ্ধে যাবেন, *জিহাদ* করবেন তাঁর সন্তানদের সাথে, *মুশরিকদের* সাথে লড়বেন। তিনি শহীদ হতে চেয়েছেন। রাসূল (সা) কেও আমর ইবনুল জামু জিজ্ঞাসা করছিলেন, আমি যদি আজ

জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে যাই তাহলে কি আমি আমার এ খোঁড়া পা নিয়ে জান্নাতে যেতে পারবো?" রাসূল (সা) বললেন, "হ্যাঁ"। আমর রাসূল (সা) এর কথা শুনে বললেন, "আপনার আল্লাহর কসম যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, আল্লাহর ইচ্ছায় আমি জান্নাতে যাবো।" এ কথা বলার পর তিনি লড়াই করতে করতে শহীদ হন।[৫২]

হানযালা শহীদ হন তাঁর অপবিত্র অবস্থায় (ধর্মীয় অপবিত্রতা)। ওহুদ যুদ্ধের আগের রাতে তার বিবাহ হয়েছিল। এ অবস্থায় তিনি জিহাদের ডাক শুনেন। তিনি *জিহাদে* শরীক হন। তিনি গোসল করবারও সুযোগ পান নি। রাসূল (সা) বললেন, "হানযালাকে ফিরিশতাগণ পবিত্র করেছেন।"[৫৩]

ওহুদ যুদ্ধে অন্যান্যদের সাথে মুখায়রিকও শহীদ হন। মুখায়রিক ছিলেন *ইহুদী* বানু আল নাযীরের জনৈক ব্যক্তি। তিনি তাঁর সম্পত্তি রাসূল (সা) এর নামে লিখে দেন। মৃত্যুর পর রাসূল (সা) তাঁর সম্পত্তি গ্রহণ করেছিলেন।[৫৪]

দু'বৃদ্ধ যাদেরকে রাসূল (সা) তার দূর্গে নারী ও শিশুদের সাথে রেখে এসেছিলেন, তারা যুদ্ধে যোগ দিতে চাইলেন, শহীদ হতে চাইলেন। বৃদ্ধরা ছিলেন হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামানের বাবা আল ইয়ামান ও ছাবিত ইবনে ওয়াককাস্। যুদ্ধ করতে করতে দু'বৃদ্ধও শহীদ হয়ে যান। সাবিত *মুশরিকদের* হাতে শহীদ হন আর আল ইয়ামান মুসলমানদের হাতে শহীদ হন। মুসলমানগণ তাঁকে চিনতে না পারার কারণে এরূপ হয়েছিল। রাসূল (সা) এজন্য ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর সন্তান হুযায়ফা এটাকে *সদকা* হিসাবে দিয়ে দেন। তার এ দানে রাসূল (সা) খুশি হন।[৫৫]

আমর ইবনে উকাইশ ইসলাম অপছন্দ করতেন। তিনি ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে *মুশরিকদের* বিরুদ্ধে লড়াই করেন। মুসলমানগণ তাকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখতে চাইলেন। কিন্তু তিনি বললেন "আমি ইসলাম কবুল করেছি।" যুদ্ধে আহত হওয়া পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ করতে থাকেন। এ অবস্থায় তাকে পরিবারে ফিরিয়ে নেয়া হয়। এ সময় সা'দ ইবনে মুয়ায তার বোনকে বললেন, "তাকে জিজ্ঞাসা কর সে কি তার লোকদের জন্য লড়াই করছিল, নাকি সে আল্লাহর পথে লড়াই করছিল। আমর বললেন, "আমি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সা) এর জন্য লড়াই করেছি।" এর পর তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। তিনি নামায পড়ার সুযোগও পাননি। এ অবস্থাতেই তিনি জান্নাতে প্রবেশ করেন।[৫৬]

রাসূল (সা) জনৈক ব্যক্তির কথা বলেছেন যিনি সাহসিকতার সাথে লড়াই করেছিলেন। রাসূল (সা) বলেছেন, "সে দোযখবাসী হয়েছে।" এর পর রাসূল (সা) বলেন, "এ লোকটি তার গোত্রিয় প্রধান্য বিস্তারের জন্যই লড়াই করেছিল, সে আল্লাহর পথে লড়াই করেনি। লোকটির ব্যাথা বেদনা এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে সে নিজকে নিজের তীরের আঘাতে হত্যা করলো।[৫৭]

এ দু'টো বর্ণনার মাধ্যমে *জিহাদে* লোক দেখানোর বিষয়টিকে স্পষ্ট করা হয়েছে। যারাই আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে আল্লাহ সেজন্য পুরস্কার দেবেন। কিন্তু যারা অন্যবিধ

কারণে যুদ্ধ করবে, সেটা অন্য যেকোন মহান কিছুই হোকনা কেন, এটা শহীদের পর্যায়ভুক্ত হবে না।[৫৮]

ওহুদ যুদ্ধে মুসলমান পুরুষ সৈনিকদের সাথে অনেক মহিলাও যোগ দিয়েছিলেন। উম্মে আমারাহ্ নুসাইবা বিনতে কা'ব আল মাজিনিয়্যা ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। তিনি রাসূল (সা) এর প্রতিরক্ষার্থে যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি শরীরে অনেক আঘাত পান।[৫৯] হামনা বিনতে জাহাশ আল আসাদিয়্যা যুদ্ধ ক্ষেত্রে পিপাসার্তদেরকে পানি পান করাতেন, যুদ্ধাহতদের ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করার কাজে সাহায্য করতেন।[৬০] *সহীহ* হাদিসে আছে উম্মে সালিত এইরূপ একজন মহিলা, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে আহত যোদ্ধাদেরকে পানি পান করিয়েছিলেন।[৬১]

বিশ্বস্ত সূত্র মতে, যুদ্ধশেষে মুসলমানগণ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আয়শা ও উম্মে সলিম আহতদেরকে পানি এনে দিয়েছিলেন।[৬২] এসব রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, প্রয়োজনে মহিলারা আহতদের সেবা সুশ্রুসা দিতে প্রস্তুত ছিল যে পর্যন্ত না তারা কারো কোন ক্ষতির কারণ না হয়ে দাঁড়ায়, আর যে পর্যন্ত তারা শালীনভাবে পোশাকে আচ্ছাদিত থাকে। শত্রু তাদেরকে আক্রমণ করলেও তারা এর প্রতিরোধ করার অধিকার রাখে। *জিহাদ* শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য বাধ্যতামূলক হলেও শত্রুরা মুসলমান ভূখন্ড দখল করলে তখন নারী পুরুষ সবাই শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে।

মুসলমানদের হতাহত হওয়া আর রাসূল (সা) এর আহত হওয়া সত্ত্বেও উভয় পক্ষ কাহিল না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকে।

মুশরিকরা ওহুদ উপত্যকার দিকে চলে যেতে থাকে, উপত্যকার একটা ঢালে না উঠা পর্যন্ত মুসলিমরাও তার পিছে পিছে যেতে থাকে। ঐ স্থান থেকে মুসলমানগণ *মুশরিকদের* প্রতিরোধ করতে থাকে। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ স্বয়ং জিবরাইল ও মিকাইলকে রাসূল (সা) কে বাঁচানোর জন্য পাঠান। আল্লাহ রাসূল (সা) কে লোকজনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। সে যাই হোক ওহুদের যুদ্ধে ফিরিশতারা যুদ্ধ করেছিল এমন কোন নির্ভর যোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না[৬৩] তবে আল্লাহ্ মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধির কথা বলেছিলেন। তবে এ প্রতিশ্রুতি তিনটি শর্তের উপর নির্ভরশীল ছিল ঃ *সবর* (যে কোন অবস্থায় নিজের উপর দৃঢ় থাকা), *তাকওয়া* (আল্লাহর উপর নির্ভরশীল থাকা) মুসলমানদের উপর শত্রু আক্রমণ হওয়া।[৬৪]

> স্মরণ কর, যখন তুমি মুমিনদের বলছিলে, 'ইহা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তিন সাস্র ফিরিশতা দ্বারা তোমাদেরকে সহায়তা করবেন।' হাঁ, নিশ্চয়, যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং সাবধান হয়ে চল, তবে তারা দ্রুতগতিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করলে আল্লাহ পাঁচ সহস্র চিহ্নিত ফিরিশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন[৬৫] (৩:১২৪-৫)।

রাসূল (সা) ও মুসলমানদের উপর যে বিপদ আপতিত হয় তাতে তারা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ এই সময়ে তাদেরকে তন্দ্রাছন্ন করে দেন। তারা কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে

নেন। তারা যখন ঘুম থেকে জেগে উঠেন তাদের ভয় দূর হয়ে যায়। তারা নতুন উদ্দীপনা ও আস্থায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠেন। আবু তালহা আল আনসারী এ ব্যাপারে বলেন, "যারা ক্ষণিক ঘুমিয়ে নিয়েছিলেন আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম। এ সময় বার বার আমার হাত থেকে তরবারী পড়ে যাচ্ছিল। তরবারী হাত থেকে পড়ে গেল। আমি তুলে নিলাম, আবার পড়ে গেল আমি আবার তুলে নিলাম।"

আল্লাহ কুরআনে বলেন ঃ

> স্মরণ কর তোমরা যখন উপরের দিকে ছুটছিলে এবং পিছন ফিরে কারও প্রতি লক্ষ্য করছিলে না আর রাসূল তোমাদেরকে পিছন দিক হতে আহ্বান করছিল, ফলে তিনি তোমাদেরকে বিপদের উপর বিপদ দিলেন যাতে তোমরা যা হারিয়েছ অথবা যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে তার জন্য তোমরা দুঃখিত না হও। তোমরা যা কর আল্লাহ তা বিশেষভাবে অভিহত। (৩:১৫৩)

যে দলটি শুধুই নিজের কথা ভাবছিল, মুসলমানদের দুর্ভাগ্যের কথা, ইসলামের কি হবে সে কথা ভাবেনি সেটি হলো মুনাফিকবৃন্দ। মুনাফিকদের মধ্যে একজন বলছিল,"

> ... এ ব্যাপারে আমাদের কোন অধিকার থাকলে আমরা এ স্থানে নিহত হতামনা' (৩:১৫৪)[৬৬]

এটা সত্য যে একটু ঘুমানোর কারণে মুসলমানগণ সতেজ হয়ে উঠেন এবং যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগের সময় শক্তি অর্জন করেন। কোন কোন *মুশরিক*ও মুসলমানদেরকে অনুসরণ করে। এর মধ্যে উবায় ইবনে খালাফ আল জুমাহি'র নাম উল্লেখযোগ্য যে রাসূল (সা) কে হত্যার পরিকল্পনা করে। রাসূল (সা) বর্শা দিয়ে তাকে আঘাত করেন। সে আহত হয়। সে তার সাথীদের কাছে ফিরে যায় ও ওহুদ থেকে ফিরে যাওয়ার সময় নিহত হয়।

মুশরিকরা যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়ের আশা ত্যাগ করে। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ায় *মুশরিকরা* অধৈর্য হয়ে পড়লো। মুসলমানদের সহ্য শক্তির কাছে তারা হতবিহ্বল হয়ে গেল। তারা গিরিসঙ্কটে মুসলমানদেরকে অনুসরণ করা বন্ধ করে দিল। তবে আবু সুফিয়ান মুসলমানদের কাছে গিয়ে চিৎকার করে বললো, লোকদের মাঝে কি মুহাম্মদ আছে? এ সময় রাসূল (সা) বললেন, "তার কথার জবাব দিও না।" আবু সুফিয়ান আবার বলল, লোকজনের মাঝে কি আবু কুহাফা আছে? এসময় রাসূল (সা) বললেন, "তার কথার উত্তর দিওনা" আবু সুফিয়ান আবার বললো "আল খাওয়াবের সন্তান কি লোকজনের মধ্যে আছে," সে তখন কারো জবাব না শুনে বললো "এই লোকেরা সবাই মরেছে। তারা জীবিত থাকলে জবাব দিত।" তার এ কথা শুনে ওমর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি বললেন, "হে আল্লাহর দুশমন তোমার কথা সত্য নয়। তোমার শাস্তি বিনষ্ট করার জন্য তাদেরকে মজুদ রাখা হয়েছে। আবু সুফিয়ান এ সময় বললো," হুবাল শ্রেষ্ঠ।" রাসূল তার কথা শুনে সাহাবীদের উদ্দেশে বললেন "তাকে জবাব দাও।" তারা তখন জিজ্ঞাসা করলেন "আমরা কী জবাব দিব?" তিনি বললেন, "তোমরা বল, আল্লাহ

আমাদের সাহায্যকারী, তোমার কোন সাহায্যকারী নেই।" আবু সুফিয়ান বললো, "আমাদের আছে *উজ্জা*, তোমাদেরতো কোন *উজ্জা* নেই।" রাসূল (সা) বললেন, "তোমরা জবাব দাও।" তারা জিজ্ঞাসা করলেন, "আমরা কী জবাব দেব।" রাসূল (সা) বললেন, "বল, আল্লাহ আমাদের সাহায্যকারী, তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই।" এ কথা শুনে আবু সুফিয়ান বলল, "আজকের যুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের বদর যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হয়েছে, যুদ্ধের মধ্যে জয় সবসময় অমিমাংসিত থেকে যায়। যুদ্ধরতদের মাঝে যুদ্ধের পরিণাম ভাগাভাগি হয়ে থাকলো। তোমরা তোমাদের কতক লোককে ছিন্নবিচ্ছিন্ন অবস্থায় পাবে, তবে আমি কিন্তু কখনো এরূপ চাইনি, আমি এর জন্য দুঃখিতও নই।"[৬৭]

আরেকটি বর্ণনা থেকে জানা যায় উমর বলেছিলেন," আমাদের শহীদগণ বেহেশতে আর তোমাদের মৃতরা দোযখে।"[৬৮] প্রথমে মুসলমানগণ আবু সুফিয়ানের জবাব না দেয়াতে আবু সুফিয়ান অপমানিত বোধ করলো। এর পরে সে এর জন্য গর্ববোধ করলো ও উত্তেজিত হয়ে পড়লো। তারা তাকে আসল অবস্থা বয়ান না করা পর্যন্ত, তার কথার সাহসিকতার সাথে জবাব না দেয়া পর্যন্ত সে উত্তেজিত বোধ করলো।

ইবনে ইসহাক ও আল ওয়াকিদী একমত যে, আবু সুফিয়ান বছর খানেকের মধ্যে তাদের সাথে আবার সাক্ষাৎ করতে চাইল। মুসলমানগণ তার এ প্রস্তাবে রাযী হলেন।[৬৯]

ইবনে ইসহাক ও আলকিদ্দির মতে রাসূল (সা) আলীকে বাইরে পাঠালেন দেখতে যে কুরাইশরা কোন দিক থেকে অগ্রসর হচ্ছে, তারা কি মদীনা আক্রমণ করতে চায় না তারা কি মক্কায় ফিরে আসতে চায়?[৭০] আল ওয়াকিদির মতে রাসূল (সা) সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে তাদের যুদ্ধ কৌশল দেখে আসতে বললেন।[৭১] প্রথম রিপোর্টটি নির্ভরযোগ্য। যাহোক, কুরাইশরা চলে গেল। তারা যে প্রতিশোধ নিতে পেরেছে তাতেই সন্তুষ্ট। চূড়ান্ত বিজয়কে তারা দরকার মনে করেনি। চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য তাদেরকে হোদের গিরিসঙ্কটে মুসলমানদের অনুসরণ করতে হতো। আর তাদেরকেও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে হতো বা মদীনা দখল করতে হতো।

কুরাইশরা চলে যাওয়ার পর পরই রাসূল (সা) শহীদদেরকে সমাধিস্থ করার নির্দেশ দিলেন। সত্তরজন শহীদ হলেন।[৭২] কোন মুসলমান বন্দী হয়নি। ইবনে ইসহাকের মতে কুড়িজন মুশরিককে হত্যা করা হয়।[৭৩] কবি আবু ইজ্জাকে মুসলমানগণ বন্দী করেন। রাসূল (সা) এর সাথে তার প্রতিশ্রুতি ভংগের কারণে তাকে হত্যা করা হয়। আবু ইজ্জাকে বদরযুদ্ধে বন্দী করা হয়ছিল। সে রাসূল (সা) এর সাথে আর যুদ্ধ করবে না এ প্রতিশ্রুতি দিলে তাকে তখন ছেড়ে দেয়া হয়। এর পরও আবু ইজ্জা ওহুদ যুদ্ধে রাসূল (সা) এর সাথে লড়াই করে।[৭৪]

সহীহ হাদিসে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা) দু'জন শহীদকে একই কাপড়ে কাফন দিয়ে দিলেন। যারা প্রথম দিকে কুরআন বেশী জানতেন তাঁরা তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি

তাঁদেরকে গায়ে রক্ত থাকা অবস্থাতেই সমাহিত করতে নির্দেশ দিলেন। রাসূল (সা) তাদেরকে গোছল দেননি বা তাদের জন্য জানাযাও পড়েননি। রাসূল বলেছেন, "পুনরুত্থান দিবসে আমি তাদের জন্য সাক্ষী হবো।"[৭৫]

কোন কোন রিপোর্টে পাওয়া যায় রাসূল (সা) ওহুদের শহীদদের জন্য জানাযা পড়েছিলেন। তবে এই রিপোর্টগুলো অতটা জোরালো নয়। রিপোর্টগুলো এ প্রসঙ্গে যে হাদীসে রয়েছে তাকে বাতিল করতে পারেনি। এ হাদীসগুলোতে শহীদদের জন্য রাসূল (সা) কোন জানাযা পড়েন নি বলে বর্ণিত হয়েছে। এ রিপোর্টগুলোর সমালোচনা করা হয়।[৭৬] দু'তিনজনকে একত্রে একই কবরে কবরস্থ করা হয়।[৭৭] কোন কোন শহীদকে তাদের পরিবার বর্গ সমাধিস্থ করার জন্য মদীনায় নিয়ে যান। তবে রাসূল (সা) নির্দেশ দেন ওহুদের যে স্থানে তারা শহীদ হয়েছেন তাদেরকে যেন সেখানে সমাধিস্থ করা হয়।[৭৮]

শহীদদের সমাধিস্থ করা শেষে রাসূল (সা) তাঁর বাহিনীকে, তাঁর সাহাবীদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন।[৭৯]

> হে আল্লাহ সকল প্রশংসা আপনার। আপনি যা মঞ্জুর করেন তা কেউ রোধ করতে পারে না। আর আপনি যা রোধ করেন তা কেউ মঞ্জুর করতে পারবে না। আপনি যাদেরকে বিপথে পরিচালিত করতে চান কেউ তাদেরকে সহীহ পথে পরিচালিত করতে পারবে না। আর কেউ তাকে বিপথে পরিচালিত করতে পারবেনা, যাকে আপনি সৎপথে পরিচালিত করতে চান। আপনি কাউকে কিছু দিতে চাইলে কেউ তা রোধ করতে পারবে না, আর আপনি রোধ করতে চাইলে কেউ তা দিতে পারবে না। আপনি আপনার কাছে নিতে চাইলে কেউ তাকে আটকিয়ে রাখতে পারবে না। হে আল্লাহ, আমাদের প্রতি আপনার দয়া ও রহমত বর্ষণ করুক। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে অসীম রহমত, অবারিত রহমত চাই। হে আল্লাহ, অভাবের সময়ে আমি আপনার কাছে প্রাচুর্য চাই, ভয়ে আপনার কাছে নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ আপনার কাছে নষ্টের হাত থেকে আশ্রয় চাই। যে খারাপির আশংকা করছি তার থেকে আর যে খারাপিকে আপনি না করেছেন তার থেকে *পানাহ* চাই। হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে ঈমানকে ভাল বাসতে দিন। মিথ্যাকে ঘৃণা করতে দিন। অন্যায়, আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে ঘৃণা করতে শক্তি দিন, সত্য পথে চলার ক্ষমতা দিন। হে আল্লাহ আমাদেরকে মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করতে দিন। কিয়ামতের দিন আমাদেরকে মুসলমান হিসাবে পুনরুত্থিত করুন, যারা পুণ্যবান তাদের সাথে আমাদেরকেও উত্থান করুন, ঐ দিন আমাদেরকে কোন কষ্ট দেবেন না, কোন লজ্জা দেবেন না, হে আল্লাহ, কাফিরদের বিরুদ্ধে আপনি যুদ্ধ করুন যারা আপনার রাসূলকে বাধা দেয়, সত্য পথ থেকে। আপনার পথ থেকে বাধা দেয়, তাদের উপর গযব নাযিল করুন। হে আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে আপনি লড়াই করুন, যাদেরকে আপনি আপনার কিতাব

প্রেরণ করেছেন আর যারা আপনার কিতাবকে প্রত্যাখ্যান করেছে।" এর পর রাসূল তাঁর ঘোড়ায় করে মদীনায় ফিরে যান।

ওহুদের যুদ্ধের শহীদদের স্মৃতি রাসূল (সা) বয়ে চললেন। যখনই শহীদের কথা আসতো তিনি বলতেন, তিনি যদি তাদের সাথে শহীদ হতেন। রাসূল (সা) বলতেন "হে আল্লাহ আমি যদি ওহুদের পাহাড়ের ঢালে আপনার সাথীদের সাথে থেকে যেতাম!"[৮০]

যখনই রাসূল (সা) এর মনে বীর যোদ্ধাদের কথা উদয় হতো তখনই তিনি তাদের নামে দোয়া করতেন। তাদের প্রশংসা করতেন। আলী ফাতিমাকে তাঁর তরবারী হস্তান্তরের সময় বলেছিলেন, "এটি আমার তরবারী, এটি আপনার যথেষ্ট উপকার করেছে।" রাসূল (সা) বললেন, "তোমরা যদি ভালভাবে লড়াই করে থাক তাহলে সাহল ইবনে হানিফ, আবু দুজানা, অসিম ইবনে সাবিত আল আকলাহ ও আল হারিস আল সাম্মাহও তোমাদের সাথে বীরের মত লড়াই করেছে।"[৮১]

মদীনা থেকে নারী ও শিশুরা তাদের স্বামী ও পিতাদের খোঁজে বের হয়ে আসলো। যখন হামনা বিনতে জাহাশকে বলা হলো যে, তার ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ, তার মামা হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন তখন তিনি বললেন, "আমরা আল্লাহরই, আর আল্লাহরই কাছে ফিরে যাবো। তাদের ক্ষমার জন্য দোয়া করুন।" যখন হামনা বিনতে জাহাশকে বলা হলো যে তার স্বামী মুসাব শহীদ হয়েছেন। তিনি এই কথা শুনে কুঁকড়িয়ে গেলেন আর বিলাপ করতে লাগলেন। রাসূল (সা) তখন বললেন, "স্বামীগণ বেহেশতে তাদের স্ত্রীদের সাথে বিশেষ স্থানে বসবাস বরবে, তোমরা যেমন তাকে ভাইয়ের মৃত্যুতে, চাচার মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণ করতে দেখেছ, তার স্বামীর মৃত্যুতে তাকে কুঁকড়িয়ে যেতে দেখেছ।"[৮২]

রাসূল (সা) বানু দীনার গোত্রের জনৈক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যার স্বামী, ভাই, পিতা ওহুদের যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছেন, যখন তাকে তার এসব আত্মীয়দের মৃত্যু সংবাদ দিলেন তখন ঐ মহিলা রাসূল (সা) এর কি খবর জানতে চাইলেন। তারা জবাবে বললেন আল্লাহর শুকরিয়া রাসূল (সা) জীবিত আছেন। মহিলা তখন বললেন, আমি তাঁকে দেখতে চাই। রাসূল (সা) কে যখন দেখিয়ে দেয়া হলো তখন ঐ মহিলা বললেন "আপনি যে নিরাপদে আছেন তার তুলনায় ঐ সব ক্ষতিগুলো তুচ্ছ (নগণ্য বুঝাতে এখানে *যাল* বলা হয়েছে)।[৮৩]

শহীদদের জন্য রাসূল (সা) বিশাল পুরস্কারের সুখবর দিয়েছেন। তিনি জাবিরের পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর-এর কন্যাকে বললেন, "তুমি কাঁদছ কেন? ফিরিশতাগণ তাকে তাদের পাখাতলে ছায়া দিয়ে রাখবে তার বেহেশতে না যাওয়া পর্যন্ত।"[৮৪]

রাসূল (সা) মদীনার লোকদেরকে তাদের আত্মীয় স্বজনদের জন্য কাঁদতে শুনেছেন। রাসূল (সা) বললেন, হামযার জন্য কাঁদার কেউ নেই। তাঁর এ কথা শুনে কিছু আনসার সাথে সাথে হামযার জন্য কান্না শুরু করে দিল। রাসূল (সা) তাদের সাথে কোমলভাবে কথা বললেন। তবে তাদেরকে কাঁদার জন্য শক্তভাবে নিষেধ করে

দিলেন। তাদেরকে জোরে জোরে কাঁদতে না করলেন।[৮৫] তখন থেকে জোরে জোরে মৃতের জন্য কাঁদা নিষেধ হলো, আর শুধু মাত্র অশ্রুবর্ষণের অনুমতি দেয়া হলো।

> ওহুদের যুদ্ধে শহীদদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো মৃত মনে করো না বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তারা জীবিকা প্রাপ্ত। (৩:১৬৯)[৮৬]

বেশীর ভাগ পন্ডিতের মতে শহীদরা বাস্তবেই জীবিত, মুখরিত পাখিদের মধ্যে তাদের রূহ বিরাজমান, জান্নাতে তাদেরকে যে পাখিকুল দেয়া হবে তাদের মধ্যে তাদের রূহ বিরাজ করছে। তারা জীবিত আছে, আর তারা সহজ জীবন যাপন করে।[৮৭] শহীদদের ব্যাপারে আরও আয়াত নাযিল হয়েছে। এর সবগুলোতেই মুসলমানদের সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এবং ওহোদের যুদ্ধের কষ্ট দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে।

> তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়োনা; তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মু'মিন হও (৩:১৩৯)

> কোন আঘাত দ্বারা তোমাকে কেউ আঘাত করলে তাকেও অনুরূপ ভাবে আঘাত প্রাপ্ত করা হবে। আমি মানুষে মানুষে পর্যায়ক্রমে (বিভিন্ন মাত্রায়) এরূপ দিনের সম্মুখীন করে থাকি (৩:২৬)

> তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যখন আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে *জিহাদ* করেছে এবং কে ধৈর্যশীল তা এখনো জানেন না। (৩:১৪২)

মদীনায় মুসলিমগণ এমন ইহুদীদের মোকাবেলা করেছে যারা মুসলিমদের দুঃসময়ে আনন্দ উপভোগ করেছে। গুজব রটনাকারী মুনাফিকরা মুসলমানদের দুঃসময়ে আনন্দ উল-াস করেছে। মদীনার চারদিকে মুসলমানগণ *মুশরিক* বেদুঈনদের মোকাবেলা করেছে। এ বেদুঈনরা মুসলমানদের সম্পদে লোভাতুর দৃষ্টি দিয়েছিল। কুরাইশরা মুসলমানদের ধবংস করতে না পেরে অনুতপ্ত হবে এরূপ একটি সম্ভাবনা ছিল। তাছাড়া মদীনা আক্রমণে তারা ফিরে যাবে তারও একটি সম্ভাবনা ছিল। মুসলমানদের সামনে তাদের হৃত গৌরব ফিরে পাওয়া আর হৃত অবদান ফিরে পাওয়া ছাড়া তাদের আর কোন বিকল্প রইল না। রাসূল (সা) তাঁর যেসব সেনাবাহিনী ওহুদের যুদ্ধে শরীক হয়েছিল সে বাহিনীকে কুরাইশদের ওপর আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। এই আক্রমণ হামরা আল আসাদ পর্যন্ত চললো। ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের অনেকে আহত হয়েছিলেন। তাদেরকে তিনি এ আক্রমণে শরীক হতে দেননি। তাদের মধ্যে সত্তরজন ছিলেন সাহাবী, অবশিষ্টগণ ছিলেন সৈন্যবাহিনী। তারা খুব দ্রুত কুরাইশদের আক্রমণ করলেন। সব মিলে তাদের সংখ্যা ছিল ৩৫০ জন।[৮৮]

> জখম হওয়ার পর যারা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে তাদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। (৩:১৭২)

এ প্রসঙ্গে আয়েশা উরওয়ার কাছে বলেছিলেন ঃ

তোমার পিতা, আল যুবায়ের ও আবুবকর তাদের মধ্যে ছিলেন (যেমন, যারা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে ওহুদের যুদ্ধের দিনে)। যখন আল্লাহর রাসূল (সা) কষ্ট ভোগ করেছেন, তিনি ওহুদের মাঠে সে কষ্ট পেয়েছেন। পৌত্তলিকরা তাঁকে এ কষ্ট দিয়েছিল। রাসূল (সা) ভয় করেছিলেন যে, তারা আবার ফিরে আসতে পারে। রাসূল (সা) সেজন্য বলেছিলেন, "এরপর তিনি তাদের মধ্য হতে সত্তরজনকে নির্বাচিত করলেন (এ উদ্দেশ্যে)"[৮৯]

সনদ ছাড়া ইবনে ইসহাক বলেন যে, রাসূল (সা) সোম, *মঙ্গল ও বুধ* এ তিন দিন হামরা আল আসাদে অপেক্ষা করেছিলেন। এ সময়ে সাবাদ আল খুজাই তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এরপর খুজাই আল রাওয়ায় আবু সুফিয়ান মুশরিকদের সাথে দেখা করে। তারা মুসলমানদেরকে একেবারে ধবংস করে দেয়ার মনস্থ করলো তবে মা'বাদ তাদেরকে এ ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেন। মাবাদ তাদেরকে জানালেন যে, মুসলিমরা হামরা আল আসাদে হাযির হয়েছে। মাবাদ কুরাইশদেরকে মক্কায় ফিরে যেতে পরামর্শ দিল।

হামরা আল আসাদের অভিযানে তারা তাদের ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এর মাধ্যমে তারা এটা সবাইকে দেখাতে সক্ষম হয়েছে যে, ওহুদের মর্মস্পর্শী ঘটনার পরও তারা বেদুঈন ও কুরাইশদেরকে প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখে। মুসলমানগণ মদীনার বাইরে সামরিক প্রস্তুতি নিতে পারলে তারা শহরের মধ্যে ইহুদী ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার আরো বেশী ক্ষমতা রাখে।

ওহুদের যুদ্ধের পরের অভিযান

ওহুদের যুদ্ধের পর যেসব ঘটনা ঘটেছে এর মধ্যে একটি হলো মদীনার চার পাশের বেদুঈনরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাহসী হয়ে উঠেছিল। তালিহা আল আসাদী ও তার ভাই সালিমার নেতৃত্বে নযদে বানু আসাদের বাহিনী, খালিদ ইবনে সুফিয়ান আল হুদাইলের নেতৃত্বে আরাফাতে বানু হুদাইল এর বাহিনীর সমাবেশ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠলো। মদীনার সম্পদের লোভে, পৌত্তলিক ধর্মের সমর্থনে এবং কুরাইশদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করতে গিয়ে তারা মদীনা দখল করতে চেয়েছিল। তাছাড়া কুরাইশদের মিত্র হওয়ার বাসনাও তাদেরকে এ আক্রমণে ইন্ধন জুগিয়েছিল। হিজরীর তৃতীয় বৎসরে মুহাররম মাসে এ অভিযানটি পরিচালিত হয়।[৯০]

মুসলমানগণ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পূর্বেই এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। রাসূল (সা) ১৫০ জন লোকসহ তালিহা আল আসাদীর কাছে আবু সালমা ইবনে আবদুল আসাদকে পাঠালেন। তালিহার অনুসারীদেরকে বিস্ময়ের সাথে গ্রহণ করা হলো। তারা ভয়ে এদিক সেদিক পালিয়ে গেল। তারা তাদের উট আর পশুগুলোকে মুসলমানদের জন্য রেখে চলে গেল।[৯১]

রাসূল (সা) খালিদ ইবনে সুফিয়ান আল হুদালীর কাছে আবদুল্লাহ ইবনে উনায়েস আল জুহানীকে পাঠালেন। আবদুল্লাহ তাকে হত্যা করলেন আর বাতন আরনাতে তার পশুগুলোকে আটক করেন।[৯২] বাতন আরনা আরাফাতের নিকটস্থ একটি উপত্যকা।

হুদায়েল বংশটা সুফিয়ান আল হুদালীর উপর প্রতিশোধ গ্রহণে যথেষ্ট সক্ষম ছিল। কিন্তু তারা বিশ্বাসঘাতকতা আর প্রতারণার আশ্রয় নিল। হিজরীর চতুর্থ বৎসরের সফর মাসে উদালীর সুদারী গোত্র[৯৩] ও আল কারা গোত্র মদীনায় এসে রাসূল (সা) এর কাছে তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়ার জন্য কিছু সংখ্যক সাথী পাঠানোর অনুরোধ করেন।

রাসূল (সা) তাঁর দশজন সাথী পাঠালেন।[৯৪] ইবনে ইসহাকের মতে তাদের সংখ্যা ছয়, মূসা ইবনে উকবার মতে তাদের সংখ্যা ছিল সাত, তিনি তাদের নামও উল্লেখ করেন। আসিম ইবনে সাবিত আকানাকে এদের *আমীর* নিযুক্ত করা হলো। তাঁরা উসফান ও মক্কার মাঝামাঝি একটি জায়গায় পৌছলে বানু লিহিয়ান গোত্রের ১০০ যোদ্ধা তাদেরকে আক্রমণ করে ঘেরাও করে ফেলে। প্রতিনিধি দলটি একটি উঁচু স্থানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। বেদুঈনরা তাদেরকে হত্যা করবে না এরূপ অঙ্গিকার করে। কিন্তু আসিম ইবনে সাবিত বলেন, "আমি কাফিরের নেতৃত্বে নিচে নেমে আসব না।" আসিম ও অন্য ছয়জন সদস্য শহীদ না হওয়া পর্যন্ত লড়ে গেলেন। এরপর তিনজন রয়ে গেলেন। বেদুঈনরা আবার তাদেরকে নিরাপত্তার গ্যারান্টির কথা বলে। তাদের কথায় সাহসী তিনজন বিশ্বাস করে তাদের আবেদন গ্রহণ করেন। কিন্তু তারা যখন নিচে নেমে এলেন তখন তাদেরকে সাথে সাথে বেঁধে ফেলা হলো। আব্দুল্লাহ ইবনে তারিখ বেদুঈনদেরকে বাধা দিলে বেদুঈনরা তাকেও হত্যা করলো। বেদুঈনরা অপর দু'জনকে মক্কায় নিয়ে কুরাইশদের কাছে বিক্রি করে দেয়। এ দু'জন ছিলেন খুবাইব ও যায়েদ।

খুবাইবকে বানু আল হারিস ইবনে আমীর ইবনে নওফল কিনে নিয়ে হত্যা করে আল হারিসের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে উদ্যত হয়। আল হারিসকে বদর যুদ্ধের সময় খুবাইব হত্যা করেছিলেন। খুবাইব বন্দীর ন্যায় কিছুক্ষণ তাদের সাথে থাকেন। তারা দ্বিধাহীন চিত্তে তাকে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এ অবস্থাতেই ছিলেন। খুবাইব তার গোপনাঙ্গের (Pubic Hair) কেশ পরিচ্ছন্ন করার নিমিত্তে আল হারিসের এক জনের কাছ থেকে একটি ক্ষুর নেন। তার ছোট্ট শিশুটি খুবাইবের উরুতে উঠে বসলো। আল হারিস সেদিকে কোন খেয়াল করেনি। সে ভীত হয়ে পড়লো যে খুবাইব তার প্রতিশোধ নেবার জন্য শিশুটিকে হত্যা করতে পারে। খুবাইব তার এ অবস্থা দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি মনে করছো না আমি তাকে হত্যা করে ফেলব? আল্লাহর কসম, আমি কখনো তা করবো না"। পরের দিকে আল হারিস মন্তব্য করেছিল, "খুবাইবের মতো এত ভাল আর কোন বন্দী পাইনি। একদিন আমি একটি আঙ্গুর গাছ থেকে তাকে আঙ্গুর পেড়ে খেতে দেখলাম। যদিও তখন মক্কায় কোন আঙ্গুরের সময় ছিল না। খুবাইব ছিল লোহার শিকল পরিহিত। এটা ছিল আসলে আল্লাহর তরফ থেকে তার জন্য প্রেরিত খাবার।" তাকে যখন মক্কার পবিত্র স্থান থেকে হত্যার জন্য নেয়া হলো তিনি তখন বললেন, "আমাকে *দু'রাকাত সালাত* পড়তে দাও।" এর পর তিনি

তাদেরকে বললেন , "আমি ভাবছিলাম, তোমরা ভাববে আমি দীর্ঘক্ষণ ধরে সালাত পড়ছিলাম মৃত্যুর ভয়ে। আসলে না, আমি মৃত্যুর ভয়ে তা করিনি।" খুবাইব সর্বপ্রথম কতল হওয়ার আগে দু'রাকাত নামায আদায়ের রেওয়াজ চালু করেছিলেন। এরপর খুবায়েব বললেন, "হে আল্লাহ এক এক করে তাদের গুণে রাখুন। আমি যেহেতু শহীদ হিসাবে মৃত্যু বরণ করতে যাচ্ছি কোন উপায়ে বা কিভাবে আমার মৃত্যু হচ্ছে তা নিয়ে আমি ভাবি না। এ মৃত্যুতো আল্লাহর জন্যই। আল্লাহ চাইলে আমার খন্ড খন্ড অংগ প্রত্যংগকেও আর্শীবাদ করতে পারেন।"এর পর তাকে হত্যা করা হলো।[৯৫]

যায়েদ ইবনে আল দিসান্নকে কিনে নিল সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া। সে তার পিতা উমাইয়া ইবনে খালাফের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার নিমিত্ত যায়েদকে হত্যা করতে চাইল। খালাফকে বদর যুদ্ধে হত্যা করা হয়েছিল। তাকে হত্যার পূর্বে আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করেছিল, "তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি যায়েদ, তুমি এটা মনে করো না যে মুহাম্মদ এ সময়ে আমাদের সাথে তোমার স্থানে আছে যাতে আমরা তার মস্তক কর্তন করে ফেলতে পারি, আর এটাও মনে করো না যে, তুমি এখন তোমার পরিবার পরিজনের সাথে আছ। যায়েদ তখন বললেন, "আল্লাহর কসম, আমি এখন যে স্থানে আছি মুহাম্মদ সে স্থানে আছেন আমি তা মনে করি না বা এটাও মনে করিনা যে একটি কাঁটাও তাকে আঘাত করতে পারে। আমি আমার পরিবারের সাথে বসে আছি আমি তাও মনে করি না।" আবু সুফিয়ান তার কথা শুনে বললো, "আমি এমন মানুষ আর দেখিনি যাকে মুহাম্মদ (সা) অন্যান্য সাহাবীর ন্যায় এত বেশী ভালবাসত।"[৯৬]

আল ওয়াকিদির ধারণা উদাল ও কারার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে হুদাইল এ পরিকল্পনাটি করেছিল।[৯৭] এ ঘটনাটি আল রাযীর ঘটনা নামে খ্যাত। এ ঘটনাটি একটি জলাধারের স্থানে সংঘঠিত হওয়ায় এর এরূপ নামকরণ হয়। আল রাযীর ঘটনার পরও মুসলমানগণ বেদুঈনদের কাছে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়ার লোক পাঠানোর কাজ করেন নি। মুসলিমগণ ধরে নিয়েছিলেন যে, যতবড় ঝুঁকিই হোক তারা ইসলামের দাওয়াত পৌছাবেনই।[৯৮]

"বর্শা'র খোলোয়াড় নামে" খ্যাত আবু বারা আমীর ইবনে মালিক মদীনায় এলে রাসূল (সা) তাকে ইসলাম কবুলের দাওয়াত দিলেন। তিনি তাঁর দাওয়াত কবুল না করলেও ইসলাম থেকে তেমন একটা দূরে ছিলেন না। তিনি নজদের বেদুঈনদের কাছে রাসূল (সা) প্রেরিতব্য একটি প্রতিনিধিদলকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেন। রাসূল (সা) হিজরীর চতুর্থ বৎসরের[৯৯] সফর মাসে আল মানাযির ইবনে আমর আল খারাজীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল নজদে পাঠালেন। তাঁর সাথে ছিলেন ৭০ জন *ক্বারী*। ইবনে ইসহাকের মতে তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪০ জন। যখন তাঁরা মদীনা থেকে ১৬০ কি মি দূরে নজদ-এর বীর মাওনায়[১০০] পৌছেন তখন তাদের দলের জন্য যাকে আমীর করে পাঠানো হয়েছিল সে আমীর ইবনে আল তুফায়েল বিশ্বাসঘাতকতা করে হারাম ইবনে মিলহানকে হত্যা করল। আমীরের নির্দেশে এক ব্যক্তি তাঁকে পেছন থেকে ছুরি মেরে দিল। হামরা চিৎকার দিয়ে উঠলেন, "কাবার প্রভুর হুকুমে আমি জিতেছি।"

রীল এবং যাকওয়ানের বেদুঈনরা তাদেরকে ঘিরে ফেলল, *ক্বারীগণ* শহীদ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিরোধ করেন। এর মধ্যে কেবল আমীর ইবনে উমাইয়া আল দামারীই বাদ রয়ে গেলেন। তিনি সবার পেছনে ছিলেন। তিনি ফিরে এসে রাসূল (সা) কে খবর দিলেন। রাসূল (সা) মাসখানেক ধরে *তাহাজ্জুদের* সালাতের সময় রীল ও ধাকওয়ানের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে আবেদন জানান। এটাই হলো কুনুত জারীর শুরু। ৭০ *কারী* ছিলেন শ্রেষ্ঠ মুসলমানদের অন্যতম। তারা দিনের বেলায় কাঠ কুড়িয়ে এর থেকে বিক্রয় লব্ধ অর্থ আহল আল[১০১] সুফ্ফাকে দান করেন। তারাও রাতের বেলায় একত্রে কুরআন তেলাওয়াত করতেন।

মুসলমানগণ এভাবে হিজরীর চতুর্থ বৎসরের সফর মাসে শ্রেষ্ঠ ৮০ জন দাঈকে হারালেন। বেদুঈনদের মরুদেশে ইসলামের দাওয়াত পৌছানো নিরাপদ বা সহজ কোনটাই ছিল না। ধর্ম প্রচার বিষয়টি ছিল জীবন মৃত্যুর ভয়ের ব্যাপার। কিন্তু কোন কিছুই তাদেরকে আল্লাহর দাওয়াত পৌছানো থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি।

মুসলমানদের জন্য বিকল্প কোন পথ খোলা রইল না। সুতরাং তারা বিশ্বাসঘাতক বেদুঈনদেরকে একটি শিক্ষা দেয়ার মনস্থ করলেন। রাসূল (সা) বানু লিহিয়ানের (যে আল রাযীতে *কারীদের* কে হত্যা করেছিল) বিরুদ্ধে একটি সেনাবাহিনী পাঠালেন। হিজরীর চতুর্থ বৎসরের জমাদিউল আউয়াল মাসে এ আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। আল মাদানীর রিপোর্ট থেকে এটা জানা যায়।[১০২]

ইবনে ইসহাকের মতে হিজরীর ষষ্ঠ বৎসরে এ ঘটনা ঘটে।[১০৩] তবে এ বিষয়টি দু'টো ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকতে পারে।

বদর আল মাবিদের অভিযান

হিজরীর চতুর্থ বৎসরের যিলকদ মাসে রাসূল (সা) ১,৫০০ সাথী, দশ অশ্বারোহীসহ এ অভিযানে বেরিয়ে পড়েন। আলী ইবনে আবু তালিব ছিলেন পতাকাবাহী। ওহুদ যুদ্ধের কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের সাথে নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী মুসলমানগণ অপেক্ষা করতে থাকে। কুরাইশদের আগমনের জন্য মুসলমানগণ বদর ময়দানে আটদিন ধরে অপেক্ষা করতে থাকে। আবু সুফিয়ান ইতোমধ্যে ২০০০ পদাতিক ও ৫০ অশ্বারোহী নিয়ে হাযির হলো। কিন্তু তারা মক্কা থেকে ৪০ মাইল দূরে মার আল জাহরানে উপস্থিত হয়। ঐ বৎসরটিতে খরা ছিল এ অজুহাতে তারা আবার ফিরে যায়। কথা অনুযায়ী চুক্তি ভংগের কারণে মুসলমানদের অবস্থান মযবুত হয় এবং তাদের মর্যাদাও বেড়ে যায়।[১০৪]

বেদুঈনদের একটা শিক্ষা দেয়ার জন্য মুসলমানগণ হিযাজ ও নজদ-এ অনেকগুলো অভিযান পরিচালনা করেন। এভাবে আবু ওবায়দা তায়-এ আসাদ নজদ-এ অভিযান পরিচালনা করেন। তবে এসব অভিযানের খবর পেয়ে বেদুঈনরা যুদ্ধ না করেই বিভিন্ন পাহাড়ে বিচ্ছিন্নভাবে পালিয়ে যায়।[১০৫]

হিজরীর পঞ্চম বৎসরের রবিউল আউয়াল মাসে রাসূল (সা) এক সহস্র যোদ্ধা নিয়ে দুমা আল জানদালে এক অভিযান পরিচালনা করেন। রাসূল (সা) কিছু সংখ্যক *মুশরিকের* এখানে সমবেত হওয়ার খবর পান। *মুশরিকরা* তাঁর অভিযানের খবর পেয়ে ছত্রভংগ হয়ে যায়। মুসলমানগণ সে এলাকায় কিছুদিন অবস্থান করেন এবং বিজয় অভিযান পরিচালনা করেন কিন্তু কোন যুদ্ধ সংগঠিত হয়নি। পথিমধ্যে মুসলমানগণ উয়ায়না ইবনে হুসন্ আল ফিরাজীর সাথে শান্তিচুক্তি করে মদীনায় ফিরে আসেন।[১০৬]

পাদটীকা

০১. ওহুদ যুদ্ধের বর্ণনাটি সনদসহকারে খলিফা ইবনে খায়য়াত কর্তৃক কিছু *মাযুল* বর্ণনা কারীদের দ্বারা বিধৃত হয়, আল যুহরী এবং ইয়াযিদ ইবনে রূমান হতে (আল খলিফা, *তারিখ* ৯৭); এবং সনদ সহকারে তাবারী, এর মধ্যে রয়েছে হুসায়েন ইবনে আবদুল্লাহ আল হাশিমী, এটি যঈফ ইকরিমা হতে (আল তাবারী, *তফসীর*, ৭/৩৯৯)। এ বিষয়ের বর্ণনাটি এর দুর্বলতাগুলো সত্ত্বেও শক্তিশালী।

০২. ইবনে হিশাম, *আল সীরাহ*, ৩/১। ইবনে ইসহাকের শাইখে রয়েছে এমন সব বর্ণনাকারী যেগুলো *সিকাহ* আর যেগুলো *যয়িফ*; তিনি কোন ভেদাভেদ না করে তাদের রিপোর্টগুলো সংগ্রহ করেন। কোন কোন বর্ণনাকারী অপেক্ষাকৃত কম তাবিয়ুন এবং তাদের রিপোর্টগুলো মুরসাল ও *যয়িফ*, তবে এ জাতীয় রিপোর্ট সচরাচর গৃহীত হয়ে থাকে।

০৩. আল ওয়াকিদী, মুহাম্মদ ইবনে উমর, *আল মাগাযী*, ১/২০০

০৪. ইবনে হিশাম, *আল সীরাহ*, ৩/৬, সনদ ব্যতীত। আল ওয়াকিদী ঃ আল মাগাযী, ১৫৮, আল ওয়াকিদী হলো *যয়িফ*।

০৫. ইবনে হিশাম, আল সীরাহ, ৩/৮-১২, সনদ ছাড়া ইবনে ইসহাকের বর্ণনা হতে আল তাবারী *তারিখ*, ৩/৫০৪। আল ওয়াকিদীর রিপোর্ট হতে এ ব্যাপারে কোন সহীহ বর্ণনা নেই। এগুলো আখবারিয়্যা-এর বর্ণনা, যারা এরূপ বিবরণের সাথে সংশ্লিষ্ট।

০৬. আল তাবারী তারিখে, ৩/৫০৪, ওয়াকিদীর বিবরণ হতে গৃহীত।

০৭. ইবনে ইসহাক *সনদ* ব্যতীত, ইবনে হিশাম *সীরাহ*, ৩/৪; আয় ওয়াকিদী, আল মাগাযী, ১/১০১।

০৮. আল বুখারী কতৃক বর্ণিত (*ফতহুর বারী*, ৭/২৭৪)।

০৯. আহমদ কর্তৃক বর্ণিত (*ফাতহুর রাব্বানী*, ২১/৫০; আল সা'তী বলেন যে এর সনদটি সহীহ)। *ফাতহুর রাব্বানীর* আরও বর্ণনা দেখুন ২১/৫। ইবনে সাঈদ, আল তাবাকাত আল কুবরা, ২/৪৫, উভয়টিই ঐসব লোকদের *সনদ* সহকারে বর্ণিত যে, তারা *সিকাহ*, আবু আল যুবায়ের এর *আনানাহ* সহ যাকে মুয়াল্লিম বলা হয়।

১০. প্রাগুক্ত।

১১. আবদুর রয্যাক ইবনে হাম্মাম আল সানানী : আল মুহাম্মদ, ৫/৩৬৩।

১২. আল তাবারী *আল তাফসীর*, ৭/৩৭২, হাসান সনদ সহকারে, কাতাদা'র সাথে সংশ্লিষ্ট এবং এটি *মুরসাল*। আবু আল জুবারের হতে যবীর হয়ে ইমাম আহমেদ এটির কাজ শেষ করেন। কিন্তু এটি আবু জুবায়েরের *আনানাহ* সংযুক্ত যা মুদাল্লিম। ইবনে আব্বাস হতে *হাসান সনদ* এর মাধ্যমে আল বায়হাকীর বর্ণনাটিকে শক্তিশালী করা হয়েছে। হাদীস সহীহ হবে যখন সবগুলো সূত্রই সুশৃংখলভাবে শ্রেণীবদ্ধ। আলবানীর *ফিকাহ আল সীরাহয়*ওএটি বর্ণিত মতামত।

১৩. খলিফা ইবনে খায়য়াত। *আল তারিখ*, ৬৭ সা'দ ইবনে আল মুসায়্যাব-এর মুরসাল হাসান *সনদ* সহকারে বর্ণিত, তার মুরসাল হাদীসগুলো শক্তিশালী।

১৪. আলি ওয়াকিদী, *আল মাগাযী*, ১/৩৩। আরও দেখুন ইবনে আবদ আল বারর, *আল ইসতিয়াব*, ৩/৪৫০। পতাকার ব্যাপারে কোন *সহীহ* বর্ণনা নেই।

১৫. আল তাবারী, *তারিখ*, ৩/৫০৮। ইবনে সা'দ *আল তাবাকাত*, ৩/৪৪

১৬. আল হাকীম *আল মুসতাদরাক*, ৩/২৫, আল জাহাবী তার সাথে একমত যে বিবরণটি *সহীহ*।

১৭. এলাকাটি এখন *মালাব আল তালীম* নামে খ্যাত পূর্বে এখানে ঘোড় দৌড় হতো। আল আয়শি; *আল মদীনা বায়না আল মাদী ওয়া আল হাদীর*, ৩৬৯; এবং বিল্লাফী, মাযুম আল মা'লিম আল *যুগরাফিয়াহ ফি আল সীরাহ আল নবাবিয়্যাহ*, পৃ: ১৭০

১৮. ইবনে ইসহাক (*সীরাহ* ইবনে হিশাম, ৩/৮-১২, সনদ ছাড়া)

১৯. সহীহ আল বুখারী, (ফাতহুর বারী, ৬/১৬২)

২০. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ৯/৩

২১. *সহীহ আল বুখারী*, ইবনে হাজার, *ফতহাল বারী*, ৭/৩৫৭; ৮/৩২৫; মুসলিম, *সহীহ*, ২/৪০২; ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ৩/৬৭।

২২. ইবনে ইসহাক *সীরাহ ইবনে হিশাম*, ৩/১১; আল ওয়াকিদী, মাগাযী, ১/১০৯; ইবনে হাজম *জাওয়ামী আল সীরাহ*, ১৫৯, এব্যাপারে কোন *সহীহ* বর্ণনা পাওয়া যায়নি। হাদীসের প্রেক্ষাপটে কোন বর্ণনাকে *সহীহ* বলা বড় পার্থক্যের ব্যাপার।

২৩. *উয়ুন আল আসার* ১২/৭।

২৪. আল বুখারীর বর্ণনা। ইবনে হাজার *ফাতহুর বারী*, ৫/২৭৩, এবং মুসলিম, *আল সহীহ*, ২/২২৪

২৫. আল বুখারী, *আল সহীহ* (*ফাতহুর বারী*, ৬/১৬২)।

২৬. আল তাবারী *সহীহ* সনদ সহকারে, তবে আল সিদ্দির একটি মুরসাল হাদীস, *তফসীর* ৭/২৮১।

২৭. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ৩/১৩; আল ওয়া কিদী, *আল মাগাযী*, ১/২২৩, অসিম ইবনে উমর ইবনে কাতাদাহ, তিনি *সনদ সংযুক্ত* করেন নি।

২৮. সহীহ মুসলিম, ২/২৮৪।

২৯. আল বুখারী কর্তৃক বর্ণিত (ইবনে হাজার *ফাতহুর বারী*, ৭/৩৭৫। ওয়াশী হতে প্রাপ্ত হাদীস।

৩০. আল বুখারীর বর্ণনা হতে, ইবনে হাজার *ফাতহুর বারী*, ৭/৩৭৫। *ইযখীর* এক প্রকার ঘাস, এটি তার ঘ্রাণের জন্য বিখ্যাত; এটি শুকালে সাদা হয়ে যায়। *আল মিসবাহ*, ১/২৪৫।

৩১. খলিফা, *তারিখ* ৬৭, সা'দ ইবনুল মুসাইয়্যাব এর মুরসাল হতে যার মুরসাল শক্তিশালী।

৩২. আল বুখারীর একটি বর্ণনা হতে (ইবনে হাজার, ফাতহুর বারী, ৬/১৬২)।

৩৩. ইবনে কাসির আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া, ৪/২৮।

৩৪. আল হাদীস, আল মুসতাদরাক, ৩/২০২, মুসলিম এর শর্তানুসারে বিবরণটি *সহীহ*, যদিও এটি বর্ণনাকৃত নয়; আল জাহাবী তাঁর সাথে একমত, আহমাদ, *আল মুসনাদ*, ৪/২৬০৯, শাকির সংস্করণ।

৩৫. ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৭/৩৬১, আল বুখারীর একটি বর্ণনা হতে।

৩৬. মুসলমানদের যুদ্ধক্ষেত্রের পার্শ্বে বসার ব্যাপারে বর্ণিত। ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ৩/৩৩; আল তারাবী, *তফসীর*, ৭/২৫৭।

৩৭. ইবন আল মুবারক, আবদুল্লাহ, *কিতাব আল জিহাদ*, ৬৩; আল বুখারী, (ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৬/২১, ৭/২৭৪, ৮/৫১৭)। সাবাব আল *নুযুলের* জন্য মুসাব সম্পর্কে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। আরও দেখুন, আল হাদীস, আলমুসতাদরাক, ৩/২০০। তিনি সনদ অনুসারে হাদীসটিকে *সহীহ* বলেছেন, যদিও আল বুখারী ও মুসলিম এটি বর্ণনা করেন নি। আল যাহাবী তার সাথে একমত।

৩৮. ইবনে ইসহাকের একটি বর্ণনা হতে যার সনদে বর্ণিত লোকজন *সিয়াক* পর্যায়ের (*কেমাজমা আল বাহরাইন*, ২/২৩৯; *শারহ আল মাওয়াহিব*, ২/৪৪)।

৩৯. ইবনে আল জওযী, *জাদ আল মাসির ফি ইলম আল তাফসীর*, ১/৪৮৩।

৪০. আল হাকীম, *আল মুসতাদরাক*, ৩/২০১, তিনি বলেন, এটি *সহীহ সনদের* হাদীস। যদিও আল বুখারী ও আল মুসলিম এটির বর্ণনা করেন নি," আল যাহাবী এর সাথে একমত।

৪১. আল তাবারী, *তফসীর*, ৭/৩০১-২।

৪২. সহীহ মুসলিম ফী শারহ আল নাবাবী, ১২/১৪৬।

৪৩. আল বুখারীর একটি বর্ণনা হতে, ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৭/৩৫৯।

৪৪. প্রাগুক্ত, ৭/৩৫৮।

৪৫. প্রাগুক্ত, ৭/৩৬১।

৪৬. আহমদ কর্তৃক বর্ণিত (ফতহ আল রাব্বানী, ২২/৫৮৯), সীকাহ গুণাবলীর মানুষের *সনদ* সহকারে।

৪৭. সহীহ মুসলিম, ২/১৪৯; ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ৩/২৯; আল বুখারী, *মুয়াল্লাক ইবনে হাজার ফাতহুর বারী*, ৭/৩৬৫।

৪৮. সহীহ মুসলিম, ২/১৪৯।

৪৯. ইবনে ইসহাক আসিম ইবনে উমর ইবনে কাতাদাহ-এর মুরসাল হাদীস হতে। বর্ণনাটি কোন *সহীহ সনদ* দ্বারা প্রমাণিত নয়। তবে সহীহ *সনদ* বা *মুরসাল সনদ* ছাড়াই সীরাত গ্রন্থাবলীতে এটি বেশ পরিচিত (ইবনে হিশাম, সীরাহ, ৩/৩৩; আল ওয়াকিদি, আল মাগাযী, ১/২৪২; *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*।

৫০. *সহীহ আল বুখারী*, (*আল ফাতহ*, ৭/৩৫৪); সহীহ মুসলিম, ২/১৫৪, এ অচেনা লোকটি উমায়ের ইবনে আল হাসান ছাড়া অন্য কেউ, তিনি বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন।

৫১. আল হাদীস, আল মুসতাদরাক, ৩/১৯৯; সা'দ ইবনে আল মুসাইয়াব-এর *মারাসিল* হতে। আলহাকীম বলেন, "এটি *মুরসাল* হলেও দু'শায়েখের শর্তানুসারে (*আল বুখারী ও মুসলিম*) *সহীহ।*" আল যাহাবী বলেন যে, এটি *মুরসাল সহীহ*। আমার মতে সাইয়েদ ইবনে আল মুসাইয়াব বর্ণিত *মুরসাল হাদীস সহীহ*।

৫২. ইবনে আল মুবারক, *কিতাব আল জিহাদ*, ৬৯, ইকরিমাহ ও ইবনে ইসহাকের *মুরসাল* হাদীস হতে, তার পিতা ও বানু সালামাহ গোত্রের দু' শায়েখের কাছ থেকেও এটি মুরসাল (ইবনে হিশাম; *সীরাহ*, ৩/৪৪)। ভিন্ন ভিন্ন সনদ হওয়ার কারণে একটির দ্বারা আরেকটি শক্তিশালী হয়।

৫৩. আল হাকীম, আল মুসতাদরাক, ৩/২০৪, তিনি বলেন, "মুসলিম শর্তানুসারে এটি সহীহ।" মুসলিম এটিকে, ইবনে ইসহাক হতে বর্ণনা করেন। তিনি এটিকে শুধুমাত্র আল মতাবাত-এ অন্তর্ভুক্ত করেন (সমর্থন কারী বর্ণনা)। ইবনে আসাকীরেরও এরূপ আরেকটি আছে; তিনি বলেন, "এটি হাসান সহীহ বর্ণনা (আল আহাদীস আল সহীহা, ৪/৩৬, নং ৩২৬)।

৫৪. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ২/১৫২, ১৪৮। মুখায়রিক যে ইসলাম কবুল করেছিল এব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস নেই, তবে ইবনে ইসহাক ও আল ওয়াকিদী তাঁর কার্যকলাপকে কোন সনদ ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। ইবনে হাজার তাঁর জীবনী *সাহাবীদের* মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছিলেন এ ঘটনা থেকে বিষয়টিকে সমর্থন করা হয়। (*আল ইসাবাহ*, ৬/৫৭ মুখায়রিকের এ সনদ হতে, দেখুন, ইবনে সা'দ, *আল তাবাকাত*, ১/৫০১; এবং *তুরকাত আল নবী*, ৭৮)

৫৫. ইবনে হিশাম, সীরাহ, ৩/৪০; আল হাদীস, *আল মুসতাদরাক*, ৩/২০২। তিনি বলেন, মুসলিম অনুসারে এটি সহীহ হাদীস, যদিও তারা এটি বর্ণনা করেন নি।" আল সাহাবী তার সাথে একমত।

৫৬. আবু দাউদ, সুনান, ২/১৯; আল হাদীস আল মুসতাদরাক, ৩/২৮।

৫৭. ইবনে ইসহাক তাঁকে কুজমান নাম দেন, আলওয়াকিদী তার সাথে একমত হন (ইবনে হিশাম, সীরাহ, ৩/৪; আল ওয়াকিদী, মাগাযী, ১/২৬৩)

৫৮. আল হায়সামী, *আল মাকাসিদ আল আলী*, ১/সেকশন ৮০ পৃষ্ঠা আবু ইয়ালালার একটি বর্ণনা হতে। আল হায়সামী বলেন, "তার বর্ণনা কারীগণ *সহীহ*।"

৫৯. ইবনে হিশাম, *আল সীরাহ*, ৩/৩২. *মুনকাতি সনদসহ;* আল ওয়াকিদী, *আল মাগাযী*, ১/২৬৮, সূত্র হিসাবে তিনি খুবই দুর্বল।

৬০. আল হায়সামী, *মাজমা আল জাওয়াইদ*, ৯/২৯২, আল হায়সামী বলেন, "আল তারাবানী এটির বর্ণনা করেন এবং এর সনদ হাসান"।

৬১. ইবনে হাজার *ফাতহুর বারী*, ৭/৩৬৬।

৬২. *ফাতহুর বারী*, ৬/৭৪; আল নাবাবী *সীরাহ সহীহ মুসলিম* ১২/১৮৯

৬৩. আলবুখারী কর্তৃক বর্ণিত (*ফাতহুর বারী* , ৭/৩৫৮;১০/২৮২; এবং মুসলিম, *সহীহ*, ২/৩২১।

৬৪. ইবনে কাসির *তফসীর* (*ফতহুর বারী*, ৭/৩৬৫)

৬৫. তাবারী, *তফসীর*, ৭/৩২৩; ইবনে কাশির , *তফসীর*, ৭/২৩৭;

৬৬. ইবনে কাসির, *তফসীর*, ১/৪১৮।

৬৭. আল বুখারীর বর্ণনা (*ফাতহুর বারী*, ৭/৩৪৯)।

৬৮. আহমদ *আল মুসনাদ*, ৪/২০৯, ৬/১৮১, হাসান সনদযুক্ত।

৬৯. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ৩/৪৯; আল ওয়াকিদী, মাগাযী, ১/২৯৭

৭০. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ৩/৪৯; আল তাবারী, *তফসীর*, ৭/৩১৯

৭১. আল ওয়াহিদী আল মাগাযী, ১/২৯৮।

৭২. ইবনে ইসহাক তাদের ৬৫ এর নাম বর্ণনা করেন এবং ইবনে হিশাম আরও ৫ জনের নাম অন্তর্ভুক্ত করেন (ইবনে হিশাম *সহীহ*, ৩/১০২)। ইবনে ইসহাক অন্য যেসব শহীদের নাম বর্ণনা করেননি সেগুলো *সীরাহ* গ্রন্থ ও সাহাবীগণের জীবনমূলক অভিধানে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে ইসহাকের তালিকায় ওহুদ যুদ্ধে যাদের নাম শহীদ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে তারা যে সবাই শহীদ হয়েছিলেন তা প্রমাণিত নয়। এখানে শহীদদের সংখ্যা ছিল ৭৪ (আল মাগাযী, ১/৩০০)। আনাস ও আল বারাহ হতে সহীহ *আল বুখারী'র* বর্ণনা শহীদদের সংখ্যা ৭০ (*ফাতহুর বারী*, ৭/৩৪৯, ৩৭৪)।

৭৩. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ৩/১০৬। আল ওয়াকিদী বলেন, ২৭ জন নিহত হয় (*আল মাগাযী*, ১/৩০৭), ইবনে সা'দ বলেন ২৩ (*আল তাবাকাত*, ২/৪২)

৭৪. ইবনে হিশাম, *সীরাহ* ৩/৬৩; ইবনে কাসির, *সীরাহ*, ৩/১০৪, এ বর্ণনাটির ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস নেই।

৭৫. আল বুখারী (*ফাতহুর বারী*, ৩/২০৯; ৭/৩৭৪)।

৭৬. ইবনে ইসহাক, সীরাহ *ইবনে হিশাম*, ৩/৫২ আহদ, আল মুসনাদ, ৬/১৯১; আবু দাউদ *আল সুনান*, ৩/১৯৬; *আল মারাসিল*, ৪৬।

৭৭. আল তিরমিযী, *সুনান*। (আল আহওয়াযী, তুহফাহ, ৫/৩৭১)। তিনি বলেন "এটি একটি *হাসান সহীহ হাদীস*।" ইবনে হিশাম, সীরাহ, ৩/৫৪-৫।

৭৮. আবু দাউদ, *সুনান*, ৩/২০২ , আল তিরমিযী (আল আহওয়াযী, *তুহফাহ*, ৫/২৭৯)। (আল তিরমিযী বলেন, "এটি *হাসান সহীহ হাদীস*" আহমদ, *আল মুসনাদ*, *সহীহ ইসনাদ* সহ *আল ফাতহুর রাব্বানী*; ৮/১৮৯)।

৭৯. আল হাদীস, *আল মুসতাদরাক*, ৩/২৩।

৮০. আহমাদ আল মুসনাদ (আল ফাতহুর রাব্বানী, ২১/৫৮, হাসান সনদ সহ)।

৮১. আল হাদীস, *আল মুসতাদরাক*, ৩/২৪, তিনি বলেন, "আল বুখারীর শর্ত অনুযায়ী এটি *সহীহ* হাদীস। যদিও তাদের দ্বারা এটা বর্ণনাকৃত নয়। আল যাহাবী তাঁর সাথে একমত। আল হায়সামী। *মাজমা আল জাওয়াইদ*, ৬/১২৩। তিনি বলেন, "আল তাবারানী এটি বর্ণনা করেন। বর্ণনা কারীগণ *সহীহ*।"

৮২. ইবনে ইসহাক তাঁর বাবার কাছ থেকে নেয়া সনদ সহ এবং বানু সালামা'র মাজহুল শায়খ হতে। ইবনে মাজাহ, সুনান, ১/৫০৭; এর সনদে আছে আবদুল্লাহ ইবনে উমরী যাকে দুর্বল বলে মনে করা হয়।

৮৩. ইবনে ইসহাক (*সীরাহ ইবনে হিশাম*, ৩/৫৭১), আবদ আল ওয়াহিদ ইবনে আবু আওন আল মাদানী সহকারে সনদযুক্ত, তিনি একজন মাদুক, তবে তিনি ভুল করেন।

৮৪. মুসলিম *আল সহীহ*, ৩/৩৮৫।

৮৫. আহমদ, *আল মুসনাদ*, ৭/৯৮, ইবনে খায়ের বলেন, "মুসলিমের শর্তানুসারে।" আহমদ শাকীর বলেন, "এর সনদ সহীহ।" আল হাকীম, *আল মুসতাদরাক*, ১/৩৮১; তিনি বলেন, "মুসলিমের শর্তানুসারে এটি সহীহ" এবং আল যাহাবী তার সাথে একমত। ইবনে সা'দ, আল তাবাকাত, ৩/১৬।

৮৬. আহমাদ, *আল মুসনাদ*, ৪/১২৩; আবু দাউদ, আল সুনান, ৩/১৫; আল হাদীস, *আল মুসতাদরাক*, ৩/৮৮, তিনি বলেন, "মুসল্লিদের শর্তানুসারে এটি সহীহ," এবং আল জাহাবী তার সাথে একমত।

৮৭. আল শওকানী, *ফাতহ আল কাদির*, ১/৩৯৯।

৮৮. এটি মক্কার পথে মদীনা হতে আট মাইল দূরে অবস্থিত (ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ২/১০২; *মুজাম মা, ইস্তাজাম লী আল কুবরা*, ২/৪৬৮; *মুজাম আল বুলদান*, ইয়াকুত, ২/৩০১)। আল বালাদী বলেন, "এটি মদীনা হতে ২০ কি.মি. দক্ষিণে (মুজাম *আল মালিম আল জুগরাফিয়্যা*, ১০৫)।

৮৯. আল বুখারীর একটি বর্ণনা হতে (*ফাতহুর বারী*, ৭/৩৭৩)।

৯০. ইবনে মা'দ, *আল তাবাকাত*, ২/৫০; ইবনে আল কাইয়্যিম, *জা'দ আল সা'দ*, ২/১২১।

৯১. ইবনে সা'দ *আল তাবাকাত*, ২/৫০

৯২. আহমদ, *আল মুসনাদ*, ৩/৪৯৬, *হাসান সনদসহ* এবং ইবনে ইসহাক স্পষ্টভাবে সনদসহকারে *আল সামাহ* বর্ণনা করেন।

আবু দাউদ, আল সুনান, ১/২৮৭ ইবনে হাজার বলেন," এর সনদ হাসান" (*ফাতহ আল রাব্বানী*, ২/৪৩৭)।

৯৩. ইবনে হাজম বলেন, "সফর মাসে অর্ধপথ" (*জাওয়ামী আল সীরাহ*, ১৭৬)

৯৪. সহীহ আল বুখারী, ৫/৪০।

৯৫. সহীহ আল বুখারী, ৫/৪০-১ (ইস্তাম্বুল সংস্করণ)। আহমাদ আল *মুসনাদ*, ২/৩১০-১; ইবনে হিশাম, *সীরাহ* ৩/১৬৫-৭; আসিম ইবনে আমর ইবনে কাতাদা'র *মুরসাল* বর্ণনা হতে।

৯৬. ইবনে ইসহাকের তার শায়খ আসিম ইবনে আমর ইবনে কাতাদাহ'র *মুরসাল* হাদীস হতে বর্ণিত; তিনি স্পষ্ট করে বলেন যে, তিনি এটি তাঁর কাছ থেকে শুনেছেন, তবে এটি *মুরসাল* (ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ৩/১৬০)।

৯৭. ইবনে সা'দ *আল তাবাকাত আল কুবরা*, ২/৫০।

৯৮. ইবনে ইসহাক আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাযাম'র বর্ণনা *মুরসাল* হতে এবং আল মুগিরা ইবনে আবদ্ আল রহমান আল মাখজুমী, তারা উভয়েই *সিকাহ* (খলিফা ইবনে খাইয়্যাত, *তারিখ*, ৭৬ এবং ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ২/১৭৪। মুসা ইবনে উকবা এটি আবদ আল রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালিক এর *মুরসাল* রেওয়াত হতে বর্ণিত; আল তাবারী এটি কা'ব ইবনে মালিক এর একটি হাদীস হতে বর্ণনা করেন (*তারিখ আল উমাম ওয়া আল মুলক*, ২/৩০-১)।

৯৯. ইবনে হাযাম সফর মাস শেষ হওয়ার কুড়ি দিন পূর্বে বীর মাওনা'র তারিখের বিষয়ে উল্লেখ করেন (*জাওয়ামী আল সীরাহ*, ১৮০)। তিনি আল রাজী'র পূর্বের তারিখের কথা বলেন, এর কারণ তাঁর মতে আর রাযী সংগঠিত হয় সফর মাসের মাঝামাঝি সময়ে যদিও তিনি বীর মাওনা'র পূর্বে আল রাযীকে স্থান দেন। ইবনে ইসহাকের অনুসরণে এটি করা হয়। চল্লিশ

১০০. ইয়াকুত, *মুজান আল বুলদান*, ৫/১৫৯, তবে তিনি দূরত্বটির কথা চার *মারহালার* কথা বলেন, এক মারহালা চল্লিশ কি.মি. এর সমান।

১০১. সহীহ আল বুখারী, ৫/৪১-৪; আনাস ইবনে মালিক হতে এ সংখ্যার হাদীসের বর্ণনা পাওয়া যায়। ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৭/৩৮৬-৭

১০২. খলিফা ইবনে খাইয়াত, *তারিখ*, ৭৭, আলী ইবনে মুহাম্মদ আল মাদানী'র বর্ণনা হতে বর্ণনা।

১০৩. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ৩/৩২১; ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৪/৮১

১০৪. ইবনে সা'দ *আল তাবাকাত আল কুবরা*, ২/৫৯; ইবনে *আল কাইয়্যিম, জাদ আল মা'দ*, ২/১২০; ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৪/৮৭।

১০৫. খলিফা ইবনে আল খাইয়াত, *তারিখ*, ৭৭-৮, সনদ ছাড়া আল মাদানীর একটি বর্ণনা হতে। এটি পঞ্চম বৎসরের ঘটনাগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

১০৬. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ২/২১৩। ইবনে ইসহাক বলেন, রাসূল (সা) দুমা'য় পৌছেননি। ইবনে আল কাইয়্যিম, *জাদ আল মা'দ*, ২/১২৫।

অধ্যায় ৬

বানু মুস্তালিকের অভিযান (আল মুরাইসি)

বানু মুস্তালিক ছিল খুজা'র ইয়ামিনি[১] আজাদী গোত্রের একটি অংশ। মক্কা-মদীনা যাওয়ার পথে কাদিদ[২] ও আসাফান[৩]-এ তারা বাস করতো। মক্কা থেকে কাদিদ ১২০ কি মি এবং আসাফান ৮০ কি মি দূরে। দু'টো স্থানের ভেতরকার দূরত্ব ৪০ কি মি। মক্কা-মদীনা আর মার আল-জাহরান এর মধ্যে চলে যাওয়া রাস্তা অবদি খুজাই ভূ-খন্ড প্রলম্বিত। মক্কা আর আল-আবওয়া (মাস্তুরার তিন কি মি পূর্বে)[৪] হতে ৩০ কি মি, এটি আবার মক্কা[৫] হতে ২৪০ কি মি দূরে অবস্থিত। সে হিসাবে বানু মুস্তালিকের অবস্থান ছিল খুজাই এর কেন্দ্রস্থলে। মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদের সময় তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। মুসলমানদের প্রতি খুজা'র শান্তিপূর্ণ মনোভাব ছিল সবার জানা ঘটনা। *আনসারদের* সাথে তাদের আত্মীয়তার বন্ধনের ফলে উভয়ের সম্পর্ক আরও জোরদার হয়।[৬] এরপরও খুজা ও কুরাইশদের মধ্যে একটি মিত্রতার বন্ধন ছিল। এর কারণ ছিল সিরিয়ার দিকের বাণিজ্য পথ। খুজারা বহুঈশ্বরবাদী ছিল। কাদিদে মানাত নামের একটি প্রতিমা তাদের এলাকায় পাওয়া যায়। প্রতিমাটি মুশাল্লাল নামের একটি পাহাড়ে নির্মিত হয়। তাদের ভূ-খন্ডটি মদীনার চেয়ে মক্কার বেশী কাছে ছিল।

এ কারণগুলোর জন্য খুজাআ বিশেষ করে বানু আল মুস্তালিকের মধ্যে ইসলামের প্রচারে বাধার সৃষ্টি হয়। বাণিজ্য পথের উপর আধিপত্য থাকার পরও মানাত আল তাগিয়া প্রতিমাটি তাদের এলাকায় থাকার কারণে তারা আধ্যাত্মিকভাবে ও বস্তুগতভাবে লাভবান হয়েছিল। আরবরা এই প্রতিমার পূজা করতো।

ওহুদের[৭] যুদ্ধে কুরাইশদের সাথে আহাবিশে যোগ দেয়ার পরই ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের আগ্রাসী ভাবটি প্রকাশিত হয়।

ওহুদ যুদ্ধের কারণে মদীনার অন্যান্য গোত্রের ন্যায় বানু আল মুস্তালিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাহসী হয়ে উঠে। বানু আল মুস্তালিকের ওহুদ ভূমিকার জন্য এ গোত্রটি ভয়ে ছিল যে, মুসলমানগণ তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে। তারা চেয়েছিল কুরাইশদের জন্য বাণিজ্য পথটি খোলা থাক, এটা যেন কোন অবস্থাতেই বন্ধ না হয়। বাণিজ্য পথের ব্যাপারে এ গোত্রের আসলেই বড় ধরনের স্বার্থ জড়িত ছিল। তারা আল হারিস ইবনে আবু যার এর নেতৃত্বে অস্ত্র-শস্ত্র ও জনবল সংগ্রহ করে প্রতিবেশী গোত্রগুলোকে সাথে নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

রাসূল (সা) তাদের অবস্থা দেখে আসার জন্য বারিদা ইবনে আল হুসাইব আল আসলামীকে পাঠালেন। বারিদা তাদেরকে সাহায্য করতে এসেছেন এরূপ ভান করেন।

এভাবে তিনি জানতে পারেন যে, তারা মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি ফিরে এসে রাসূল (সা) কে তাদের ষড়যন্ত্রের কথা বলেন।[৮]

হিজরীর পঞ্চম বৎসরের শাবান মাসের দ্বিতীয় দিন সোমবার রাসূল (সা) তাঁর বাহিনী নিয়ে বানু আল মুস্তালিকের ভূ-খন্ডের দিকে মদীনা হতে রওয়ানা হলেন। এটি একটি *সহীহ* বর্ণনা। মূসা ইবনে উকবা এটি আল যুহরী ও উরওয়া হতে বর্ণনা করেন।[৯] আব মাশার আল সিন্দি, আল ওয়াকিদি ও ইবনে সা'দ কে[১০] ইবনে আল কাইয়্যিম ও আল জাহাবির[১১] ন্যায় মূসা ইবনে উকবাও একই ভাবে অনুসরণ করেন। ইবনে ইসহাকের মতে ষষ্ঠ হিজরীর শাবানে এ ঘটনা সংঘঠিত হয়। তবে আল বুখারী ও মুসলিমের রিপোর্টের সাথে এর মিল পাওয়া যায় না। তাদের মতে সা'দ ইবনে মুয়ায বানু আল মুস্তালিকের অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। সা'দ ইবনে মুয়ায বানু আল কুরাইযার যুদ্ধে শহীদ হন। বানু আল কুরাইযার যুদ্ধ সংগঠিত হয় ঠিক খন্দকের যুদ্ধের পর।[১২] এসব বিবরণ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, বানু আল মুস্তালিকের লড়াই হয় খন্দকের লড়াইয়ের আগে।

বানু আল মুস্তালিকের অভিযানে ঠিক কতজন মুসলমান মদীনা থেকে শরীক হন তার কোন সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। তবে আল যাহাবি'র মতে মুসলমান দলে ছিলেন ৭০০ যোদ্ধা।[১৩] আল ওয়াকিদি'র মতে তাদের সাথে ছিল ৩০ অশ্বারোহী। এর মধ্যে দশজন *মুহাজেরদের* থেকে আর কুড়িজন *আনসারদের*[১৪] থেকে যোগ দিয়েছিলেন।

আল মুরায়সিতে কি ঘটেছিল সে ব্যাপারে দু'টো গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ রয়েছে। এটা ছিল কাদিদের একটি জলাধারের স্থান। আবদুল্লাহ ইবনে উমর হতে আল বুখারী ও মুসলিম উভয়ে বলেন, রাসূল (সা) বানু আল মুস্তালিককে আক্রমণ করেন। তারা যখন তাদের পশুদের পানি পান করাচ্ছিলেন এমন অসতর্ক মুহূর্তে তাদের আটক করেন। তিনি তাদের লোকজনকে হত্যা করেন এবং নারী শিশুদের বন্দী করেন। রাসূল (সা) জুয়াইরিয়াকে তাঁর যুদ্ধ বন্দীর অংশ হিসাবে গ্রহণ করেন।[১৫] মুসলিম শরীফে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে- "আমি নাফি'র কাছে শত্রুদেরকে ইসলাম কবুলে পত্র লিখলাম। যুদ্ধ শুরুর আগে এ পত্র লিখা হয়েছিল। তিনি আমাকে লিখেন যে, ইসলামের প্রথম যুদ্ধে এটাই নিয়ম ছিল। কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সা) বানু আল মুস্তালিককে আক্রমণ করে তাদের অসতর্ক মুহূর্তে তাদেরকে আটক করেন...।"[১৬]

মুসলিমের রিপোর্টে দেখা যায়, রাসূল (সা) কোনরূপ সতর্ক না করেই বানু আল মুস্তালিকদের আক্রমণ করেছিলেন[১৭]। এর কারণ রাসূল এর পূর্বেই তাদের কাছে বার্তা পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং এ অবস্থাটিকে একটি যুদ্ধাবস্থা হিসাবে গণ্য করা যায়। কুরাইশরা ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের উপর আক্রমণের পর হতেই এ অবস্থা বিরাজ করছিল। তা ছাড়া তারা তখনই মুসলমানদের উপর যুদ্ধ শুরু করতে যাচ্ছিল। তাদেরকে এ অবস্থায় আক্রমণ করা হয়। এতে তারা আশ্চর্য হয়, ভয় প্রাপ্ত হয় এবং দীর্ঘক্ষণ তারা প্রতিরোধ করে যেতে পারেনি। বুখারী ও মুসলিমে কোন প্রতিরোধের বিষয় বর্ণিত হয়নি

তবে ইবনে ইসহাক বলেন, মুরাইসির জলাধারের কাছে লড়াই হয়েছিল, এখান থেকে বানু আল মুস্তালিক বাহিনীকে বিতাড়িত করা হয়। তাদের অনেককে এখানে হত্যা করা হয়, তাদের নারী শিশুকে আটক করা হয় এবং তাদের সম্পদ দখল করা হয়। এগুলো তাদের নিজেদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়।[১৮]

কতজনকে হত্যা করা হয়, কতজনকে আটক করা হয়, আর কি পরিমাণ সম্পদ দখল করা হয় সে ব্যাপারে কোন *সহীহ* বর্ণনা নেই। তবে ইবনে ইসহাকের রিপোর্টের বাইরে বানু আল মুস্তালিকের ১০০ পরিবারকে মুক্ত করে দেয়ার কথা বলা হয়।[১৯] আল ওয়াকিদির রিপোর্টে বলা হয়, বানু আল মুস্তালিকের ১০ জনকে হত্যা করা হয়। অবশিষ্টদেরকে আটক করা হয়, "তাদের একজনও পালাতে পারেনি"[২০] তাঁর বর্ণনামতে ১০০০ উট, ৫০০ মেষ আটক করা হয় এবং ২০০ পরিবারকে বন্দী করা হয়।[২১] তাছাড়া ৭০০ জনকে বন্দী করার কথাও বর্ণনা করা হয়।[২২]

প্রায় মাসখানেক পর রাসূল (সা) রমাযানের শুরুতে মদীনায় ফিরে এলেন।[২৩] মুরাইসির জলাধারের স্থানে *মুনাফিকরা* ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে তাদের ঘৃণা প্রকাশ করছিল। ইসলাম যখন নতুন ভাবে বিজয় লাভ করে তাদের ক্রোধ ও ঘৃণা আরও বেড়ে যায়। তারা সামনের যে কোন মুসলমানদের পরাজিত করার কথা ভাবতে থাকে আর তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার পরিকল্পনা করে। মুসলমানগণের কুরায়সির জয়ের পর *মুনাফিকরা* মুহাজির ও আনসারদের মধ্যেকার গোত্রীয় রেষারেষির বিষয়টিকে উসকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। এটিতে ব্যর্থ হয়ে তারা রাসূল (সা) ও তার পরিবারের উপর একটি তিক্ত মানসিক যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে উদ্যত হয়। তারা রাসূল (সা) ও তাঁর পরিবার সম্পর্কে বদনাম ছড়াতে থাকে।

সাহাবী যায়েদ ইবনে আরকাম ছিলেন প্রথম ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তিনি ঘটনার বর্ণনায় বলেন ঃ

> আমি যখন যুদ্ধে[২৪] অংশ গ্রহণ করছিলাম তখন আমি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে বলতে শুনলাম, "তাদের সাথে থেকো না যারা আল্লাহর রাসূলের সাথে রয়েছে, তারা তাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে এবং ছত্রভংগ হয়ে যেতে পারে। আমরা মদীনায় ফিরে গেলে অধিক সম্মানীয়রা তাদের ভেতরকার হীনমনাদেরকে বের করে দেবে।"
>
> আমি বিষয়টি আমার চাচা বা উমরকে বলি।[২৫] উমর আবার বিষয়টি রাসূল (সা) কে বলেন। রাসূল (সা) আমাকে এ ব্যাপারে ডেকে পাঠান। আমি পুরো ঘটনা বর্ণনা করি। রাসূল (সা) আমার কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাথীদের ডেকে পাঠান। তারা তখন শপথ করে বললো যে, তারা উপর্যুক্ত কথা বলেনি। রাসূল (সা) আমাকে অবিশ্বাস করলেন আর তাদের কথা বিশ্বাস করলেন। আমি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। পূর্বে কখনো আমার এরূপ হয়নি। আমি বাড়িতে থেকে গেলাম। আমার চাচা আমাকে বললেন,

"তুমি চেয়েছ তোমার কথা রাসূল (সা) অবিশ্বাস করুন, আর ঘৃণা করুন।" এ প্রসঙ্গে আল্লাহর ওহী নাযিল হলো; "যখন মুনাফিকরা তোমার কাছে আসলো ...(৬৩:১)।[২৬] এর পর রাসূল (সা) আমাকে খবর দিয়ে পাঠালেন এবং আল্লাহর কুরআন তিলাওয়াত করলেন, " হে জায়েদ! আল্লাহ তোমার বক্তব্যকে সঠিক বলেছেন।"[২৭]

আরেক প্রত্যক্ষদর্শী জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ আল আনসারী আল সুরাইসিতে কি ঘটেছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন। তার বর্ণনাতেও আমাবিয়্যার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে কিভাবে মুসলমানদের মধ্যে ভাঙন ধরানো যায় সে ব্যাপারে ব্যাখ্য রয়েছে। তিনি বলেন, "আমরা যখন একটি আক্রমণের কাজে ছিলাম তখন এক *মুহাজির* এক *আনসারকে* লাথি মারে। *আনসার* বলেন, "হে *আনসারগণ*, আমাকে সাহায্য করুন। *মুহাজির* বললেন, "হে *মুহাজিরগণ*, আমাকে সাহায্য করুন। আল্লাহর রাসূল (সা) তাদের কথা শুনে বললেন, "তোমরা কেন জাহেলদের ন্যায় কাজ করছ? তারা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, জনৈক *মুহাজির* জনৈক আনসারকে লাথি মেরেছে।' আবদুল্লাহ ইবন উবাই একথা শুনে বললেন, 'তারা কি অনেক দূরে চলে গিয়েছেন?' আল্লাহর কসম, আমরা যখন মদীনায় ফিরে যাবো তখন আমাদের মধ্যেকার নিকৃষ্টজনকে সম্মানীয়জন বহিষ্কার করে দেবেন।' রাসূল (সা) একথা শুনেছেন। উমর ও একথা শুনে দাঁড়িয়ে বললেন, '*মুনাফিকদের* মাথা কেটে দেব। রাসূল (সা) বললেন, 'তার কথা বাদ দাও। মুহাম্মদ তার সাথীদের হত্যা করেন মানুষ একথা বলুক তা আমি শুনতে চাই না।" *আনসারগণ* প্রথম দিকে *মুহাজিরদের* চেয়ে সংখ্যায় বেশী ছিলেন যখন *মুহাজিরগণ* মদীনায় হিজরত করেছিলেন। কিন্তু পরে *মুহাজিরদের* সংখ্যা বেড়ে যায়।[২৮]

তাবুক অভিযানের সময় আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের দেয়া এই বক্তব্য সম্পর্কে অনেক বিপরীত বর্ণনা রয়েছে।[২৯] এটি একটি ভুল ধারণা। সহীহ্ রিপোর্টে দেখা যায় আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তাবুক অভিযানে অংশ গ্রহণ করে নি।[৩০]

রাসূল (সা) বললেন, আমার সাহাবীরা জাহেলী কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। তিনি বললেন, "তোমার ভাই সে যালেম হোক বা মযলুম হোক সে যদি যালেম হয়ে থাকে তাকে জাহেলী কাজ বন্ধ করতে সাহায্য কর।[৩১] আর সে যদি মযলুম হয়ে থাকে তাকে রক্ষার কাজে সাহায্য কর।" সত্য ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে রাসূল (সা) পরস্পরকে সমর্থন করতেন আর তাদের জাহেলী কর্মকান্ডকে অবৈধ ঘোষণা করেন। তিনি বলেছেন, "তোমার ভাইকে সমর্থন কর সে হোক যালেম, হোক মযলুম।"

মুসলমানদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক ছিল সে সম্পর্কে তিনি যে উদ্বিগ্ন ছিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবায়কে তার কর্মকান্ডের জন্য শাস্তি না দেয়া থেকে বিষয়টি বুঝা যায়। তিনি চেয়েছিলেন ইসলামের খাতিরে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক বজায় থাকুক। কোন অপপ্রচার যাতে তাদেরকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে না পারে তিনি সে ব্যাপারে যত্নশীল ছিলেন। রাসূল (সা) শুধুমাত্র লোকটির সাথে রাত

অবধি সারা দিন হেঁটেছেন পরের দিন ভোর হওয়া পর্যন্ত, দিনের সূর্যতাপ তাদেরকে মলিন না করা পর্যন্ত সারাদিন রোদের মধ্যে হেঁটেছেন। এর পর তিনি তাদের থামালেন। তারা মাটি স্পর্শ না করা পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। তারা এ সময় ঘুমিয়ে পড়েন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যে বিরোধের সৃষ্টি করেছিল তার থেকে তাদের মন অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার জন্য রাসূল (সা) এরূপ করেছিলেন।

নিজেদের লোকদের মধ্যেই আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল দুর্বল আর অপ্রিয় হয়ে পড়ে। তার কোন ভুল হলেই তাকে দোষ দিতে থাকে।[৩২] তার পুত্র আবদুল্লাহ তার পিতাকে হত্যার জন্য রাসূল (সা) এর অনুমতি চাইলেন। কিন্তু রাসূল (সা) তাকে এ বলে নিবৃত্ত করলেন। "না, তার সাথে সদয় হয়ে কথা বল আর তার সাথে উত্তম আচরণ কর।"[৩৩] রাসূল (সা) এর অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত আবদুল্লাহ তার পিতাকে মদীনায় প্রবেশের অনুমতি দিতে চাচ্ছিলেন না।[৩৪] তিনি তার পিতার সাথে ভাল ব্যবহার করতেন এবং তাকে সম্মান প্রদর্শন করতেন। তা সত্ত্বেও তিনি এরূপ করেছিলেন।[৩৫] এটা সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার যে ছেলে হয়ে ঈমানের প্রতি এত নিষ্কলুষ ভাব দেখেয়েছিলেন। এভাবেই সাহাবীদের কে কোন কলঙ্ক তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তার বংশের মধ্যে *জাহেলিয়াতে* অভ্যাস দেখা গেলেও তিনি ছিলেন তা থেকে মুক্ত। এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, ইসলাম তার অনুসারীদের মধ্যে কেমন শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইসলামের কারণে মুসলমানদের আচার আচরণে যে পরিবর্তন এসেছিল এ ঘটনা দ্বারা তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

মুনাফিকরা সাহাবীদেরকে উত্তেজিত করতে ব্যর্থ হয়ে ক্রোধে অন্ধের মত আচরণ করতে থাকে। রাসূল (সা) এর পরিবারের ক্ষতি করার জন্য তারা একটি সুযোগ পেয়ে যায়। রাসূল (সা) এর স্ত্রী আয়শা বানু আল মুস্তালিকের অভিযানে গিয়েছিলেন। মহিলাদের জন্য *হিজাব* প্রবর্তনের পরই এ ঘটনা ঘটে। অভিযান শেষে মুসলমানগণ মদীনার কাছাকাছি এসে পৌছলে আয়শা তাঁর বাহন থেকে নেমে প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে বাইরে যান। তিনি ফিরে এসে দেখেন তার গলার হার খোয়া গিয়েছে। সেজন্য তিনি তাঁর হারের খোঁজে ঐস্থানে আবার ফিরে যান। ইতোমধ্যে তাঁকে বহনকারী উটটিকে নিয়ে তার চালকও রওয়ানা দিয়ে দিলেন। চালক বুঝতে পারেন নি যে, আয়শা উটে উঠে চড়েননি। আয়শা এতই ছোট ও হাল্কা ছিলেন যে, বুঝার উপায় ছিল না। মুসলমানগণ এমন অবস্থায় তাঁকে মরুভূমিতে রেখেই মদীনায় পৌছে যায়। আয়শা ইতোমধ্যে তাঁর হারটি নিয়ে ফেরৎ এসে দেখেন যে, তাকে বহনকারী উটটি চলে গিয়েছে। যেখান থেকে তিনি হারিয়ে গিয়েছিলেন আয়শা সেখানে ফিরে এসে অপেক্ষা করতে থাকেন। উট ও উটচালক তাঁর জন্য সেখানে ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন। সবচেয়ে ভাল একজন সাথী সাফওয়ান ইবনে আল মুয়াত্তাল আল সালামী এ সময় তাঁর পাশ্ব দিয়ে যাচ্ছিলন। তিনি তাঁকে তার উটে করে মদীনায় পৌছায়ে দেন। রাসূল (সা) মদীনা পৌছার পর আয়শা পৌছেন।

মুনাফিকরা এ ঘটনাটিকে লুফে নিল। তারা এ ঘটনাকে নিয়ে মিথ্যা প্রচার শুরু করে দিল। এ অপকর্মের প্রধান হোতা হলো আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল। সে মিসতা ইবনে আতাথা, হাসান ইবনে সাবিত এবং হামনা বিনতে জসকে এ ব্যাপারে কথা বলতে উত্তেজিত করলো। এভাবে আয়শা উম্মুল মুমিনার বিরুদ্ধে অপবাদ প্রচার করা হলো আর তাঁকে মিথ্যা দোষারোপ করা হলো।

মুনাফিকদের এ অপপ্রচারে রাসূল (সা) ভীষণভাবে বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। রাসূল (সা) মসজিদে সমবেত মুসলমীদের মাঝে ঘোষণা করলেন তিনি তাঁর স্ত্রী ও তাঁর সাথী সাফওয়ান ইবনে আল মুয়াত্তালকে বিশ্বাস করেন। সা'দ ইবনে মুয়ায ঘোষণা করলেন যে, আল আউস গোত্রের যে ব্যক্তি এরূপ মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছে তাকে হত্যা করবেন। সা'দ ইবনে উবাদা তাঁর আপত্তির কথা সা'দ ইবনে মুয়াযকে জানালেন। এভাবে আল আউস ও আল খাজরাজের মধ্যে বিবাদের শুরু হলো। রাসূল (সা) হস্তক্ষেপ না করলে এ বিবাদ বন্ধ হতো না।

আয়শা এ অবস্থার মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রাসূল (সা) এর কাছে তিনি তার বাবার বাড়ী যাওয়ার অনুমতি চাইলেন, তিনি তাঁর বাবার বাড়ী গিয়ে তাঁর নামে প্রচারিত অপবাদের বিষয়টি জানতে পারেন। তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাঁর চোখে ঘুম নেই। তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছিলেন আল্লাহ যেন এ ব্যাপারে রাসূল (সা) এর উপর তাঁর ওহী নাযিল করেন। দীর্ঘ মাস খানেক রাসূল (সা) এর উপর কোন ওহী নাযিল হলো না। রাসূল (সা) চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

মুনাফিকরা রাসূল (সা) এর ব্যাপারে মানহানিকর কথাবার্তা বলতে লাগলো, তাঁর স্ত্রীকে আজেবাজে কথা বলে কষ্ট দিতে লাগলো। তাঁর মনের সান্ত্বনার জন্য রাসূল (সা) তখন একাগ্র মনে তাঁর উপর ওহী নাজিলের দোয়া করছিলেন যাতে তার মধ্যে শান্তি ফিরে পেতে পারেন। মুনাফিকদের হাত থেকে তাঁর স্ত্রী ও তাঁর পিতাকে রক্ষার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা) এর উপর নিম্নবর্ণিত আয়াত নাযিল হয়।

> যারা এ অপবাদ রচনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল; তাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং ইহাতো তোমাদের জন্য কল্যাণকর; তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের কৃত পাপকর্মের ফল এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি।
>
> এ কথা শোনার পর মুমিন পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজদের বিষয়ে সৎ ধারণা করেনি এবং বলেনি, 'ইহাতো সুস্পষ্ট অপবাদ'। তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি, যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সে কারণে তারা আল্লাহর বিধানে মিথ্যাবাদী।

> দু'নিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে এর জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত।
>
> যখন তোমরা মুখে মুখে ইহা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিধান মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা তাকে তুচ্ছ গণ্য করছিলে, যদিও আল্লাহর নিকট ইহা ছিল গুরুতর বিষয়।
>
> এবং তোমরা যখন ইহা শ্রবণ করলে তখন কেন বললে না, 'এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিৎ নয়; আল্লাহ পবিত্র, মহান! ইহাতো এক গুরুতর অপবাদ।'
>
> আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, 'তোমরা যদি মুমিন হও তবে কখনো অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না।'
>
> আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াত সমূহে স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।
>
> 'যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।'
>
> তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেত না এবং আল্লাহ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। (২৪:১১-২০)

আবু বকর তাঁর আত্মীয় মিস্তার জন্য টাকা খরচ করতে লাগলেন। তিনি শপথ করে বললেন তিনি আর এরূপ করবেন না। এ সময়ে নিম্নবর্ণিত আয়াত নাযিল হয় ঃ

> তোমাদের মধ্যে ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয় স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দেবে না; তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে।

তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এর পর আবু বকর তার জন্য টাকা পয়সা খরচ করতে লাগলেন। নিঃসন্দেহে সত্য যে, উপরে বর্ণিত তিন মুসলমানই রাসূল (সা) ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে অপবাদ ছড়াচ্ছিল। তবে এদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের নেতৃত্বে পরিচালিত *মুনাফিকদের* দলটিই সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছিল। আমি যে তিনজন মুসলমানের নাম করলাম তারা *মুনাফিকদের* ফাঁদে পড়ার লোক ছিল না। কুরআনে তাদেরকে এ ব্যাপারে দোষ দিয়ে আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ

> এ কথা শোনার পর মু'মিন পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজদের বিষয়ে সৎ ধারণা করেনি এবং বলেনি, ইহা তো সুস্পষ্ট অপবাদ।' (২৪:১২)

অনেক মু'মিনই রাসূল (সা) এর পরিবারে কি হচ্ছিল সে ব্যাপারে অভিহত ছিলেন না। রাসূল (সা) এর পরিবারের সদস্যদের ব্যাপারে তাদের অনেক বড় বিশ্বাস ছিল। যখন আবু আইউব আনসারী *মুনাফিকদের* অপবাদের কথা শুনলেন তখন তিনি বলেন, "এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিৎ নয়; আল্লাহ্ পবিত্র, মহান! ইহাতো এক গুরুতর অপবাদ!" (২৪:১৬)

রাসূল (সা) নির্দেশ দিলেন যে, অপবাদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি (*হাদ্দ*) দিতে হবে মিসতা, হাসান ও হামনাকে।[৩৬] রাসূল (সা) মিথ্যা অপবাদ প্রচারে নেতৃত্বদানকারী আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলকে কোন শাস্তি দিলেন না। শাস্তি না দেয়ার কারণ এটা হতে পারে যে, শাস্তি দেয়া হলে সে হয়ত তার অপরাধ থেকে নিস্কৃতি পেয়ে যাবে। আল্লাহ যাদেরকে আখেরাতে শাস্তি দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন আবদুল-া ইবনে উবাই হয়ত তাদের একজন। সে জন্য তাকে দুনিয়াতেই শাস্তি দেয়া হয়নি। তাছাড়া এটাও বলা হয়ে থাকে যে, এ *মুনাফিক* এমনভাবে কাজ করেছে যাকে কোন প্রমাণ হিসাবে দাঁড় করানো যায়নি। সে কখনো কারো সামনে অপবাদের কথা প্রচার করেনি। সে ঈমানদার কারো সামনে কোন অপবাদের কথা বলেনি।[৩৭] তাকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে কোন কোন দুর্বল হাদীসে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩৮]

এটা সত্য যে, অপবাদের জন্য শাস্তি দেয়ার বিষয়টি আল আউস ও খাজরাযের সাহাবীদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তাদের নেতারা মসজিদে এ ব্যাপারে ক্রোধের সাথে ঝগড়া বিবাদ করতে থাকে। এটাই ছিল *মুনাফিকদের* উদ্দেশ্য। মুসলমানদের ঐক্য, তাদের নেতাদের উপরে আস্থা নষ্ট করা এবং তাদের নিজেদের মধ্যে *ফিতনা* সৃষ্টিই ছিল *মুনাফিকদের* আসল উদ্দেশ্য। তবে এরূপ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করেন। রাসূল (সা) তাদেরকে শান্ত করেন। তাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করেন। এ বিরাট পরীক্ষায় রাসূল (সা) উত্তীর্ণ হন।

রাসূল (সা) এর অফুরন্ত ধৈর্য ও আল্লাহর উপর ঈমানের কারণে এ সময়ে কুরআনের বেশ কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়। এই আয়াত সমূহে আয়শার সতীত্ব সম্পর্কে বলা হয়। এ আয়াতগুলো মুসলমানগণ যুগ যুগ ধরে আল্লাহর ইবাদতে তেলাওয়াত করে আসছে।

রাসূল (সা) শীঘ্রই মদীনায় ফিরে এলেন। এ সময়ে জুয়াইরিয়াহ বিনতে আল হারিস ইবনে আবু দিবার তাঁর কাছে এসে সাহায্যের কথা বলেন। ইতোমধ্যে জুয়াইরিয়াকে যুদ্ধে লব্ধ জিনিসপত্রের ন্যায় সাবিত ইবনে কাইস ইবনে আল সাম্মার কাছে হস্তান্তর করা হয়। তার হাত থেকে জুয়াইরিয়াকে রক্ষার জন্য রাসূল (সা) এর নিকট জুয়াইরিয়া আবেদন করেন। জুয়াইরিয়া তার মুক্তির জন্য *সাবিতের* সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হন। তিনি রাসূল (সা) কে সমাজে তার উচ্চ মর্যাদার কথা বলেন। রাসূল (সা) তার মুক্তিমূল্যের অবশিষ্ট অংশ পরিশোধ করে দেন আর তার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। মানুষ এ খবর জানতে পেরে তারা অবশিষ্ট বন্দীদেরকে মুক্ত করে দেয়। তারা এ

ব্যাপারে বলে, "পরিণয় সূত্রে তারা রাসূল (সা) এর আত্মীয়।" এভাবে একশত পরিবারকে মুক্ত করে দেয়া হয়। "কোন মহিলাই তার কাছে তার চেয়ে বেশী আশীর্বাদের বিষয় ছিলনা।"[৩৯] তার মুক্তিমূল্য ছিল তার দেয়া *মোহর*।

আল হারিস ইবনে আবু দারার মদীনায় চলে আসেন। এখানে এসে তিনি রাসূল (সা) কে তাকে (জুয়াইরিয়া) চলে যেতে দিতে বলেন। রাসূল তাকে তাঁর মাধ্যমে চলে যাওয়ার অনুমতি দেন। আল হারিস ইবনে দারার তাকে চলে যেতে বলেন। এরূপ অনুমতি পাওয়ার পর জুয়াইরিয়া রাসূল (সা) এর সাথে থেকে যান। আল হারিস ইবনে আবু দিরার ও তার অনুসারীগণ ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেল। রাসূল (সা) তাকে তার লোকদের *সাদাকার* (এক প্রকার দান) দায়িত্ব অর্পণ করেন।

জুয়াইরিয়ার বিবাহ ও বন্দীদের মুক্তিদানের ফলে তাদের হৃদয় কোমল হয়ে গেল। তারা ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠলো। এ ভাবে ইসলামের জন্য জিহাদ, আল্লাহর আনুগত্য ও তার আইন মেনে চলার ব্যাপারে এক নতুন যুগের সূচনা হলো। রাসূলের *যাকাত আদায়কারী* যাকাত আদায়ে *দেরী* করে ফেললে আল হারিস ইবনে আবু দিরার ও তার লোকেরা অস্থির হয়ে পড়তেন এবং সাথে সাথে রাসূল (সা) এর কাছে গিয়ে এর কারণ বের করতে চেষ্টা করতেন। রাসূল (সা) আল ওয়ালিদ ইবনে উবায়কে *যাকাত* আদায়ে নিযুক্ত করেন। কিন্তু আল ওয়ালিদ ভয় পেয়ে মদীনায় ফিরে এলেন। আর বললেন লোকেরা *যাকাত* দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে এবং লোকেরা তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছে। রাসূল (সা) তাদের কাছে একটি অভিযান প্রেরণ করলেন। আল হারিস শপথ করে বললেন যে, ... তিনি আল ওয়ালিদকে দেখেন নি। তিনি রাসূল (সা) এর কাছে গিয়ে তার অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। নিচের আয়াতটি তার প্রসঙ্গে নাযিল হয় ঃ

> হে মু'মিনগণ, যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতাবশত: তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর, এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও। (৪৯:৬)

এ আয়াত নাযিল হওয়ার উপলক্ষ্যটি একটি সহীহ্ বর্ণনা হতে জানা যায়। ইবনে কাসির বর্ণনা করেন,[৪০] মক্কা বিজয়ের পর[৪১] আল ওয়ালিদ ইবনে উকবার ইসলাম কবুলের পর এ ঘটনা ঘটে। এ রিপোর্টের মাধ্যমে ইসলাম সু-প্রতিষ্ঠিত হয়। আর তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার কয়েক বছরপরই তাদের মধ্যে ঈমান মযবুত হতে থাকে।

এ সময়ে অনেকগুলো *আহকাম* (আইন কানুন) প্রবর্তিত হয়। নিচে কয়েকটির বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

০১. যারা ইতোপূর্বেই ইসলামের বিষয়ে জানতে পেরেছে তাদেরকে সতর্ক করা ছাড়াই আক্রমণ করার অনুমতি দেয়া হয়। কেউ যদি ইসলামের দাওয়াত না পেয়ে থাকে তাকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার পরই কেবল তার বিরুদ্ধে প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করা যাবে।

০২. কোন বন্দীকে যৌতুকের বিনিময়ে মুক্ত করে দেয়ার বিষয়ে অনুমতি দেয়া। যেমন, রাসূল (সা) যুদ্ধ অভিযানের সময় জুয়াইরিয়া বিনতে আল হারিস এবং সাফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আকতাবের ব্যাপারে খায়বার যুদ্ধের সময়ে এরূপ করেছিলেন।[৪২]

০৩. রাসূল (সা) এর সাথে সফরের ব্যাপারে তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে লটারীর প্রচলন করেছিলেন। রাসূল (সা) কখনো কখনো এরূপ লটারীর ব্যবস্থা করতেন। লটারীতে আয়শা জিতলেন। রাসূল (সা) তাকে তাঁর সফর সঙ্গী করলেন।[৪৩] আল ওয়াকিদে'র মতে উম্মে সালমাও এ সফরে গিয়েছিলেন, কিন্তু এর পক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।[৪৪] রাসূল (সা) এর সাথে আয়শার বাইরে যাওয়া থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদেরও সামরিক অভিযানে যাওয়ার অনুমতি আছে। এ ব্যাপারে আমি ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি। ওহুদ যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যুদ্ধে যাওয়ার শর্তাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

০৪. *হাদ্দ* প্রবর্তন, যারা অপবাদ প্রচার করে তাদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি।

০৫. আরববাসীদেরকে যুদ্ধের সময়ের ন্যায় বন্দী হিসাবে আটকের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ পন্ডিতদের এটিই অভিমত।[৪৫] আয়শা কুরআনের বক্তব্যের মাধ্যমে নিষ্পাপ প্রমাণিত হওয়ার পর সকল পন্ডিতই একমত হন যে, অপবাদ দাতা যেই হোক সে *কাফির*। কারণ সে কুরআন অস্বীকার করেছে।[৪৬] যুদ্ধাভিযানের সময় আরেকটি আইনের উৎপত্তি ঘটে সেটি হলো স্বেচ্ছায় যৌন ক্রিয়া বিরতি। রাসূল (সা) কে সাহাবীগণ এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি এর অনুমতি দিয়ে বলেন, "তোমরা এটা কেন করবেনা? এখানে কোন রূহের সৃষ্টি হয়নি যার অস্তিত্ব পূনরুত্থান দিবস পর্যন্ত বিদ্যমান থাকতে পারে।"[৪৭] উলামা এ ব্যাপারে বলেন যে, মুক্ত স্ত্রীর সাথে স্ত্রীর অনুমতিক্রমে স্বেচ্ছাকৃত যৌন ক্রিয়ায় বিরতি করা যেতে পারে।[৪৮] অপবাদ প্রচারের হাদীসের মাধ্যমে রাসূল (সা) এর মানসিকতার দিকটাই পরিস্ফুট হয়ে উঠে। মুনাফিকরা তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে যে অপবাদ দিয়েছিল তাতে রাসূল (সা) খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রীর জন্য চিন্তা, ভালবাসা, তার স্ত্রীর পিতার জন্য ভালবাসা সত্ত্বেও এর পেছনের সত্যটি বের করতে পারেন নি বা এক মাস ধরে অন্তত তাঁকে পরীক্ষার জন্য হলেও যে তাঁর উপর ওহী নাযিল হওয়া বন্ধ হয়ে রইল সে ব্যাপারেও রাসূল (সা) কিছুই বুঝতে পারেন নি। ওহী যদি কোন অনুপ্রেরণা বা প্রত্যাদেশ জাতীয় কিছু হয়ে থাকে বা মনোগত কোন কিছু হয়ে থাকে, যা মানুষের মন থেকে উদয় হয়ে থাকতে পারে, আর অবস্থা এমন হয়ে থাকলে কখনো কখনো বিভিন্ন বিষয়ের কারণে তিনি যে প্রচন্ড চাপের মধ্যে পড়ে যেতেন। তা হলেতো কষ্টদায়ক এসব সমস্যার সমাধানে তিনি ওহী নাজিলের অবস্থার সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু কুরআনের ভাষায় রাসূল (সা) শুধুমাত্র একজন মানুষই ছিলেন।

"বল আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, ..." (১৮:১১০)।

ওহীর ওপর রাসূল (সা) এর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তিনি ওহীকে ডেকে আনতে পারতেন না বা ওহীর সাথে তিনি কোন কিছু যোগও করতে পারতেন না।

সে যদি আমার সাথে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত, আমি অবশ্যই তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম, এবং কেটে দিতাম তার জীবন ধমনী, অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তাকে রক্ষা করতে পারে। (৬৯:৪৪-৪৭)।

আরব উপদ্বীপে মুসলমান সৈন্যবাহিনীর যাতায়াত, বদরযুদ্ধে কুরাইশদেরকে মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া, বাণিজ্য পথের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও মক্কার অর্থনীতিতে বিরামহীন চাপের কারণে *মুশরিকরা* মদীনার ইহুদীদের সাথে মিত্রতা গড়ে তোলে। এ ইহুদীদের মধ্যে বানু কায়নুকা ও বানু নাদির গোত্রকে এর পূর্বেই মুসলমানগণ মদীনা থেকে বিতাড়িত করেছিল। কুরাইযা তাদের মধ্যে এবং মুসলমানদের মধ্যে মিত্রতার ভান করলো। কিন্তু তাদের অন্তরে ছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা। এ বিষয়টি আল আহযাবের অভিযানের সময় প্রমাণিত হয়।

পাদটীকা ঃ

১. আল কালকাশান্দি, আবু আল আব্বাস আহমাদ ইবনে আলী, কালায়েদ *আল জুমান ফি-আল তারিফ বি কাবায়েল আরব আল জামিন*, ৯৩। আমর ইবনে আমির আল আউস ও আল খাজরাযের দ্বিতীয় এবং আল মুত্তালিকের চতুর্থ পিতামহ-এর নামে *আনসারদের* (আল আউস ও আল খাজরায) বংশতন্ত্রের সংযুক্তি করণের জন্য। দেখুন, খলিফা ইবনে যাইয়্যাত, *আল তাবাকাত*, পৃ. ৭৬, ১০৭।

২. আল হারবি, আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহিম *কিতাব আল মানাসিক ওয়া আমাকিন তরুক আল হাজ্জ ওয়ামা'লিম আল জাজিরা*, ৪৫৮-৬০

৩. প্রাগুক্ত, ৪৬৩।

৪. আবদ আল্লাহ আল বাস্‌সাম *তায়সীর আল আল্লাম শারহ উমাদা আল আহকাবা*, ১/৫৮৪।

৫. ইবরাহিম আল কুরায়বি, মাররিয়াত গাওয়াত বানু আল মুস্তালিক, ৫৪-৪।

৬. এখানে মা'বাদ আল খুজাইয়ের মনোভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে। ওহুদ যুদ্ধের পর মদীনা আক্রমণ এবং কুরাইশদেরকে ফিরে না যাওয়ার ব্যাপারে এখানে পরামর্শ দেয়া হয়।

৭. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ২/৬১; আল ওয়াকিদি, আল *মাগাযী*, ১/২০০।

৮. ইবনে সা'দ *আল তাবাকাত*, ২/৬৩। গ্রন্থটির শুরুতে এবং অত্র খন্ডের শুরুতে তিনি *সনদ* সংগ্রহ করেন। এ পৃষ্ঠায় তিনি *কালু* বলে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন। আল ওয়াকিদি, আবু মা'শার আল সিন্দি এবং মুসা ইবনে উকবাহ এর মাধ্যমে এবং তাদের হাদীসগুলোর মিশ্রণ ঘটেছে। এরূপ সনদের সংযুক্তি করণের বিষয়টি জোরালো নয়। কেননা যখন দুর্বল *সিকাত* বর্ণনাকারীদের এক সাথে যুক্ত করা হয়, এটা তখন কঠিন হয়ে দাঁড়ায় কোনটা সঠিক আর কোনটা নয়। *আল ওয়াকিদি, আল মাগাযী* ১/৪০৪-৫।

৯. ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া নিহায়া*, ৩০/২৪২, ৪/১৫৬; আল বায়হাকী, আনা সুনান আল কুবরা, ৯:৫৪। এর সনদে ইবনে লাহিয়ার কথা বলা হয়েছে, তার রেকর্ডটি বিভ্রান্তিকর প্রমাণিত হয় যখন তার প্রস্থটি পুড়িয়ে ফেলা হয়। বর্ণনাটি আবাদিলা'র মাধ্যমে প্রদত্ত হয়। সনদে মুহাম্মদ ইবনে ফালির *সনদ* ও রয়েছে, তাকে সাদুক বলা হয় এবং কখনো কখনো এটিকে অস্পষ্ট মনে করা হয়।

মূসা ইবনে উকবা'র বক্তব্য আল হাকিম, আবু সা'দ আবদ আল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল নিসাবুরী ও আল বায়হাকী'র আল দালায়েল এ বর্ণিত। মূসা ইবনে উকবা থেকে আল বুখারীর রিপোর্টে দেখা যায় হিজরীর চতুর্থ বৎসরে সংগঠিত হয় তবে এটি কলমের ভুল (দেখুন) ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৭/৪৩০)।

১০. ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৭/৪৩০; *আল ওয়াকিদি, আল মাগাযী* ১/৪০৪; ইবনে সা'দ, *আল তাবাকাত*, ২/৬৩।

১১. ইবনে আল কাইয়্যিম, জাদ আল মা'দ ৩/ ১২৫; আজাহাবী, *তারিখ আল ইসলাম*, ২/২৭৪।

১২. *সহীহ* মুসলিম ৪/১১৫; ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৮/৪৭১-২।

১৩. আল যাহাবী, তারিখ আল ইসলাম (*আল মাগাযী*), ১/২৩০।

১৪. *আল ওয়াকিদি, মাগাযী* ১৪০৪।

১৫. *সহীহ আল বুখারী*, ৩/১২৯, কথাগুলো তাঁর।

১৬. সহীহ মুসলিম, ৫/১৩৯।

১৭. আল ওয়াকিদি ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন যে, রাসূল (সা) নির্দেশ করেছেন, উমর ইবনে আল খাত্তাব বানু আল মুস্তালিকের কাছে চিৎকার করে উঠলেন, তাদেরকে ইসলাম কবুল করতে বললেন; তবে আল ওয়াকিদির বর্ণনা বিতর্কিত যেহেতু তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এগুলো বর্ণনা করেছেন। আল ওয়াকিদি আল মাগাযী ১/৪০৪-৭।

১৮. ইবনে হিশাম, *আল সীরাহ*, ২/২৯০-৩; তার তিনটি সিকাহ শায়েখ'র মারাসিল হতে। যেগুলো তাদেরকে শক্তিশালী করতে পারে তিনি সে বর্ণনাগুলোর মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। বরং তিনি তাদের সাথে মিশে গিয়ে তাদের সাথে আপোষ করেন।

১৯. প্রাগুক্ত, ২/২৯৪, ৬৪৩। ইবনে ইসহাক, *সীরাহ*, ১/২৪৫, যে *সনদের* মানুষজন *সিকার* পর্যায়ভুক্ত।

২০. যারা যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন সম্ভবত তিনি তাদেরকেই বুঝিয়েছেন, যেহেতু তাদের নেতা আল হারিস ইবনে দারারকে কারাগারে নেয়া হয়নি।

২১. আল ওয়াকিদি, আল মাগাযী ১/২৬; ইবনে সা'দ, আল *তাবাকাত*, ২/৬৪ "দু' শত পরিবার ," যেমন, এক মহিলা এক "পরিবার," তার সাথে তার পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। এ পরামর্শ যার রিপোর্টের মধ্যে কোন বিভ্রান্তি নেই। যেখানে ৭০০ জনের কথা বলা হয়েছে।

২২. আল জারকাবী, মুহাম্মদ ইবনে আবদ আল বাকী ইবনে ইউসুফ, *শার আল মাবাহিব আল লুদুননিয়্যা*, ৩/২৪৫।

২৩. আল ওয়াকিদি, আর মাগাযী, ১/৪০৪।

২৪. অন্য রিপোর্টে এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, এটি ছিল বানু আল মুস্তালিকের অভিযান (দেখুন, আহমাদ, *আল মুসনাদ*, ৩/৩৯২-৩, *সহীহ সনদসহকারে, ফাতহুর বারী*, ৮/৬৪৯, *মুস্তাকরায আল ইসমাইলী* হতে। অতিরিক্ত সহীহ উপাদান সহকারে, *আল তিরমিজি, সুনান*, ৫/৯০। তিনি বলেন, "এটি একটি হাসান *সহীহ* হাদীস")।

২৫. "চাচা" বলতে তিনি সা'দ ইবনে উবাদাকে বুঝিয়েছেন। তিনি আল খারাজের নেতা ছিলেন। তিনি তার প্রকৃত চাচা ছিলেন না। "উমর" বলতে তিনি উমর ইবনে আল খাত্তাব কে বুঝিয়েছেন। ইবনে হাজার, *ফাতহুরবারী*, ৮/৬৪৫।

২৬. অভিযান শেষে ফেরার সময় এ সূরা নাযিল হয়। *আল তিরমিযী*, সুনান, ৫/৮৮, "এটি হাসান *সহীহ হাদীস*।"

২৭. *সহীহ আল বুখারী*, ৪/১৪৬,

২৮. *সহীহ আল বুখারী*, ৪/১৪৬, ৬/১২৮; মুসলিম, *সহীহ*, ৮/১৯।

২৯. *আল তিরমিযী*, *সুনান*, ৫/৮৯; আল বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, ৬/১২৭।

৩০. তফসীর ইবনে কাসির, ৪/৩৬৯; ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারি*, ৮/৬৪৪।

৩১. সহীহ মুসলিম, ৮/১৯।

৩২. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ২/২৯০-৩, ইবনে ইসহাক ২/৩, তার তিনটি মিয়াদ শাইখের *মুরসাল* হতে। উরওয়া ইবনে আল জুবাইয়ের মাকসিল হতে মুরসাল জাইয়্যিদ হাদীস দ্বারা সমর্থিত (*ফাতহুর বারী*, ৮/৬৪৯)। একই অর্থ দুটো *সহীতেই* দেয়া হয়েছে (আল বুখারী, ৬/১২৭; মুসলিম, ৮/১১৯)

৩৩. আল হায়সামী, *মাজমা আল জাওয়ায়িদ*, ৯/৩১৮, আল বাজ্জার বর্ণনা হতে। তিনি বলেন, "এর মানুষরা ছিলেন *সিকা*।"

৩৪. *আল তিরমিযী*, *সুনান*, ৫/৯০। তিনি বলেন, এটি একটি *হাসান সহীহ* হাদীস,"

৩৫. ইবনে হিশাম, *আল সীরাহ*, ২/২৯৩।

৩৬. আল হায়সামী, *মাজমা আল জাওয়াইদ*, ৯/২৩০, *হাসান সনদ* সহকারে আল বাজ্জারের বর্ণনা হতে; আল বায়হাকী, *আল সুনান*, ৮/২৫০। *হাসান সনদ* কারে।

৩৭. ইবনে আল *কাইয়্যিম*, *জা'দ আল মা'দ*, ২/১২৭-৮।

৩৮. আল হায় সামী, *মাজমা আল জাওয়ায়িদ*, ৯/২৩৭-৪০; ইবনে হাজার, ফাতহুর বারি, ৮/৪৭৯-৮১।

৩৯. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ২/২৯৪, ৬৪৫, *সহীহ সনদ সহকারে*; আবু দাউদ, *সুনান*, ২/৩৪৭।

৪০. আল শওকানী, *ফাতহুর কাদির*, ৫/৬০, ৬২।

৪১. ইবনে হাজার *আল ইসাবাহ*, ২/৫১৬।

৪২. প্রাগুক্ত।

৪৩. প্রাগুক্ত।

৪৪. প্রাগুক্ত।

৪৫. ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৫/১৭০; আল শাফিঈ, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদরিস আল মুত্তালিবি, কিতাব *আল উম্ম* ৪/১৪৬। মজিদ আলদিন ইবনে তাইমিয়্যা, *মুনতাকা আল আকবার*, (৭/২৪৫), ৮/৪ (*নাওল আল আওবার)*।

৪৬. ইবনে কাসির, *তাফসীর*, ৩/২৭৬; আল নবাবী, *শার সহীহ* মুসলিম, ৫/৬৪৩।

৪৭. *সহীহ আল বুখারী*, ৩/১২৯, ৫/৯৬, ৭/২৯, ৮/১০৪।

৪৮. আল যাহাবী, আবু সফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ, *মা'নি আল আসার*, ৩/৩০-৫; মুহাম্মদ ইবনে আলী আল শওকানি, *নায়েল আল আওতার*, ৬/২২২-৪।

অধ্যায় ৭

খন্দকের যুদ্ধ (আল আহযাব)

হিজরীর পঞ্চম বৎসরে *আহযাবের* যুদ্ধ সংগঠিত হয়। ইবনে ইসহাক, আল ওয়াকিদি ও তাদের অনুসারী অন্যান্য ব্যক্তিবর্গসহ বেশিরভাগ পন্ডিতই এ ব্যাপারে একমত।[১] আল যুহরী, মালিক ইবনে আনাস এবং মূসা ইবনে উকবা-এর মতে খন্দকের যুদ্ধ সংগঠিত হয় হিজরীর চতুর্থ বৎসরে।[২] বস্তুতপক্ষে এ দু'মতের মধ্যে তেমন প্রার্থক্য নেই। যারা হিজরী চতুর্থ বৎসরের কথা বলেন তারা হিজরতের পরে মুহররম থেকে এ তারিখ হিসাব করেছেন এবং রবিউল আউয়ালের পরের মাসের হিসাব ধরেন নি। সে হিসাবে বদর যুদ্ধ হয় হিজরীর প্রথম বৎসরে, ওহুদ দ্বিতীয় বৎসরে এবং খন্দকের যুদ্ধ চতুর্থ বৎসরে অনুষ্ঠিত। এ বিষয়ে অনেকের মধ্যে মতভেদ আছে। তারা হিজরীর মুহররমকে হিসাব করেন।[৩] যে হিসাবে ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, খন্দকের যুদ্ধ হিজরীর পঞ্চম বৎসরে হয়েছিল। সবার মধ্যে একমাত্র ইবনে হাযমই বলেছেন খন্দকের যুদ্ধ ওহুদের মাত্র এক বছরপরে।[৪] আবদুল্লাহ ইবনে উমরের হাদীসের অর্থের উপর ভিত্তি করেই তিনি এরূপ বলেছিলেন। হাদীসটিতে বলা হয় যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমরের চৌদ্দ বছরবয়সের সময় ওহুদের দিনে রাসূল (সা) তাকে ফেরৎ পাঠান। এর পর তাকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়। এ সময় তার বয়স হয়েছিল পনের বৎসর।[৫] আর বায়হাকী, ইবনে কায়্যিম, আল যাহাবী এবং ইবনে হাজারের মতে ওহুদের যুদ্ধের সময় আবদুল্লাহ ইবনে উমরের বয়স হয়েছিল মাত্র চৌদ্দ বৎসর। খন্দকের যুদ্ধের সময় তার বয়স হয়েছিল ১৫ থেকে ১৬।[৬] অধিকাংশ সীরাত বিশেষজ্ঞ এ মতামত প্রকাশ করেছেন।

খন্দকের যুদ্ধ ছিল মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যেকার কয়েকটি যুদ্ধের একটি। এ যুদ্ধ ছিল দু'পক্ষের মধ্যে সামনা-সামনি যুদ্ধ। খোলাখুলিভাবে এ যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া হয়। যুদ্ধের জন্য সংগঠিত হওয়ার কিছু কিছু কারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে।

খন্দকের যুদ্ধ সংগঠিত হয় ওহুদের যুদ্ধে কুরাইশরা সিরিয়ার সাথে বাণিজ্য পথের দখলদারিত্ব না পাওয়ার কারণে। ওহুদের *মুশরিকরা* মুসলমানদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধন করলেও তাদেরকে তারা পুরোপুরি ধ্বংস করে দিতে পারেনি। তাদের ভূ-খন্ডও দখল করতে পারেনি। বাণিজ্য পথের হুমকি কুরাইশদের উপর থেকেই যায়।

ওহুদ যুদ্ধের নেতিবাচক ফলাফল ইতিবাচক দিকে মোড় না নেয়া পর্যন্ত মদীনা ও এর আশেপাশে মুসলমানগণ বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করতে থাকে। মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য কুরাইশরা পুরোদমে সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। কুরাইশরা মুসলমানদের উপর একাই আক্রমণ করতে না পারার কারণে

অন্যদের সাথে তারা মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা করে। রাসূল (সা) বানু আল নাযিরের ইহুদীদের মদীনা থেকে বের করে দেয়ার পর তারা এ সুযোগটি পেয়ে যায়। এ উদ্দেশে অনেক ক্ষুদ্ধ নেতা কুরাইশ ও অন্যান্যদের সাথে চুক্তি করার জন্যে খায়বারে যায়। এখানে তারা বিদ্রোহী নেতাদের সাথে চুক্তি করে তাদের নিজের দেশে ফিরে যেতে এবং মদীনায় তাদের হারানো সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে। সালাম ইবনে আবু আল হাকিক আল নাইরী ও হুয়াযে ইবনে আল আখতাব আল নাযারীকে তারা মক্কায় প্রেরণ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আবেদন নিয়ে। মক্কার লোকজন বিতাড়িত ইহুদীদের সাথে একত্র হয়ে যুদ্ধ করতে রাযী হয় এবং ইসলামের চেয়ে *শিরককে* উত্তম বলে ঘোষণা করে। এব্যাপারে কুরআনের নিম্নবর্ণিত আয়াত নাযিল হয়।

> তুমি কি তাদেরকে দেখনি যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেয়া হয়েছিল? তারা জিব্‌ত ও তাগুতে বিশ্বাস করে তারা কাফিরদের সম্বন্ধে বলে যে, 'এদেরই পথ মু'মিনদের অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর'। (৪:৫১)

মক্কা থেকে ইহুদীরা নজদে যায়। এখানে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য গাতফান গোত্রের সাথে মিত্রতার চুক্তি করে। বানু আল নাযির'র[৭] ইহুদীদের চেষ্টায় বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে একটি কনফেডারেশন স্থাপিত হয়। মূসা ইবনে উকবার মতে ইহুদীরা গাতফানে খায়বার বাহিনীর অর্ধেক কনফেডারেশনে পাঠিয়ে বিরোধী বাহিনীকে উৎসাহিত করার পরিকল্পনা করে।[৮] কুরাইশ ও তার মিত্র বাহিনী মক্কা থেকে ৪০ কি মি দূরে মার আল জাহরানে মিলিত হয়। তারা সেখানে কিনানের বানু সালিম, তিহামা ও আহবিশ-এর মিত্রদের সাথে মিলিত হয়। আল হারদ ও জাগাবার মাঝামাঝি স্থানে রুমার মুজতামা আল আইনে হাজির না হওয়া পর্যন্ত তারা[৯] মদীনার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। গাতফান ও বানু আল আসাদ গোত্রের লোকজন ওহুদের কাছে যানব নুকমায় অবস্থান নেয়।[১০] আল সুয়ুতির মতে নাজদি গোত্র এ মিত্রজোটে যোগ দিয়েছিল। মিত্রদের মধ্যে অনেকেই ছিল গাতফান গোত্রের। মিত্ররা ছিল ঃ গাতফান, বানু সলিম, বানু আসাদ, ফাজারাহ, আশযা ও বানু মুররা।

শত্রুবাহিনীর অক্ষ:শক্তি যে আক্রমণ করার জন্য কাছাকাছী সমবেত হচ্ছে এ খবর মুসলমানদের কাছে পৌছার পর রাসূল (সা) তাঁর সাহাবীদের সাথে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। ইসলামকে মহব্বত করার জন্য রাসূল (সা) এর এরূপ ছিল নীতি। রাসূল (সা) তাঁর নেতাদের কাছে উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন। যে বিষয়ে ওহী নাযিল হতো না সে বিষয়ে তিনি (যুদ্ধ ও অন্য যেকোন বড় বিষয়) তাঁর সাথীদের সাথে আলাপ করে নিতেন।[১১] সাথীদেরকে তিনি সমাজ ও রাষ্ট্র যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সেগুলোর ব্যাপারে চিন্তা করার বিষয়টি শিক্ষা দেন।

এ পদ্ধতিতে বিখ্যাত নেতা ও রাজনীতিবিদ তৈরী হবে। তারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে শিখতে পারবে, জানতে পারবে। বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায় তারা যোগ্যতা অর্জন করবে।

সমস্যা আলোচনায় সালমান আল ফারসি পরামর্শ দিলেন হাররাহওয়া কিম এবং হারবাহ্ আল ওয়াবারাহকে সংযুক্ত করে মদীনার উত্তর প্রান্তে পরিখা খননের জন্য।[১২] আক্রমণের জন্য এ জায়গাটাই খোলা ছিল। এখানকার অন্য এলাকাগুলো ছিল দুর্গের মত, খেজুর গাছ আর বিভিন্ন অট্টালিকায় এখানে নিবিড় অবস্থা বিরাজ করছিল। এলাকাটা *হুররা* দ্বারা এমনভাবে পরিবেষ্টিত ছিল যে, এখান দিয়ে সৈন্যবাহিনী বা পদাতিক বাহিনী সহজে হেঁটে যেতে পারবে না।[১৩]

সালমান আল ফারসির এ পরামর্শের কেউ বিরোধিতা করলো না। শত্রুবাহিনীর মিত্রদের সংখ্যা এতই বেশী ছিল যে, মুসলমানগণ তখনও ওহুদের বিয়োগান্তক ঘটনার কথা ভুলতে পারেনি। পরিখার ফলে একটি বড় বাধার সৃষ্টি হলো। এর ফলে মুসলমান ও আক্রমণকারী বাহিনীর মধ্যে আক্রমণ রচনা সম্ভব ছিল না আর মদীনা আক্রমণও সম্ভব ছিল না। এ পরিখা মুসলমানদের জন্য একটি বড় প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থার সুযোগ করে দিয়েছিল। এর মাধ্যমে মুসলমানগণ আক্রমণকারীদের বিরাট ক্ষয়ক্ষতি সাধন করতে পারতেন। পরিখার পেছন থেকে তারা শত্রুদের উপর তীর ধনুক দিয়ে বিশাল আক্রমণ রচনা করতে পারতেন।

মুসলমানগণ পরিখা খনন করতে লাগলেন। পরিখাটি পূর্ব দিকে বানু হারিসার কাছ থেকে আজম আল শায়খায়েন থেকে পশ্চিম দিকে আল মাদাদ পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়।[১৪] এটি ৫,০০০ বিঘত লম্বা, নয় বিঘত চওড়া, আর গভীরতা ছিল সাত থেকে দশ বিঘত পর্যন্ত।[১৫] মুসলমানদের প্রতি দশজনের একেকটি দল ৪০ বিঘত করে খনন করেন। *মুহাজিরগণ* জুবাবা দুর্গের পূর্বে অবস্থিত রাতিজ দুর্গ খননের দায়িত্ব পালন করেন আর *আনসারগণ* জুবাবা থেকে পশ্চিমের আবিদ পাহাড় পর্যন্ত খননের দায়িত্ব পালন করেন।[১৬]

ঠান্ডা আবহাওয়া আর মদীনায় তখন দুর্ভিক্ষের মধ্যেও খুব দ্রুত পরিখা খননের কাজ সমাপ্ত হয়।[১৭] এ যুদ্ধের সেনাবাহিনীর রসদ ছিল দুর্গন্ধযুক্ত চর্বির মিশ্রণে সামান্য বার্লি। চর্বির রং পুরনো হওয়ার কারণে বদলে যায়। এর পরও সৈন্যবাহিনী এগুলো খেয়েছিলেন। ক্ষুধার তাড়নায় বিস্বাদ ও ক্ষতিকর গন্ধ সত্ত্বেও তারা এগুলো খেয়ে যুদ্ধ করেছিলেন।[১৮] কোন কোন দিন খেজুর[১৯] ছাড়া আর কিছুই তারা খেতে পাননি। কখনো কখনো তারা না খেয়ে তিন দিন অতিবাহিত করেছেন।[২০] ঈমানী শক্তির কারণে তারা তীব্র ঠান্ডা আর ক্ষুধার কথা ভুলে যান। মুসলমানগণ তাদের কাঁধে করে পরিখা খননের মাটি বহন করেন। বিভিন্ন শ্রেণীর নেতা, ব্যবসায়ী যারা কোন দিন নিজেদের জন্যও এমন কষ্ট করেননি তারাও এখানে সবার সাথে মিশে মাটি বহন করেছেন আর পরিখা খনন করেছেন। সবাই এখানে একাকার হয়ে গেছেন, তারা উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে এ কাজ করেন। মনের খুশিতে তারা গান গেয়ে উঠতেন। রাসূল (সা) ও তাদের সাথে মাটি খননের কাজ করেন। মাটি বহন করে নিয়ে যান। মাটিতে তাঁর জামা কাপড় পর্যন্ত ভরে গিয়েছিল। কাজ করতে করতে তিনি এতই ক্ষুধার্থ হয়ে পড়তেন যে, ক্ষুধার জ্বালায় তিনি পেটে পাথর বেঁধে নিয়েছিলেন।[২১] বড় পাথর সরাবার জন্য সাহাবীগণ

তাঁকে সাহায্য করতে চাইলেন। তিনি একটি কুড়াল দিয়ে বড় পাথরটিকে ভেংগে ফেললেন এবং চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেললেন।[২২] সাহাবীদের গানের সাথে তিনিও যোগ দিলেন আর গাইলেন,

> "হে আল্লাহ, তুমি ছাড়া আমাদের কোন চালক নেই। আমরা কোন দানও করতে পারি না, আমরা তোমার সালাত তোমার নির্দেশমত আদায় করতে পারি না। সুতরাং হে আল্লাহ, আমাদের উপর শান্তি বর্ষণ কর , শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের পদক্ষেপকে সুদৃঢ় করে দাও, তারা যে অন্যায়ভাবে আমাদের উপর আক্রমণ করছে তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় রাখ, তারা আমাদের উপর আক্রমণ করলে আমাদের তাদের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় ভাবে আক্রমণের শক্তি দাও।" রাসূল (সা) তাঁর শেষ বক্তব্যটি দীর্ঘক্ষণ ধরে বললেন।[২৩]

মুসলমানগণ খনন কাজ আর মাটি বহন করতে করতে গাইতে লাগলেন। "আমরা যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন আমরা ইসলামের স্বার্থে মুহাম্মদ (সা) এর কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হলাম।" রাসূল (সা) তাদের কথা শুনে জবাবে বললেন, "হে আল্লাহ, আখেরাতের কল্যাণ ছাড়া আমরা আর কিছুই কল্পনা করিনা। *মুহাজির* ও *আনসারদের* উপর তোমার রহমত বষর্ণ কর।" কখনো কখনো রাসূল (সা) নিজেই গান ধরতেন আর সাহাবীগণ সুর ধরতেন।[২৪]

রাসূল (সা) শুধুমাত্র কথা দিয়েই সাহাবীদেরকে পরিখা খননের কাজে উৎসাহ দেননি, তিনি নিজ হাতে পরিখা খননের কাজে অংশগ্রহণ করেন। নিজ কাঁধে মাটি বহন করেন। এ জন্য সাহাবীগণ ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাদের কাজে উৎসাহ পেয়েছিলেন। মুসলমানগণ মাত্র ছয়দিনে পরিখা খননের কাজ সমাপ্ত করেছিলেন।[২৫] কুরাইশ ও ইহুদীদের মিত্ররা পরিখার স্থানে পৌছার পূর্বেই পরিখা খননের কাজ সমাপ্ত হয়।

পরিখা খননের প্রাক্কালে অনেকগুলো অলৌকিক কান্ড ঘটে। এর একটি ছিল খাবার বহুগুণে বেড়ে যাওয়া। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ দেখলেন যে, রাসূল (সা) ভীষণ ক্ষুধার্থ। তিনি তাঁর স্ত্রীকে রাসূল (সা) এর জন্য খাবার রান্নার কথা বললেন।

তিনি একটি ছাগল যবহ করেন। স্ত্রী ছোট একটি পাত্রে বার্লি রান্না করেন। রাসূল (সা) কে জাবির খাবার গ্রহণে আহবান জানান আর খাবারের পরিমাণ অল্প তাও রাসূল (সা) কে চুপিসারে জানান। রাসূল (সা) অন্যান্য মুসলমানগণকে জাবিরের সাথে খাবার গ্রহণের জন্য আহবান করেন। এক হাজার মুসলমান রাসূল (সা) এর আহবানে আসেন। জাবির ও তার স্ত্রী এতে হতবিহল হয়ে পড়েন। রাসূল (সা) খাবারের হাড়িতে দোয়া করে দেন। হাজার মুসলমানের সবাই সন্তুষ্টির সাথে খাবার গ্রহণ করেন। এর পরও হাঁড়িতে প্রচুর খাবার ছিল। জাবির নিজে খেয়েছেন এবং অন্যদেরকেও খেতে দিয়েছেন।[২৬]

রাসূল (সা) এর আরেকটি অলৌকিক ঘটনা হলো আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে ভবিষ্যতের একটি কথা বলে দেয়া। আম্মার মাটি খনন করছিলেন এ সময় রাসূল (সা) তাঁকে খবরটি দিয়েছিলেন। রাসূল (সা) তাকে বলেছিলেন, "বিদ্রোহীরা তাকে হত্যা করবে।" তাঁর এ ভবিষ্যৎবাণী সত্যে পরিণত হয়। তাকে *সিফ্‌ফিনে* হত্যা করা হয়।[২৭]

সাহাবীগণ একটি পাথর ভাঙতে পারছিলেন না। রাসূল (সা) পাথরটিতে তিন বার আঘাত করেন। পাথরটি চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যায়। প্রথম আঘাতের পর রাসূল (সা) বলেন, "*আল-াহু আকবর*। আমাকে সিরিয়ার চাবি দেয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি সিরিয়ার লোহিত বর্ণের রাজ প্রাসাদ দেখতে পাচ্ছি।" এর পর তিনি দ্বিতীয়বার পাথরটিতে আঘাত করেন এবং বলেন, "*আল-াহু আকবর,* আমাকে পার্সিয়ার চাবি দেয়া হয়েছে, আল্লাহর কসম আমি এখন আল মাদায়েনের সাদা প্রাসাদ দেখতে পাচ্ছি।" এর পর তিনি পাথরটিতে তৃতীয় আঘাত করেন এবং বলেন," *আল-াহু আকবর;* আমাকে ইয়েমেনের চাবি দেয়া হয়েছে, আল্লাহর কসম আমি আমার প্রবেশদ্বার দেখতে পাচ্ছি, আর আমি এখন এখানেই দাঁড়িয়ে আছি।"[২৮]

পরিখার পেছনে তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ছিল। প্রচন্ড ঠান্ডা ও ক্ষুধার তাড়নায় তারা সমস্যায় পড়ে যাচ্ছিলেন। এসময় রাসূল (সা) তাদেরকে কয়েকটি দেশ জয়ের পূর্বাভাস দেন। এ ব্যাপারে কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

> মুমিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল, তারা বলে উঠল, ইহাতো তাহাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছিলেন; আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল। (৩৩:২২)

মুনাফিকরা এ খবরে উপহাস করলো এবং বললো ঃ

> 'আল্লাহ ও তার রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নয়। (৩৩:২২)

মুনাফিকদের আচরণকে কোন কোন বর্ণনাকারী তাদের দুর্বল বর্ণনায় কাপুরুষোচিত, গুজব রটনাকারী এবং ঈমানদারকে নিরুৎসাহকারী হিসেবে অভিহত করেছেন। কুরআনে এ ব্যাপারে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

> এবং মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তারা বলেছিল, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নয়।'
>
> এবং তাদের একদল বলেছিল, 'হে ইয়াসরিববাসী, এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই, তোমরা ফিরে চল' এবং তাদের মধ্যে একদল নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলছিল,

আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত অথচ ঐগুলো অরক্ষিত ছিল না, আসলে পলায়ন করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।"

যদি শত্রুগণ নগরীর বিভিন্ন দিক হতে প্রবেশ করে তাদেরকে বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করতো, তারা তাতে কাল বিলম্ব করতো না।

> ত্যারা তো পূর্বেই আল্লাহর সাথে অংগীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে। বল, 'তোমাদের কোন লাভ হবে না যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর এবং সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে।'
>
> বল, 'কে তোমাদেরকে আল্লাহ হতে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের অমংগল ইচ্ছা করেন এবং তিনি যদি তোমাদেরকে অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করেন কে তোমাদের ক্ষতি করবে?' তারা আল্লাহ ব্যতীত নিজদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।
>
> আল্লাহ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণে বাধা দেয় এবং তাদের ভ্রাতৃবর্গকে বলে, 'আমাদের সংগে এসো।' তারা অল্পই যুদ্ধে অংশ নেয়।
>
> তোমাদের ব্যাপারে কৃপণতাবশত ঃ যখন বিপদ আসে তখন তুমি দেখবে, মৃত্যুর ভয়ে মূর্চ্ছাতুর ব্যক্তির মত চক্ষু উল্টায়ে তারা তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু যখন বিপদ চলে যায় তখন তারা ধনের লালসায় তোমাদেরকে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে। তারা ঈমান আনে নি, এ জন্য আল্লাহ তাদের কার্যাবলী নিষ্ফল করেছেন এবং আল্লাহর পক্ষে ইহা সহজ।
>
> তারা মনে করে সম্মিলিত বাহিনী চলে যায় নি। যদি সম্মিলিত বাহিনী আবার এসে পড়ে তখন তারা কামনা করবে যে, ভাল হতো যদি তারা যাযাবর মরুবাসীদের সাথে থেকে তোমাদের সংবাদ নিত। তারা তোমাদের সাথে অবস্থান করলেও তারা যুদ্ধ অল্পই করত। (৩৩:১২-২০)

এ আয়াতগুলোর দ্বারা *মুনাফিকদের মুনাফেকী* ও এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আয়াতগুলোতে *মুনাফিকদের* উদ্বিগ্নতা, ভীরুতা ও আল্লাহর উপর ঈমানের অভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। খুব কঠিন অবস্থায় তারা আল্লাহর প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে, তারা এসময় আল্লাহর কাছে থেকে কোন সাহায্যই কামনা করেনি। শুধু ঈমানের প্রতিই *মুনাফেকীপনা* সীমিত থাকে নি, তারা অন্যদেরকে নিরুৎসাহিত করতে থাকে এবং ভুয়া গুজব ছড়াতে থাকে। তারা রাসূল (সা) এর কাছে বিভিন্ন ছলছুতায় কর্মস্থান ও যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগের অনুমতি চাইত, তারা বলত তাদের বাড়ীঘরে শত্রুরা ঢুকে পড়তে পারে।[২৯] আসলে তারা দুর্বল ঈমানের জন্য মৃত্যু ভয়ে পিছিয়ে থাকতো ও পলায়নপর থাকত। তারা অন্যদেরকেও কর্মস্থল ও যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগে এবং নিজনিজ বাড়ীঘরে ফিরে যেতে প্ররোচিত করত। ইসলামের সাথে তারা যে অঙ্গীকার করেছিল তার প্রতি তাদের কোনই শ্রদ্ধাবোধ ছিল না।

মুনাফিকদের বাধা বিপত্তি, গুজব, দুর্ভিক্ষ ও মারাত্মক ঠান্ডা সত্ত্বেও মুসলমানগণ তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন এবং মদীনার নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন

করে যাচ্ছিলেন। পরিখা খননের কাজ শেষ হয়ে গেলে রাসূল (সা) নারী-শিশুদের ফাবি'র দুর্গে স্থানান্তর করলেন। ফাবি'র মালিক ছিল বানু হারিসা।[৩০] এটি ছিল মুসলমানদের সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ।

রাসূল (সা) তাঁর বাহিনী সংগঠিত করলেন। মদীনার[৩১] ভেতরের মা'লা পাহাড়ের দিকে পেছন করে তাদেরকে দাঁড় করালেন। পরিখা ও *মুশরিকদের* সামনাসামনি করে তাঁর বাহিনীকে প্রস্তুত করলেন। *মুশরিকরা* আল যাফরি, আল গাবাহ ও নাকসার[৩২] ভেতরে রুমায় তাদের শিবির স্থাপন করলো।

সংখ্যার দিক দিয়ে *মুশরিকরা* ছিল সুবিধাজনক অবস্থায়। তাদের সাথে ছিল ১০,০০০ যোদ্ধা।[৩৩] ইবনে সা'দের মতে কুরাইশ, আহাবিশ ও আরবদের সংখ্যা ছিল ৪,০০০। তাদের ছিল ৩০০ ঘোড়া ১, ৫০০ উট। তারা বানু সালিকের দলে যোগ দেয়। মার আল জাহরানে[৩৪] বানি সালিকের সংখ্যা ছিল ৭০০।

ইবনে জাওযীর মতে ফাজারাদের সংখ্যা ছিল ১,০০০ পুরুষ, আশজা ও বানু মুররার সংখ্যা ছিল ৪০০।[৩৫] সব মিলিয়ে ৬,৫০০; অবশিষ্ট ১০,০০০ যোদ্ধারা আসে বানু আসাদ, আর অবশিষ্টগুলো আসে গাতফান গোত্র থেকে।

ইবনে ইসহাকের মতে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩,০০০।[৩৬] বেশীর ভাগ সীরাত গবেষকই তাঁর এ হিসাবকে সমর্থন করেছেন। ইবনে হাযমের মতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৯০০।[৩৭] তিনি তাঁর এ যুক্তির পক্ষে বলেন যে, ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭০০। তাঁর যুক্তির পক্ষে তিনি বলেন, ওহুদ ও খন্দকের সময়ের দূরত্ব মাত্র এক বৎসর। এ স্বল্প সময়ে ৩,০০০ সৈন্য সংগ্রহ করা মুসলমানদের জন্য সম্ভব ছিল না।

ইবনে হাযমের মতটি *সহীহ* নয়। জাবির ইবনে আবদুল্লাহর ওয়ালিমাতে ১,০০০ জন শরীক হয়েছিলেন । সহীহ হাদীসে এর বর্ণনা আছে। মদীনার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যাদের উপর ছিল তাদের সংখ্যাই ছিল ৫০০।[৩৮] সে হিসাবে কিভাবে মুসলমানদের সংখ্যা কি মাত্র ৯০০ হতে পারে? তাছাড়া ওহুদ ও খন্দকের ঘটনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান দু'বৎসর। ওহুদের যুদ্ধে বয়সের কারণে অনেকেই যোগ দিতে পারেনি। ইত্যবসরে তাদের যুদ্ধে যোগদানের বয়স হয়েছে। মুসলমানগণ *দাওয়াতী* কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পরই সাধারণত মুসলমানগণ মদীনায় হিজরত করে থাকেন। সে হিসাবে খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি বিচিত্র নয়।

রাসূল (সা) যখন দেখলেন *মুশরিকদের* সম্মিলিত বাহিনীর সংখ্যা অনেক বেশী তখন তিনি গাতফান গোত্রের সাথে শান্তি চুক্তি করে এবং মদীনার ফসলের এক-তৃতীয়াংশ তাদেরকে দিয়ে মদীনার উপর চাপ হ্রাস করতে চাইলেন। কিন্তু রাসূল (সা) বিষয়টি নিয়ে যখন আল আউস ও আল খাজরাজের নেতা সা'দ ইবনে মুয়ায ও সা'দ ইবনে উমাদার সাথে আলাপ করেন তখন তারা বললেন, "আল্লাহর কসম, না! *জাহিলিয়াতের* সাথে আমরা এত নীচু হবো না। যে আল্লাহ আমাদেরকে ইসলাম

দিয়েছেন, আমারা কিভাবে তার সাথে এমন আচরণ করতে পারি?" আল তাবারানীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, তাঁরা বলেছিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, এটা কি উপর থেকে নাযিল হয়েছে যে আমরা আল্লাহর কথা অনুযায়ী কাজ করবো? নাকি এটা আপনার নিজের মতামত বা ইচ্ছা? এ ক্ষেত্রে আমরা আপনার কথামত চলবো। তবে আপনি যদি চান যে আমাদেরকে বাঁচতে হবে, আপনার তখন এ কথাটা বুঝা উচিৎ যে, অতীতে আমরা ও তারা সমান ছিলাম। তারা আমাদের কাছ থেকে ক্রয় না করা পর্যন্ত কোন ফসল নিতে পারতো না। তাছাড়া তাদের কেউ *মেহমান* হয়ে আসলেই তাদেরকে আমরা আপ্যায়ন করতাম।" তাদের কথা শুনে রাসূল (সা) *মুশরিকদের* সাথে আলোচনা বন্ধ করে দিলেন। এ আলোচনায় বেদুঈনদের নেতা ছিল আল হারিস আল গাতফানি। সে ছিল বানু মুররার নেতা।[৩৯]

অবস্থার অবনতি ঘটলো। বানু কুরাইযার ইহুদী মিত্ররা তাদের সাথে কৃত চুক্তি ভংগ করেছে। বানু কুরাইযার এলাকাটা ছিল মদীনার দক্ষিণে ওয়াদী মাহযুরে আল ওয়ালির এলাকায়। তাদের অবস্থানগত সুবিধাটাই মুসলমানদেরকে পেছন থেকে আক্রমণের সুযোগ করে দিয়েছিল। রাসূল (সা) আল যুবাইর ইবনে আল আওয়ামকে আলাপ আলোচনার জন্য বানু কুরাইযার কাছে পাঠালেন। তিনি ফিরে আসার পর রাসূল (সা) তাকে উদ্দেশ করে বলেন, "আমার মা ও বাবাকে তোমার মুক্তিমূল্য হিসাবে উৎসর্গের নামে বলছি। প্রত্যেক রাসূলেরই হাওয়ারী (শিষ্য) থাকে, আমার হাওয়ারী হলো আল যুবাইর।"[৪০] এর পর রাসূল (সা) সা'দ ইবনে মুয়ায ও সা'দ ইবনে উবাদাকে বানু কুরাইযার কাছে পাঠান। তারা গিয়ে দেখলেন যে তারা চুক্তি ভংগ করেছে, চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলেছে। এ সময়ে শুধুমাত্র বানু সা'না তারা দুর্গ থেকে বের হয়ে চুক্তি রক্ষায় মুসলমানদের কাছে এলো। হুয়াই ইবনে আখতাব আল নাদায়ী'র প্রচেষ্টাতেই এটা হয়েছিল। এ হুয়াই-ই কাব ইবনে সা'দ আল কারাজীকে মুসলমানদের সাথে কৃত চুক্তি ভংগে প্ররোচিত করেছিল। সে সম্মিলিত বাহিনীর শক্তির কথা তার কাছে বর্ণনা করে। সম্মিলিত বাহিনী মুসলমানদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারে বলেও জানায়। এ সময় সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, সম্মিলিত বাহিনী মদীনা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর সে তার দুর্গে ঢুকে পড়বে (এর জন্য যত রকমের শাস্তিই নেমে আসুক)। এ সংবাদ মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের ভয় হয় যে, তাদের নারী শিশুরা বানু কুরাইযার হাতে নিগৃহীত হবে।[৪১]

> দেখ, যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল হতে তোমাদের চক্ষু বিস্ফোরিত হয়েছিল, তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করেছিলে।
>
> তখন মু'মিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল। (৩৩:১০-১১)।

সম্মিলিত বাহিনী উচ্চ অঞ্চল হতে, বানুকুরাইযা নিম্ন অঞ্চল হতে সমাগত হয়েছিল। *মুনাফিকরা* আল্লাহ সম্বন্ধে বহু বাজে চিন্তা করলো। মুসলমানদের উপর

ভয়াবহ আকারে বিপদ নেমে এলো, তারা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হলো কিন্তু তাদের দৃঢ় ঈমান ও সুপ্রশিক্ষণ সকল বিপদকে দৃঢ়তা'র সাথে মোকাবেলা করে।

মদীনা রক্ষায় টহলদার বাহিনী বসানো হলো। সালমা ইবনে আসলাম আল আওসীর নেতৃত্বে ২০০ এবং যায়েদ ইবনে হারিসা'র নেতৃত্বে ৩০০ জন মদীনা টহলের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তারা মদীনা পাহারায় নিয়োজিত থাকলেন। তারা জোরে জোরে আল-হু আকবর বলতেন, *তকবীর* দিতেন (আল্লাহ সবচেয়ে মহান)। বানু কুরাইযার লোকগণ যাতে তাদের *তকবীর* শুনে সতর্ক হয় ও ভয় পায়, সে জন্যেই এভাবে *তকবীর* দেয়া হতো। বানু কুরাইযা দুর্গের মধ্যে তাদের নারী শিশুদের রক্ষার ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়লো।[৪২]

পরিখা দেখে কুরাইশরা বিস্মিত হয়ে গেল। তারা বুঝতে পারছিল না যে কিভাবে তারা এ বাধা অতিক্রম করবে। যতবারই তারা পরিখা অতিক্রমের চেষ্টা করেছে ততবারই মুসলমান বাহিনী শত্রুর উপর বৃষ্টির মত তীর বর্ষণ করছিল।

এ অবরোধ ১৪ দিন ধরে চললো।[৪৩] তীর বল্লম বিনিময়ই শুধু দু'বাহিনীর মধ্যে সংঘঠিত হয়েছিল। কাতাদার মতে এ অবরোধ একমাস ধরে চলেছিল।[৪৪] মূ'সা ইবনে উকবার মতে এটি ২০ দিন স্থায়ী হয়।[৪৫]

ইবনে ইসহাক ও ইবনে সা'দ তাদের কোন কোন বর্ণনা *সনদ* ছাড়া উল্লেখ করেন যে, কিছু সংখ্যক *মুশরিক* পরিখার প্রতিবন্ধকতাকে ভেংগে ফেলে। তারা আমর ইবনে আবদ ওয়াদুদের সাথে লড়াই করেন।[৪৬] ওয়াদুদ ছিল কুরাইশদের সবচেয়ে শক্তিশালী অশ্বারোহী। মুখোমুখী লড়াইয়ে আলীর সাথে তার মৃত্যু হয়। আল যুবায়ের নওফল আল মাখ্‌জুমীকে হত্যা করেন। আরও তিন *মুশরিক* তাদের তাঁবুতে ফিরে যায়। এরপরও *মুসলিমগণ* কোন কোনদিন যথাসময়ে আছরের সালাত আদায় করতে পারেননি। আছর সালাত তখন আদায় করা হত সূর্যাস্তের পর।[৪৭] তখনও *সালাতুল খাওফ* প্রবর্তিত হয়নি। পরবর্তিতে এটা যাত আল রিকার অভিযানের পর প্রবর্তিত হয়।[৪৮]

দীর্ঘদিন অবরোধ সত্ত্বেও আটজন মুসলমান শহীদ হন।[৪৯] তাঁদের মধ্যে ছিলেন আল আউস নেতা সা'দ ইবনে মুয়ায।

তিনি মধ্য বাহুর শিরাতে আঘাতপ্রাপ্ত হন। রাসূল (সা) মসজিদে তার জন্য একটি তাঁবু খাটান। রাসুল (সা) যাতে ঘন ঘন দেখাশুনা করতে পারেন সে জন্যই তাঁকে মসজিদে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। বানু কুরাইযাদের সাথে লড়াইয়ের পর আহত স্থান হতে পুনরায় রক্তক্ষরণের কারণে তিনি শহীদ হয়ে যান।[৫০] তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের একজন। তিনি ইসলামের জন্য অনেক বেশী উৎসর্গ করেন। তাঁর অনেকগুলো গুণ ছিল।[৫১] *মুশরিকদের* মধ্যে চারজনকে এখানে হত্যা করা হয়। খন্দকের যুদ্ধেই সবচেয়ে কম লোক হতাহত হয়। এ লড়াইয়ে উভয় পক্ষেরই লোকজন ছিল অনেক বেশী। ক্ষয় ক্ষতি কম হওয়ার কারণ পরিখা তাকায় সরাসরি লড়াই হতে পারেনি।

অবরোধ অবস্থার কারণে সম্মিলিত বাহিনীর উৎসাহে ভাটা পড়ে। বিশেষ করে তারা যে এ অবস্থার মুখোমুখি হবে এটা তাদের জানা ছিলনা। এ যুদ্ধে কুরাইশরা তাদের বাণিজ্য পথ চালুর জন্য মুসলমানদের ধ্বংস করতে চেয়েছিল। তাছাড়া তাদের পৌত্তলিকতাকে বাঁচিয়ে রাখাও ছিল আরেকটি বড় উদ্দেশ্য। মদীনা দখলের জন্য বেদুঈনরা একটি বিরাট বিজয়ের আসা করেছিল। এ যুদ্ধে ইহুদীরা যোগ দিতে চায়নি। তারা নিজেরাই সন্ধি ভংগ করলেও এ যুদ্ধের ব্যাপারে সন্দিহান ছিল। তাদের ভয় ছিল যে, সম্মিলিত বাহিনী তাদের অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে মুসলমানদের সামনে তাদেরকে একা রেখে চলে যাবে। যুদ্ধে যোগদানের জন্য কুরাইশদের কাছ থেকে পণবন্দীর দাবি জানিয়েছিল।

ইবনে ইসহাক মূসা ইবনে উকবা ও আল ওয়াকিদির বর্ণনা থেকে এ যুদ্ধে নায়িম ইবনে মাসুদ আল গাতফানি'র ভূমিকা সম্পর্কে জানান। নায়িম ছিলেন একজন নওমুসলিম, কুরাইশ, ইহুদী ও বেদুঈনরা তা জানতো না। রাসূল (সা) এর নির্দেশে নায়িম সম্মিলিত বাহিনীর মধ্যে সন্দেহের বীজ বপন করতে থাকেন।

কুরাইশদের কাছ থেকে পণবন্দী আদায়ে তিনি ইহুদীদেরকে প্ররোচিত করতে থাকেন। তা না হলে ইহুদীরা কুরাইশদেরকে ছেড়ে চলে যাবে এবং অবরোধ প্রত্যাহার করে নেবে। এর পর তিনি কুরাইশদেরকে একথা বুঝাতে থাকেন যে, ইহুদীরা পণআদায় করে মুসলমানদের কাছে তাদেরকে হস্তান্তর করে সন্ধি চুক্তি ভংগের পুরস্কার হিসাবে তা দেয়া হবে। হাদীস সূত্রে এসব বিবরণ প্রমাণিত হয়নি। তবে সীরাত গ্রন্থে[৫২] এগুলোর বিবরণ পাওয়া যায়। রাজনীতির *শরঈ* বিধি অনুযায়ী এগুলোতে বিভ্রান্তির বিষয়টি বিবেচনা যোগ্য নয়। কারণ যুদ্ধে প্রতারণার বিষয় থাকবেই।[৫৩]

এসব কিছুর পরও দীর্ঘ অবরোধের কারণে সম্মিলিত বাহিনীর উৎসাহে ভাটা পড়ে। তাছাড়া প্রচন্ড ঠান্ডাও এর একটি বড় কারণ। আল্লাহ পূর্ব দিক হতে দমকা হাওয়া দিয়ে মুসলমানদেরকে সাহায্য করেন।[৫৪] ঝড়ো বাতাসে সম্মিলিত বাহিনীর তাঁবু, তাদের রান্না বান্নার হাঁড়ি পাতিল ভেংগে চুরে যায়, তাঁবুর আগুন নিভে যায়, তাদের জীবনের থলিগুলো বালিতে ডুবে যায়। আবু সুফিয়ান সম্মিলিত বাহিনীকে যুদ্ধ ছেড়ে চলে আসতে আহবান জানাতে থাকে। এ যুদ্ধে ক্লান্তি, ও অর্থব্যয় ছাড়া কুরাইশরা কিছুই পায়নি। আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

> হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম বা ঝঞ্ঝা বায়ু এবং এক বাহিনী যা তোমরা দেখনি। তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। (৩৩:৯)।

হুযায়ফা ইবনে আল ইয়ামান ছিলেন এ ঘটনাগুলোর প্রত্যক্ষ সাক্ষী। রাসূল (সা) তাকে সম্মিলিত বাহিনীর অবস্থান দেখে আসার জন্যে পাঠান। হুযায়ফা বলেন ঃ

আহযাবের যুদ্ধে আমি রাসূল (সা) এর সাথে ছিলাম। আমরা প্রচন্ড দমকা বাতাস আর প্রচন্ড ঠান্ডায় আক্রান্ত হলাম। রাসূল (সা) বলেন, "শোন, যে (যুদ্ধ ক্ষেত্র পরিদর্শন এবং) আমাকে শত্রুর খবর এনে দেবে শেষ বিচারের দিন তার অবস্থান হবে আমার সমমর্যাদার।" তাঁর এ কথা শুনে আমরা সবাই চুপ করে থাকলাম। কেউ তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না। রাসূল এ কথা দু'বার উচ্চারণ করলেন। তাঁর কথায় কেউ কোন জবাব দিল না। এরপর তিনি বলেন ঃ "উঠো হুযায়ফা, আমাকে শত্রুর খবর দাও," তিনি যখন আমাকে নাম ধরে ডাকলেন আমি না উঠে পারলাম না। তিনি বললেন, "যাও, শত্রুদের খবরাখবর নিয়ে এস, এমন কিছু করো না যে শত্রুরা আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপে যাবে।" আমি যখন তার কাছ থেকে চলে এলাম, আমার উষ্ণতা বোধ হলো। আমি যেন গরম পানির মধ্য দিয়ে হাঁটছিলাম। আমি শত্রুদের কাছে পৌঁছা পর্যন্তই এমন মনে হচ্ছিল। আমি দেখলাম আবু সুফিয়ান আগুনের কাছে তার পিঠ গরম করছে। আমি ধনুকের অগ্রভাগে একটি তীর ফিট করলাম। তাকে গুলি করতে চাইলাম। এ সময় আমি রাসূল (সা) এর কথা মনে করলাম ঃ

"তাদেরকে আমার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করোনা।" আবু সুফিয়ানকে যদি গুলি করতাম তা হলে রাসূল (সা) কে গুলি করা হতো। কিন্তু আমি এ অবস্থা থেকে ফিরে এলাম এবং (যেন গরম অনুভব করছিলাম) মনে হচ্ছিল যেন আমি গরম একটি গোসলখানার মধ্যে দিয়ে হাঁটছিলাম। তাঁর কাছে আমাকে পেশ করার পূর্বেই আমি শত্রুদের খবরাখবর তাঁকে দিলাম। যখন আমি খবরটি তাঁকে দিলাম আমি শীতল অনুভব করলাম। রাসূল (সা) আমাকে তাঁর একমাত্র কম্বলটি দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। এ কম্বলটিই ছিল তাঁর অতিরিক্ত। সালাতের সময় এটি গায়ে জড়িয়ে রাসূল (সা) আমাকে তাঁর একমাত্র কম্বলটি দিয়ে জড়িয়ে সালাত আদায় করতেন। আমি এ অবস্থাতেই সকাল পর্যন্ত ঘুমালাম। এ সময় তিনি বললেন, "উঠো, গভীর নিদ্রাকারী।"[৫৫]

বায্যারের বর্ণনা অনুযায়ী হুযায়ফা যখন রাসূল (সা) এর কাছে আসেন তখন তিনি বলেছিলেন, "হে রাসূল, লোকেরা আবু সুফিয়ানকে ছেড়ে চলে গেছে। অনেকে ছত্রভংগ হয়ে গেছে। অল্পকিছু লোক তার সাথে আছে, তারা আলো জ্বালাতে চাচ্ছে। আমরা যেমন প্রচন্ড ঠান্ডার সম্মুখীন হয়েছি, তাদেরকেও একই রকম ঠান্ডায় আক্লিষ্ট করা হয়েছে। তবে আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের জন্য আশার বিষয় আছে কিন্তু তাদের কিছুই নেই।"[৫৬]

আল্লাহ কাফেরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন। যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট ছিলেন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। (৩৩:২৫)

মুশরিকদের অবরোধের সময় রাসূল (সা) আল্লাহর কাছে যে আবেদন করেছিলেন আল্লাহ তার জবাব দেন ঃ

"হে আল্লাহ, তুমিই কিতাব নাযিল করেছ, তুমিই দ্রুত হিসাব গ্রহণ করতে জান। সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত কর। হে আল্লাহ, তাদেরকে পরাভূত কর। তাদেরকে বিপদাপন্ন কর।"[৫৭] রাসূল (সা) সম্মিলিত বাহিনীর মদীনা আক্রমণের পর পরাজয়ের তাৎপর্যপূর্ণ বর্ণনা দেন। তারা মদীনা আক্রমণের জন্য তাদের বাহিনীকেও বাড়িয়েছিল। তারা তাদের সাধ্যমত করেছিল, তারা আক্রমণকালে বলেছিল, "আমরা, এখন তাদেরকে আক্রমণ করবো, তারা আমাদেরকে আর আক্রমণ করার সাহস পাবে না। আমরা তাদের[৫৮] (মুসলমান) ভূ-খন্ডে গিয়ে লড়াই করব," এর থেকে বুঝা যায় সম্মিলিত বাহিনীর মদীনা আক্রমণের ভাবনা থেকে মুসলমানদের রণকৌশল বদলে যায়। এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় ঘটনা প্রবাহ মদীনা থেকে অন্যত্র চলে যায়। এ পরিবেশে মুসলমানদের রাজধানী মদীনা থেকে মক্কা, তায়েফ, তাবুক পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়।

খন্দকের সাথে অন্যান্য অভিযান

খাব্‌ত বা *সাইফ আল বাহার* অভিযান

মুসলিম বাহিনী বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে। মুসলমানগণ কুরাইশদের উপর অর্থনৈতিক অবরোধকে আবার গলাচিপে ধরে । রাসূল (সা) ৩০০ লোকসহ উপকূলের কাছে কুরাইশদের বাণিজ্য দলকে বাধা দেয়ার নিমিত্তে ওৎ পেতে বসে থাকার জন্য আবু উবায়দা ইবনে আল যাররাকে পাঠান। তারা এ অভিযানে গিয়ে এমনভাবে ক্ষুধাক্রান্ত হন যে, তারা খাবত্ (মরুভূমির এক প্রকার কাঁটা জাতীয় গাছের পাতা) খেতে বাধ্য হন। এবং পর থেকে তারা যয়েশ আল খাব্‌ত নামে (খাব্‌ত এর বাহিনী) খ্যাত হন। তারা অনেকগুলো উট যবহ করেন। কিন্তু আবু ওবায়দা তাদেরকে নিষেধ করেন। কারণ যুদ্ধের জন্য উটের প্রয়োজন ছিল। এ সময় সাগর থেকে একটি প্রকান্ড তিমি পানিতে ভেসে এলে তারা এর মাংস অর্ধমাস ধরে খান। তারা এর কিছু অংশ মদীনায় নিয়ে যান। রাসূল (সা)ও তিমির মাংস খান।[৫৯]

এ অভিযানটিই সম্ভবত শেষ অভিযান। মক্কার বাণিজ্য পথে বাধা দেয়ার জন্যই অভিযানটি পরিচালিত হয়েছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধির সাথে এ অভিযান বন্ধ করা হয়। অভিযানগুলো মক্কার ব্যবসা বাণিজ্যের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। আবু সুফিয়ান এটাকে বলেছিল, "যুদ্ধটি আমাদের উপর প্রচন্ড আঘাত হানে।"[৬০]

পাদটীকা ঃ

১. ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া, ৪/৯৩; আলওয়াকিদি, মাগাযী*, ২/৪০০।

২. ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৪/৯৩; *সহীহ আল বুখারী*, ৫/৪৪, এখানেই তিনি মূসা ইবনে উকবার বর্ণনা বর্ণনা করেন; ইউসুফ ইবনে সুফিয়ান, *আল মারিফা ওয়া আল তারিখ*, ৩/২৫৮।

৩. ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারি*, ৭/৩৯৩

৪. ইবনে হাযম, *যওয়ামী আল সীরাহ*, ১৮৫

৫. সহীহ আল বুখারী, ৫/৮৯।

৬. আল বায়হাকী, *দালায়েল আল নবুওয়াত*, ১২২ বিং ইবনে হাজার, ফাতহুর বারী, ৫/২৭৮

৭. ইবনে হিশাম, *আলরীবাহ*, ৩/২১৪, উরওয়া সহীহ সনদ সহকারে বর্ণনা করেন, তবে এটি তাঁর একটি *মুরসাল হাদীস*।

৮. ইবনে হাজার, ফাতহুর বারী, ৭৩৯৩।

৯. প্রাগুক্ত, সনদ ছাড়াই মূসা ইবনে উকবাহ হতে বর্ণিত।

১০. ইবনে হিশাম, আল *সীরাহ*, ২/২১৯-২২০, সনদ ছাড়াই ইবনে ইসহাক হতে বর্ণিত। তিনি একটি বর্ণনা মূসা ইবনে উকবাহ হতে বানু আসাদের কথা উল্লেখ করেন (*ফাতহুর বারী*, ৭/৩৯৩)।

১১. ইবনে তাইমিয়্যা, মাজদ আল দীন আবদ আল সালাম ইবনে আবদ আল্লাহ, *আল সিয়ামা আল শারিয়্যা*, ১৩৪।

১২. সনদ ছাড়াই প্রথম যুগের পন্ডিত তিনি এব্যাপারে আবু মাশার আল সিন্দী (মৃ. ১৭১ হি)'র কথা বর্ণনা করেন (*ফাতহুর বারী*, ৭/৩৯৩) আল ওয়াকিদি, *মাগাযী*, ২/২৪৫, *সনদ* ছাড়া, ইবনে হিশাম, সীরাহ, ২/২২৪।

১৩. ইবনে সা'দ, *আল তাবাকাত আল কুবরা*, ২/৬৬-৭

১৪. এব্যাপারে হাদীসের প্রেক্ষাপটে কোন বর্ণনাই *সহীহ* বলে প্রমাণিত নয়। তবে কিছু কিছু দুর্বল বর্ণনা (*আসার*) ও বর্ণিত হয়েছে যেগুলোকে এ বিষয়গুলোতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। আল হায়সামি। *মাজমা আল জাওয়ায়িদ*, ৬/১৩০; আল তাবারী, *তফসীর*, ২১/৩৩; ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৭/৩৯৭।

১৫. প্রাগুক্ত।

১৬. ইবনে সা'দ, *আল তাবাকাত আল কুবরা*, ২/৬৬-৭; আল সাফারানী মুহাম্মদ ইবনে আহাম্মদ আল নাবুলসি আল হাম্বলি, সীরাহ সুলা যিয়্যাত মুসনাদ আহমাদ, ১/১৯৯-২০০।

১৭. *সহীহ আল বুখারী*, ৫/৪৫। ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৭/৩৫৯।

১৮. ইবনে হাজার *ফাতহুর বারী*, ৭/৩৯২-৩, আল বুখারীর *সহীহ মতন* ভাষ্য হতে।

১৯. ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৪/৯৯, তিনি বলেন যে, ইবনে ইসহাক এর বর্ণনা করেন। এটি মুনকাতি।

২০. ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৭/৩৯৫, *সহীহ আল বুখারী হতে*।

২১. সহীহ আল বুখারী, ৫/৪৭; সহীহ মুসলিম, ৩/১৪৩০; ইবনে হাজার ফাতহুর বারী, ৭/৩৯৫।

২২. *সহীহ আল বুখারী*, ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৭/৩৯৫।

২৩. প্রাগুক্ত, ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৭/৩৯৯।

২৪. *সহীহ আল বুখারী*, ৫/৪৭; "*আল ইসলাম*" এর পরিবর্তে আল "*জিহাদ*" সহকারে।

২৫. আল সামহুদী, আল ইবনে আবদ আল্লাহ, *ওয়াফা আল ওয়াফা*, ৪/১২০৮-৯।

২৬. *সহীহ আল বুখারী*, ৫/৪৬; মুসলিম, ৩/১৬১০।

২৭. *সহীহ মুসলিম*, ৪/২২৩৫।

২৮. আহমাদ ও আল নাসাই এর বর্ণনা হতে। আল হাফিয ইবনে হাজার বলেন, তাদের সনদগুলো ছিল হাসান। প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে আল বারা ইবনে আযীব এর কথা উল্লেখযোগ্য (*ফাতহুর বারী*, ৭/৩৯৭)। এ ছাড়া আল তাবারানী (*আল মুযাম আল কবির*) ও এটি বর্ণনা করেন (*আল মুজাম আল কবির*, ১১/৩৭৬)। আল হায়সামী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ও নায়মাল আনসারি (মাজমা আল জাওয়ায়েদ, ৬/১৩১) ছাড়া এর উল্লেখকারীগণ ছিলেন *সহীহ*। আবদ্ আল্লাহ্ ইবনে আল ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল হলেন *সিকাহ*, তবে আমি নাইম'র জীবনী দেখিনি। দেখুন, আহমাদ *আল মুসনাদ*, ৪/৩০৩। তাঁর সনদের মধ্যে রয়েছে মায়মুন আল বসরি, সনদটি জয়িফ, তবে আল হাফিয ইবনে হাজার এটি *সনদ হাসান* বলেছেন।

২৯. *সহীহ মুসলিম*, ৪/১৮৭৯।

৩০. তাবারানি কর্তৃক বর্ণিত (আল হায়সামী। *মাজমা আল জাওয়ায়েদ*, ৬/১৩৩)। তিনি বলেন, "এ মানুষগুলো ছিলেন *সিকাহ*।" এর মধ্যে আল তাবারানির শায়েখ অন্তর্ভুক্ত এবং যে শায়েখের জীবনীগুলো আমি দেখিনি, হুরাইর আল আনসারী হলেন *মকবুল;* এভাবে সনদটি *জয়িফ*, তবে এর মধ্যে দুর্গসমূহের বিবরণ পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা এটিকে মৌনতার সাথে গ্রহণ করতে পারি। ইবনে ইসহাকও এর বর্ণনা করেন (আল তাবারী, তারিখ আল রাসূল ওয়া আল মুলুক, ২/৫৭০-১)

৩১. আল সাফারানি, মাযদ আল দীন মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব, সীরাহ আল সুলাসিয়াত মুসনাদ আহমাদ, ১/১৯৯-২০০। ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ২/২২০; আল ফয়রুজাবাদী, আল মুগানিম আল আল- মুতাবাহ, ১৩৪। ইবনে ইসহাকের আল গাবার বদলে জাকাবা বলে ইবনে ইসহাকের বক্তব্যের সাথে দ্বিমত প্রকাশ করেন নি। কারণ, আল গাবাহ হলো জাগাবার উত্তরে এবং এটি এর কাছাকাছি (ইবনে হিশাম, *আল সীরাহ*, ২৩/২১৫)।

৩২. আল তাবারী, *তাফসীর*, ২১/১২৯-১৩০, উরওয়া ও অন্যান্যদের *মুরসাল* বর্ণনা হতে।

৩৩. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ২/২১৫, সনদ ছাড়া, আল তাবারি, *তাফসীর*, ২১/১২৯-১৩০, উরওয়াহ ও অন্যান্য সূত্র হতে মুরসাল হিসাবে বর্ণিত; ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারি* ৭/৩৯৩, সনদসহ ইবনে ইসহাক হতে বর্ণিত।

৩৪. ইবনে সা'দ *আল তাবাকাত আল কুবরা*, ২/৬৬।

৩৫. ইবনে আল জওযী, আল ওয়াফা বি আখবার আল মুস্তাফা, ৬৯২।

৩৬. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ২/২২০, সনদ ছাড়া।

৩৭. ইবনে হাজাম, *জওয়ামী আল সীরাহ*, ১৮৭।

৩৮. ইবনে সা'দ, *আল তাবাকাত আল কুবরা*, ২/৬৭

৩৯. আল হায়সামী, *কাশফ আল আসবার*, ১/৩৩২, আবু হুরায়রা এর *হাসান সনদ সহকারে* আল বায্যার কর্তৃক বর্ণিত। আল তাবারানিও হাসান সনদ সহকারে এর বর্ণনা করেন। এর সাথে মুহাম্মদ ইবনে আমর আল সীয়শও অন্তর্ভুক্ত। লায়সী *সাদুক* হলেও তাঁর ভ্রান্তি আছে, দু'টো বর্ণনাই তাঁর উপরে নির্ভরশীল। আল তারাবানির ভাষ্য সাদ্দের ভাষ্য বর্ণিত, যেমন, সা'দ ইবনে মুয়ায ও সা'দ ইবনে উবাদা যাদের কথা রিপোর্টে বর্ণিত হয়েছে। তিনি সা'দ ইবনে আল রাবি, সা'দ ইবনে খায়সা, সা'দ ইবনে মাসউদ-এর নামও তিনি বর্ণনা করেন। এটা ছিল ভুল কারণ ইবনে আল রাবি ওহুদে শহীদ হন এবং ইবনে খায়সামা বদরযুদ্ধে শহীদ হন। বর্ণনা সহীহ হলে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইবনে মাসুদ এর সাথে আলোচনা করা হয়েছিল। (আল ইসাবা, ২/৩৬)।

৪০. ইবনে হাজার, ফাতহুর বারী, ৭/৮০, ৬/৫২, আল বুখারীর ভাষ্য হতে।

৪১. ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৪/১০৩, সনদ ছাড়া মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও মূসা ইবনে উকবা হতে বর্ণিত। প্রমাণিত ঘটনা হলো বানু কুরাইযার বিশ্বাসঘাতকতা।

৪২. ইবনে সা'দ, *আল তাবাকাত আল কুবরা*, ২/৬৭, সনদ ব্যতীত।

৪৩. প্রাগুক্ত, ২/৭৩, সনদসহ হলেও এর বর্ণনা কারীগণ *সিকাহ*, সা'দ ইবনে আল মুসায়্যাব এর *মারাসিল*, তার মারাসিল শক্তিশালী। কোন সঠিক সংখ্যার বর্ণনা ছাড়াই ইবনে ইসহাক ও একুশে বেজোড় রাতের কথা বলেছেন। ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ৩/২২৪;

৪৪. *আল তাবারী তাফসীর*, ২১/১২৮, *হাসান সনদসহ*, তবে এটি কাতাদা'র মারাসিল হতে বর্ণিত এবং ইবনে আল কাইয়্যিম কর্তৃক গৃহীত (জা'দ আল মা'দ, ২/১৩১)।

৪৫. ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৩/৩৯৩, সনদ ছাড়া।

৪৬. ইবনে হিশাম, *আল সীরাহ আল নবাবিয়াহ*, ২/২২৪; ইবনে সা'দ, *আল তাবাকাত আল কুবরা*, ২/৬৮। আল তাবারী আলীর সাথে আমর ইবনে আবদ ওয়াদুদের লড়াইকে আল জুহরীর *মুরসাল* হতে বর্ণনা করেন। তার মারাসিল দুর্বল। সনদ সহকারে ইকরামার মুরসাল হতে যার বর্ণনাকারীগণ *সিকাহ* (*তারিখ আল উমাম ওয়া আল মূলুক*, ৩/৪৮; *কানজুল উম্মুল*, ১০/৪৫৫)। হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে এঘটনাটিকে সহীহ প্রমাণের প্রয়োজন নেই। এর কারণ, বর্ণনাগুলো সুপরিচিত হতে পারে। যুদ্ধটিকে হাজার হাজার যোদ্ধা অবলোকন করেছেন।

৪৭. ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ২/৬৮, ৭২, ১২৩, ৪৩৪, ৫/৯২

৪৮. প্রাগুক্ত। ৭/৪২১-৪।

৪৯. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ৩/২৫৩।

৫০. *সহীহ আল বুখারী*, ৫/৫১।

৫১. তার মৃত্যুতে সিংহাসন (*আল আরশ*) কেঁপে উঠে, বেহেশতে তার রুমাল রেশমের চেয়েও উন্নত (*সহীহ* আল বুখারী,*মানাকিব আল আনসার*, ১২; *সহীহ, মুসলিম*, ৪/১৯১৫, ১৯১৬)

৫২. ইবনে হিসাম, *আল সীরাহ আল নওয়াবিয়্যাহ*, ২/২২৯-২৩০, সনদ ছাড়া ইবনে ইসহাক হতে বর্ণিত; আল ওয়াকিদি *আল মাগাযি*, ২/৪৮ ডি ১-২, ৪৮৫; ইবনে কাসির আল বিদ্যায়া ওয়া আল নিহায়া ৪/১১৩।

৫৩. *সহীহ আল বুখারী, আল জিহাদ*, ১৫৭। মুসলিম, *সহীহ, আল জিহাদ*, ১৮।

৫৪. *সহীহ আল বুখারী*, ৫/৪৭; *সহীহ মুসলিম*, ২/৬১৭।

৫৫. *সহীহ মুসলিম*, ৩/২৭৪-৫।

৫৬. আল হায়সামী, *কাসফ আল আসতার*, ২/৩৩৫-৬।

৫৭. *সহীহ মুসলিম*, ৩/১৩৬৩।

৫৮. *সহীহ আল বুখারী*, ৫/৪৮।

৫৯. আল বুখারী ও মুসলিম (*জা'দ আল মা'দ* ২/১৫৮৮)। ইবনে আল কায়্যিমের বর্ণনায় ইবনে সাইয়্যিদ আল না'স হিজরীর অষ্টম বৎসরের রজবে *সারিয়্যার* তারিখকে ভুল বলেছেন। এর কারণ পবিত্র মাস সমূহে কোন অভিযান বা সারিয়্যা প্রেরিত হয়নি। হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলে মুসলমানদেরকে কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলাতে আক্রমণের ক্ষমতা বাতিল করা হয়েছিল। অবশ্যই শান্তি চুক্তির পূর্বে *সারিয়্যাত* আল খাব্ত হয়েছিল, এবং আমার বর্ণনা মতে খন্দকের তাৎক্ষণিক পূর্বেই এটি হয়ে থাকতে পারে।

৬০. ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ১/৩৪। ৮/৭৯ এ তিনি আরেকটি সম্ভাবনার কথা বর্ণনা করেন যে, তারা বাণিজ্য কাফেলাকে আটকাতে যাননি, তারা গিয়েছেন বাণিজ্য দল বা কাফেলাকে জুহায়নাদের হাত থেকে বাঁচাতে। আমি এ সম্ভাবনাকে গ্রহণ করি না, কারণ জুহায়না অল্প কিছুদিন আগেই ইসলাম কবুল করেছিলেন। তিনি মুসলমানদের চুক্তির সাথে জড়িয়ে ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তারা কুরাইশ বণিকদলকে কোন বাধা দেননি; বরং তাদের সাথে ঐসময়ে মুসলমানও কুরাইশ উভয়েরই সৎ সম্পর্ক বিরাজমান ছিল। কারণ উভয়ের সাথেই তাদের স্বার্থ জড়িত ছিল। (দেখুন, আহমাদ *আল মুসনাদ*, ১/১৭৮; ইবনে হিশাম, ১/৫৯৫)। আল হাফিজের মতে ঘটনাটা মক্কা মুক্ত করার কিছুদিন পূর্বেই ঘটেছিল (*ফাতহুর বারী*, ৮/৯৭)।

অধ্যায় ৮

হুদায়বিয়া অভিযান

আল হুদায়বিয়া একটি কূপের নাম। এটি মক্কার ২২ কি মি উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। বর্তমানে এটি আল শুমায়সি নামে খ্যাত। এখানে রয়েছে আল হুদায়বিয়ার বাগান ও রিদওয়ানের[১] মসজিদ। হুদায়বিয়ার আশপাশের এলাকা মক্কার হারাম এলাকাকে ঘিরে আছে। তবে হুদায়বিয়ার বেশীরভাগ স্থানই *হারামের* বাইরে বিধায় অভিযানটিকে হুদায়বিয়া নামেই নামকরণ করা হয়। কেননা কুরাইশরা হুদায়বিয়ায় থাকাকালীন মুসলমানগণকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেয়নি।[২]

রাসূল (সা) হিজরীর ষষ্ঠ বৎসরের জ্বিলকদ মাসের শুরুতে সোমবার হুদায়বিয়ায় যান।[৩] তাঁর এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল উমরাহ[৪] করা। কাবার প্রতি মুসলমানদের সত্যিকারের অনুভূতি ও সম্মান জানানোও ছিল এর উদ্দেশ্য। এ ছাড়া কুরাইশদের শত্রুতামূলক প্রচার প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে একটি জবাব দেয়া এবং মুসলমানগণ কাবাকে সম্মান করে না কুরাইশদের এরূপ প্রচারের সমুচিৎ জবাব দেয়াও ছিল রাসূল (সা)-এর এ সফরের উদ্দেশ্য।

এ অভিযানের ফলে আরব উপদ্বীপে মুসলমানদের শৌর্যবীর্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। তাদের সম্মিলিত বাহিনীর পরাজয়ের পর এটি বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। কুরাইশ কর্তৃক মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে না দেয়া এবং তাদেরকে উমরাহ করতে না দেয়ার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে রাসূল (সা) মনে করেছিলেন কুরাইশরা তাঁকে বাধা দেবে, এমনকি তাঁর সাথে যুদ্ধও বাধিয়ে দিতে পারে। সেজন্য রাসূল (সা) বহু সংখ্যক মুসলমান নিয়ে মক্কায় যেতে চেয়েছিলেন। যাযাবর বেদুঈনদেরকে তিনি তাঁর সাথে লড়াইয়ের আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু তারা তাঁকে অপেক্ষা করার কথা বলে, সেজন্য রাসূল (সা) *আনসার* ও *মুহাজিরদেরকে* সাথে নিয়ে তাদের সাথে লড়াইয়ের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। কুরআনে বেদুঈনদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

> যে সকল আরব মরুবাসী গৃহে রয়ে গেছে তারা তোমাকে বলে, 'আমাদের সম্পদ ও পরিবার পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' তারা মুখে যা বলে তা তাদের অন্তরে নেই। তাদেরকে বল, 'আল্লাহ তোমাদের কারোর কোন ক্ষতি কিংবা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করলে কে তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারে?' বস্তুত ঃ তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অভিহত।
>
> না তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রাসূল ও মু'মিনগণ তাদের পরিবার পরিজনের নিকট কখনই ফিরে আসতে পারবে না এবং এ ধারণা তোমাদের অন্তরে প্রতিবার মনে হয়েছিল, তোমরা মন্দ ধারণা করেছিলে, তোমরা তো ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়। (৪৮: ১১-১২)

উপর্যুক্ত আয়াতে বর্ণিত যে বেদুঈনদেরকে মুজাহিদ বলা হয়েছে তারা ছিলেন মদীনায়[৫] বসবাসরত জুহায়না ও মাজিনা নামে দু'গোত্রের লোক। এ গোত্রের লোকেরা মনে করেছিল যে কুরাইশরা মুসলমানদের বিরোধিতা করবে ও তাদের সাথে লড়াই করবে। মুসলিমরা লড়াইয়ের উদ্দেশে তাদের সাথে তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নেয়।[৬] আল ওয়াকিদি এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন।[৭] তাঁর মতে মুসলিমরা কোন অস্ত্রশস্ত্র বহন করে নিয়ে যায়নি।

হুদায়বিয়া অভিযানে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১,৫০০ জন। অনেক প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবীর রিপোর্টে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ঃ জাবির ইবনে আবদ আল্লাহ, আল বারা ইবনে আযিব, মাকাল ইবনে ইয়াসার, সালামা ইবন আল আকওয়া[৮] ও আল মুসায়্যাব ইবনে হাযন।[৯] এক রিপোর্টে জাবির বলেন, তাদের সংখ্যা ছিল ১,৫০০ জন।[১০] আবদ আল্লাহ ইবনে আবু আওফার মতে তাদের সংখ্যা ছিল ১,৩০০ জন। পাঁচজন প্রত্যক্ষদর্শীর মতে তাদের সংখ্যা ছিল ১৩০০। এ বর্ণনা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। অন্য বর্ণনাগুলোর মধ্যে পার্থক্য তেমন বেশী নয় এবং সেগুলো আন্দাজ করাও কষ্টকর নয়।[১১]

মুসলমানগণ *জুল হুলায়ফায় সালাত* আদায় করেন ও *উমরাহর* উদ্দেশে *ইহরাম* বাঁধেন।[১২] কুরবানীর জন্য তারা ৭০টি পশু সাথে নিয়ে যান।[১৩] রাসূল (সা) বুসর ইবনে সুফিয়ান আল খুজাই আল কাবি[১৪] নামের জনৈক ব্যক্তিকে গোয়েন্দা হিসাবে মক্কায় পাঠান।

মুসলমানগণ মদীনা থেকে ৭৩ কি মি দূরে আল বাওয়ায় পৌছে আবু কাতাদা আল আনসারিকে পাঠান। কাতাদা ইহরামরত অবস্থায় ছিলেন না। তাঁর সাথে ছিলেন এক দল সাহাবী। তারা লোহিত সাগর উপকূলে যান। এখানে কিছু *মুশরিক* অবস্থান করছিল। তারা মুসলমানদের উপর হঠাৎ আক্রমণ করতে পারে এমন আশঙ্কা করা হয়েছিল। আবু কাতাদা তাদের জন্য একটি জেব্রা শিকার করেন। অন্যরা এ সময় ইহরামরত থাকায় কোন পশু হত্যা করতে পারতোনা। তারা জেব্রার গোশত খেলেন। এর পর তারা ভাবতে লাগলেন কাজটি কি ভাল হয়েছে, বৈধ হয়েছে? তারা যখন মদীনা হতে ১৮০ কি মি দূরে আল মুকিয়ায় রাসূল (সা) এর সাথে দেখা করেন তাকে তখন এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। রাসূল (সা) তাঁর সাথীদেরকে যতদিন তারা শিকার করতে পারবে না ততদিন এভাবে জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়ার অনুমতি দেন।[১৫]

মুসলমানগণ মক্কা থেকে ৮০ কি মি দূরে আসাফান না পৌছা পর্যন্ত হাঁটতে লাগলেন। বুসর ইবনে সুফিয়ান আল কাবি তাদের কাছে কুরাইশদের খবর এনে দিলেন। তিনি তাদেরকে জানান যে, কুরাইশরা জানতে পেরেছে যে, তারা (মুসলমানগণ) আসছেন, সে জন্য তারা (কুরাইশ) মক্কা প্রবেশে বাধা দেয়ার জন্য একটি সেনাবাহিনীর সমাবেশ ঘটায়। এ খবর শুনে খালিদ ইবন আল ওয়ালিদ মক্কা থেকে ৬৪ কি মি দূরে কিরা আল গামিম-এর উদ্দেশে একটি আশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। রাসূল (সা) শত্রুদের এলাকা আক্রমণ করবেন কিনা এ ব্যাপারে তাঁর

সাথীদের সাথে আলাপ করলেন। আলোচনার পর রাসূল (সা) তাদের সাথে বেরিয়ে পড়েন এবং কুরাইশদের বিতাড়নে অংশগ্রহণ করেন আর তাদেরকে নিজ নিজ ভূ-খন্ডে পাঠিয়ে দেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ

> "হে মানুষ, তোমরা আমাকে তোমাদের মতামত দাও। তোমরা কি আমাকে অনুমতি দাও যে আমি ঐ জনপদের পরিবার পরিজন, শিশুদের ধ্বংস করে দিই যারা আমাদেরকে কাবা ঘরে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে চায়? তারা যদি (শান্তির উদ্দেশে) আমাদের কাছে আসে, আল্লাহ তখন মুশরিকদের একটি গুপ্তচরকে ধ্বংস করে দেবেন, অথবা আমরা তাদেরকে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন করবো।"

একথা শুনার পর আবু বকর বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কাবাঘর যিয়ারতে এসেছেন, আপনি কাউকে হত্যা করতে বা কারও সাথে যুদ্ধ করতে আসেননি। সুতরাং আপনি এগিয়ে যান, কেউ আমাদের প্রতিরোধ করলে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব।" এর পর রাসূল (সা) বলেন, "আল্লাহর সাথে এগিয়ে যাও।"[১৬] রাসূল (সা) প্রায়ই তাঁর সাথীদের সাথে আলোচনা করতেন।

আসাফানে রাসূল (সা) তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে সালাতুল খাওফ আদায় করেন। মুশরিক অশ্বারোহী বাহিনীর অবস্থান জানতে পেরে রাসূল (সা) এ সালাত আদায় করেন।[১৭] এটাই ছিল রাসূল (সা) এর প্রথম *সালাতুল খাওফ*।[১৮] পূর্ববর্তী মতামতে যাত-আল রিকার অভিযানকে খায়বারের পরে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে–এবং এটাই সঠিক।[১৯] আল ওয়াকিদি, ইবনে ইসহাক যারা পূর্ববতীদের সাথে একমত হয়েছেন এ মতামতের সাথে তারা একমত হতে পারেননি।[২০] এর কারণ আবু মূসা আল আশাআরী ও আবু হুরায়রা রাসূল (সা) এর কাছে খায়বার জয়ের পরে এসেছিলেন, পূর্বে নয়। তারা উভয়েই যাত আল রিকার অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[২১] এ অভিযান অবশ্যই খায়বার অভিযানের পরেই সংগঠিত হয়েছিল। *সালাতুল খাওফ* হুদায়বিয়ার আসাফানে আদায় করা হয়েছিল। এর কারণ শান্তি চুক্তির পরপরই এ সালাত আদায় করা হয়। এ সময়ে মক্কায় ও এর আশে পাশে স্বাধীনতা অর্জিত হওয়া পর্যন্ত কোন যুদ্ধ সংঘঠিত হয়নি।

রাসূল (সা) সানিয়া আল মুরার-এর মধ্যদিয়ে এক কঠিন পথ ধরে হুদায়বিয়ার একটি ঢাল দিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি বলেন, "যে মুরার পর্বতে আরোহন করবে, বনি ইসরাইলীদের ন্যায় তাদের পাপ মার্জনা করে দেয়া হবে।" বানু খাজরায এর অশ্বারোহীই প্রথমে পর্বতে আরোহন করেন।[২২]

রাসূল (সা) খালিদ ইবনে আল ওয়ালিদ ও মুশরিক অশ্বারোহীদের সাথে লড়াইকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর বাহিনীর পথ পরিবর্তন করেন। খালিদ এ সংবাদ পাওয়ার পর মক্কায় ফিরে আসে। কুরাইশরা বের হয়ে এসে একটি জলাধারের পাশে বলদায় তাদের শিবির স্থাপন করে। মুসলিমগণ উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই তারা এখানে এসে হাযির হয়। রাসূল (সা) যখন হুদায়বিয়ায় এসে পৌছেন, তাঁর মাদী উটটি বসে পড়ে।

এ অবস্থা দেখে রাসূল (সা) এর সাথীগণ বলেন, "উটটি আর উঠে দাঁড়াবে না।"[২৩] রাসূল (সা) বলেন, "উটটি তো না করেনি, এটা তার স্বভাবও নয়, তবে যে মক্কা থেকে উটটিকে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছে সে আবার তাকে ফিরিয়ে নিচ্ছে।" এর পর রাসূল (সা) বলেন, "যার হাতে আমার জীবন তার শপথ করে বলছি, কুরাইশরা আমার কাছে যা-ই অনুরোধ করুক, আল্লাহর কাছে অলংঘনীয় বিষয়ের পবিত্রতা সমুন্নতকারী এমন বিষয় হলে আমি সেটা মঞ্জুর করবো।"[২৪] এর পর রাসূল (সা) তার অভিযানের দিক পরিবর্তন করে মক্কায় না গিয়ে হুদায়বিয়ার দূরবর্তী স্থানের দিকে যান। এখানে তিনি একটি ছোট কূপের কাছে তার তাঁবু খাটান। কূপটিতে খুব অল্প পরিমাণ পানি ছিল। মুসলমানগণ পানি চাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর তূণীর ভেতর থেকে একটি তীর বের করলেন। তিনি সাথীদেরকে কূপের ভিতর তীরটি নিক্ষেপ করতে বললেন। তীর নিক্ষেপের পর সাথীদের পানির তৃষ্ণা নিবারিত না হওয়া পর্যন্ত কূপের পানি শেষ হচ্ছিল না।[২৫] এ অভিযান কালে কূপের পানি বেড়ে যাওয়া ছিল রাসূলের একটি অলৌকিক ঘটনা।

রাসূল (সা) কুরাইশদেরকে জীবিত রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন তারা ইসলাম কবুল করে ইসলামের সম্পদে পরিণত হবে। এব্যাপারে, "মানুষ হলো ধাতব পদার্থের মত, জাহিলিয়া যুগে তাদের মধ্যে যারা জাহাল হিসাবে সবচেয়ে ভাল ছিল সে ইসলাম কবুলের পর ইসলামকে বুঝতে পারলে সবচেয়ে ভাল মুসলমান হবে।" কুরাইশরা ছিল সবচেয়ে বেশী বাগ্মী ও আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিমান। তারা ছিল সবচেয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ও মর্যাদাবান। তারা ইসলাম কবুল করবে এ মর্মে তাদেরকে রক্ষা করা গেলে তারা ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামের দাওয়াতী কাজে বেশ কাজে আসতে পারে। এটি পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়েছিল। রাসূল (সা) কুরাইশদের গোঁয়ার্তুমির কারণে হতাশাগ্রস্থ হলেন। আসল ব্যাপারটি হলো তারা মুসলমানদের সাথে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। রাসূল (সা) বলেন ঃ

> হায়, কুরাইশ সম্প্রদায়, যুদ্ধ তাদেরকে গ্রাস করে ফেলেছে, তারা আমাকে ছেড়ে গেলে তাদের কি ক্ষতিই না হতো আর অবশিষ্ট আরব বিশ্ব আমাদের পথে পরিচালিত হতো! তারা যদি আমাকে হত্যা করতো (যা তারা কামনা করে) আর আল্লাহ যদি আমাকে তাদের উপর বিজয় দিতেন, তারা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতো। তারা তা না করে তাদের শক্তি শেষ না হওয়া পর্যন্ত লড়াই করবে, কুরাইশরা কি তাই চিন্তা করছে? আল্লাহর কসম, আল্লাহ আমাকে যে মিশন দিয়ে পাঠিয়েছেন তার জন্য আমি আমার লড়াই বন্ধ করবো না। আমি যে পর্যন্ত বিজয়ী না হবো বা ধ্বংস না হয়ে যাবো সে পর্যন্ত আমি থামবো না।[২৬]

রাসূল (সা) কুরাইশদের কাছে নিরপেক্ষ ধরনের লোক পাঠিয়ে বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, তিনি কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চান না, তিনি শুধু পবিত্র ঘর জিয়ারত করতে এর প্রতি সম্মান দেখাতে এসেছেন। বুদাইল ইবনে ওয়ারকা আল খুজাই তাঁকে এসে খবর দিলেন যে, কুরাইশরা মুসলমানদের মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। রাসূল (সা) বুদাইল

ইবনে ওয়ারকার কাছে তাঁর অবস্থানটি ব্যাখ্যা করলেন। বুদাইল এ সংবাদ কুরাইশদের কাছে পৌছে দিলেন।[২৭] কুরাইশরা বললো, "সে হয়ত এখানে কোন যুদ্ধ করার উদ্দেশে আসবে না, আল্লাহর কসম সে যেন কখনো আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে না আসে, আর আরবরাও যেন এটা বলতে না পারে যে, আমরা তাকে এখানে আসতে দিয়েছি।"[২৮]

মুসলমানগণ রাজনৈতিক বিজয় অর্জন করতে চেয়েছিলেন, তারা মক্কায় ঢুকতে পারুন আর না পারুন, আরবরা এ ব্যাপারে বলাবলি করতে থাকুক, আরবরা বলাবলি করতে থাকুক যে, কুরাইশরা মানুষদেরকে কাবার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে আগতদের ফিরিয়ে দিচ্ছে, আর কুরাইশরা প্রচার করছিল যে, মুসলমানগণ পবিত্র স্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছে না।

রাসূল (সা) এতেও থেমে থাকেন নি। রাসূল (সা) কুরাইশদের কাছে একের পর এক দূত পাঠিয়ে তাঁর মিশনের কথা পৌছাতে লাগলেন। তাঁর ইচ্ছার কথা প্রকাশ করতে লাগলেন। তিনি খারাস ইবনে উমাইয়া আল খুজাইকে কুরাইশদের কাছে পাঠালেন। খুজাইকে আহাবিশ না বাঁচালে কুরাইশরা তাকে মেরেই ফেলত।[২৯] রাসূল (সা) উমর ইবনে আল খাত্তাবকে পাঠাতে চাইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার মত পরিবর্তন করলেন এবং উসমান ইবনে আফ্ফানকে পাঠাতে চাইলেন। উমর কুরাইশদেরকে তীব্রভাবে ঘৃণা করতেন, তার এ অবস্থা কুরাইশরাও জানতো, আর উমরের লোকজনও জানতো। বানু আদি ছিলেন উমরের নিজস্ব লোক, তিনিও তাদের হাত থেকে উমরকে রক্ষার কথা দিলেন না।[৩০]

উসমান কুরাইশদের কাছে যান। কুরাইশদের কাছে রাসূল (সা) এর বার্তাটি পৌছিয়ে না দেয়া পর্যন্ত আব্বান ইবনে সা'দ ইবনে আল আস তাঁকে পাহারা দিয়ে রাখেন। কুরাইশরা তাকে তাওয়াফের অনুমতি দিল। কিন্তু তিনি রাসূলের আগে তাওয়াফ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। কুরাইশরা তখন তাকে আটকিয়ে রাখে এবং তার ফিরে যাওয়াকে দেরি করিয়ে দেয়। এদিকে মুসলমানগণ মনে করতে থাকেন যে, কুরাইশরা তাকে মেরে ফেলেছে।[৩১] রাসূল (সা) তাঁর সাথীদেরকে ডাকলেন, একটি কাঁটা গাছের নীচে ডেকে এনে তাদেরকে বাইয়াত গ্রহণ করতে বললেন। আল যাদ্দ ইবনে কায়েস ছাড়া সবাই অঙ্গীকার (*বাইয়াত*) করলেন। আল যাদ্দ ছিল মুনাফিক।[৩২] তাদের এ প্রতিজ্ঞা মৃত্যুর দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।[৩৩] আরেকটি বর্ণনা হতে জানা যায়, সাথীগণ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাবেন না এ মর্মে অঙ্গীকার করেছিলেন, শপথ নিয়েছিলেন। তবে তারা আমৃত্যু যুদ্ধ করার বিষয়ে কোন শপথ নেননি বলে এ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।[৩৪] বর্ণনাগুলোর মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই, কারণ অঙ্গীকার করার অর্থ হলো তারা পালিয়ে যাবে না।[৩৫]

আবু সিনান আবদ আল্লাহ ইবনে ওহাব আল আসাদী প্রথম *বাইয়াত* গ্রহণ করেন।[৩৬] এর পর সাথীগণ এক এক করে সবাই *বাইয়াত* গ্রহণ করেন। রাসূল (সা) তাঁর সাথীদের মনোভাবের জন্য প্রশংসা করলেন এবং তাদের *বাইয়াত* গ্রহণকেও

প্রশংসা করেন। রাসূল (সা) বলেন ঃ "পৃথিবীতে তোমরা হলে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ,"[৩৭] *ইনশাল্লাহ, আশাব আল শাজারাহ*'য় যারা রাসূলের প্রতি বাইয়াত গ্রহণ করেছে, তারা কখনো দোযখে যাবে না।"[৩৮] এর কারণ, কুরাইশরা উসমানকে আটকে রেখেছিল। রাসূল (সা) তাঁর ডান হাত উঠিয়ে ধরে বললেন, "এটি উসমানের হাত।" এর পর তিনি তাঁর হাত দিয়ে উসমানের অন্য হাতে আঘাত দিয়ে বলেন, "এটি উসমানের জন্য।"[৩৯] গাছের নীচে যারা *বায়াত* গ্রহণ করেছিলেন উসমানকে তাদের দলে হিসাব করা হয়। *বাইয়াত* গ্রহণের পর পরই উসমান অন্যান্য মুসলমানদের সাথে মিশে যান। তাঁর এ *বাইয়াত বাইয়াত আল রিদওয়ান* বা *সন্তুষ্টির বাইয়াত* নামে পরিচিত।

কুরাইশরা মুসলমানদের সাথে আলাপ আলোচনার জন্য কয়েকজন বার্তাবাহক পাঠালো। তাদের প্রথম বার্তাবাহক ছিল উরওয়া ইবনে মাসুদ ও আল সাকাদী। সে লক্ষ্য করলো মুসলমানগণ রাসূল (সা) কে কত সম্মান করে এবং কি পরিমাণে তারা রাসূল (সা) কে মেনে চলে। সে কুরাইশদের কাছে ফিরে এসে বললো, "হে আমার লোকসকল, আমি রাজা দেখেছি, আমি সিজারকে দেখেছি, আমি খোসরু ও নেগুসকে দেখেছি আল্লাহর কসম আমি এর আগে এমন কোন রাজাকে দেখিনি যার লোকজন তাকে এতবেশী উচ্চ মর্যাদা দেয়, যে মর্যাদা মুহাম্মদের সাথীরা মুহাম্মদকে দিয়েছে।[৪০]

কুরাইশরা এর পর আহাবিশ নেতা আল হুলাইস ইবনে আল আকামা আল কিনানিকে প্রেরণ করে। রাসূল (সা) তাকে আসতে দেখে কুরবানির পশুগুলোকে বের করে আনার জন্য তার সাথীদের বলেন যাতে আল হুলাইস ইবনে আল কামাহ তা দেখতে পারে, আর তার সামনে *তালবিয়া পাঠ* করতে বলেন, হুলাইসিরা এরূপ প্রাণীকে পূজা করে। আল হুলাইস ইবনে আল কামা এটা দেখে গিয়ে কুরাইশদের কাছে বলল, "আমি দেখলাম উটগুলোকে তাদের ঘাড়ের চার পাশে রং বেরংয়ের জিনিস দিয়ে সাজানো হয়েছে; এগুলোকে কুরবানির জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। সেজন্য আমি মনে করি তাদেরকে কাবা জিয়ারতে আসতে না দেয়াটা ঠিক হবে না।"[৪১] কুরাইশরা তার কথা শুনে বললো, "বসে পড়, তুমি একটি বেদুঈন, নীরেট বোকা।"[৪২] কুরাইশরা এর পর মাকরাজ ইবনে হাফসকে পাঠালো। তার সাথে সুহাইল ইবনে আমরকে পাঠানো হলো। রাসূল (সা) আশা করে বললেন, "তোমাদের অবস্থানটা তোমাদের জন্য সহজ হয়ে গিয়েছে।"[৪৩] আরবিতে একটি শব্দ আছে *সাহালা*, অর্থ সহজ হয়ে যাওয়া।" এটি সুহাইলের ন্যায় একই ধাতু হতে নেয়া হয়েছে। রাসূল (সা) বললেন, "মানুষ শান্তি চায়, কেননা তারা এ লোকটিকে পাঠিয়েছে।" কুরাইশরা শুধু জোর দিল যে, শান্তি চুক্তিতে এটা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যে, মুসলমানগণ এবারে উমরাহ পালন না করেই ফিরে যাবে। রাসূল (সা) ও সুহাইল ইবনে আমরের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হলো। হুদায়বিয়ার শান্তিচুক্তি সম্পন্ন হলো।[৪৪]

শান্তিচুক্তি লেখার ভূমিকায় কিছুটা পার্থক্য দেখা গেল। রাসূল (সা) এটিকে ইসলামী ধাচ দিতে চাইলেন কিন্তু সুহাইল তাতে আপত্তি করলো। আলী ইবনে আবু তালিব সন্ধি চুক্তি লেখার কাজে ছিলেন।[৪৫] রাসূল (সা) বললেন, "লিখুন, *বিসমিল্লাহির*

রাহমানির রাহীম।" সুহাইল বলল, "আল্লাহর কসম, আমি *'আর রাহমান'* কি বুঝিনা, বরং লিখুন, *বিসমিকা আল্লাহুম্মা* (আল্লাহ তোমার নামে), আপনারা যা বলে থাকেন সে ভাবেই লিখুন। "মুসলমানগণ বললেন, "আমরা *'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'* ছাড়া কিছু লিখব না।" রাসূল (সা) বললেন, "লিখুন, *'বিসমিকা আল্লাহুম্মা।"* এর পর রাসূল বললেন, "লিখুন, "এটাতেই মুহাম্মদ, আল্লাহর বার্তাবাহক সম্মত হয়েছেন।" সুহাইল বলল, "আল্লাহর কসম, আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর বার্তাবাহক হিসেবে মেনে নিই, তা হলে আমরা আপনাকে কাবা যিয়ারতে বাধা দিতে এবং আপনার সাথে যুদ্ধ করতে পারিনা। বরং লিখুন, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ," এবার রাসূল (সা) বললেন, "তোমরা বিশ্বাস কর আর না কর আমি অবশ্যই আল্লাহর বার্তাবাহক। লিখ, মুহাম্মদ ইবনে আবদ আল্লাহ।" এর পর রাসূল (সা) বললেন, "শর্ত অনুযায়ী আমাদেরকে মক্কায় গিয়ে কাবা গৃহ *তাওয়াফ* করতে দাও।" সুহাইল বলল, "আল্লাহর কসম, আরবরা কখানো যেন বলতে না পারে যে, আমরা তাদেরকে জোরপূর্বক গ্রহণ করেছি। এ বছরআপনারা মক্কায় যেতে পারবেন না, তবে আগামী বছরআপনারা মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন।" এভাবে চুক্তি সম্পাদন করা হলো।

সুহাইল আরও বলল, "আমাদের কোন লোক সে যদি মুসলমানও হয়ে থাকে এবং সে যদি আপনাদের কাছে চলে আসে তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে।" মুসলমানগণ বললেন, "সব প্রশংসা আল্লাহর, কোন লোক সে যদি মুসলমান হয় এবং আমাদের কাছে ফিরে আসে আমরা তাকে মুশরিকদের কাছে কি ভাবে ফিরিয়ে দেই?" তারা যখন এগুলো আলোচনা করছিল তখন আবু জানদাল ইবনে সুহাইল ইবনে আমর পায়ে বেড়ি পরা অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করলেন। মক্কার নিম্নাঞ্চল হতে পালিয়ে আসেন এবং মুসলমানদের সাথে থাকার উদ্দেশে আসেন। সুহাইল তাকে দেখে প্রথমেই বলল, "ও মুহাম্মদ, এটাই প্রথম ঘটনা, তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিন।" "রাসূল (সা) বললেন, "আমরাতো এখনও সন্ধিচুক্তিটি লিখেও শেষ করিনি।" সুহাইল বলল, "আল্লাহর কসম, আমি কখনো আপনার সাথে কোন চুক্তি করিনি।"

রাসূল (সা) বললেন, "তাকে আমাকে রাখতে দিন।" সুহাইল বলল, "আমি তাকে আপনাকে রাখতে দেব না।" রাসূল (সা) বললেন, "আমি যা বলি তাই করুন," সুহাইল বলল, "আমি করবোই না।" মাকরাজ বলল, "আমরা তাকে আপনার কাছে দিয়ে দিব।"[৪৬]

এর পর নিম্নবর্ণিত চুক্তি সম্পাদিত হয় ঃ

> ... দশ বছরপর্যন্ত যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ থাকবে, এ সময়ে মানুষ নিরাপদে থাকবে এবং শত্রুতা থেকে দূরে থাকবে এ শর্তে যে, কেউ যদি অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মুহাম্মদের কাছে চলে আসে মুহাম্মদ তাকে *কুরাইশদের* কাছে ফিরিয়ে দেবেন; মুহাম্মদের কাছে থাকা কোন লোক যদি কুরাইশদের কাছে চলে আসে কুরাইশরা তাকে মুহাম্মদের কাছে ফেরৎ দেবে না। আমরা একে অপরের প্রতি কোন শত্রুতা করবো না, আমাদের মধ্যে কোন[৪৭] গোপনীয় কিছু

থাকবে না, আমাদের মধ্যে কোন অবিশ্বাসের কিছু থাকবে না। কেউ মুহাম্মদের সাথে কোন চুক্তি বা সম্পর্ক সৃষ্টি করতে চাইলে তারা সেটা করতে পারবে, আমরা কুরাইশরাও কারও সাথে কোন চুক্তি বা মিত্রতা করতে চাইলে তা করতে পারব।[৪৮]

একথা শুনে খুজা লাফিয়ে উঠে বলল, "আমরা মুহাম্মদের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করেছি এবং বন্ধন সৃষ্টি করেছি।" বানু বকরও লাফিয়ে উঠে কুরাইশদের পক্ষে একই কথা বলল। তোমরা এ বছরআমাদের কাছ থেকে চলে যাবে এবং আমাদের মতের বিরুদ্ধে মক্কায় ঢুকতে পারবে না। আমরা আগামী বছরতোমাদেরকে পথ ছেড়ে দেব। তোমরা তোমাদের সাথীদেরকে নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে। তিনরাত মক্কায় থাকতে পারবে। তোমরা তোমাদের সাথে একজন বহনকারীর অস্ত্র বহন করতে পারবে। খাপে ভর্তি করে তলোয়ার আনতে পারবে। এর চেয়ে বেশী কিছু তোমরা আনতে পারবে না।[৪৯]

এভাবে দশ বৎসরের জন্য চুক্তি সম্পাদিত হলো। শর্ত থাকে যে, মুসলমানগণ পরের বছরমক্কায় প্রবেশ করবে না, তারা মাত্র মক্কায় তিন দিন থাকতে পারবে। খাপে ভর্তি অবস্থায় তারা তলোয়ার সাথে আনতে পারবে। দু'পক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে কোন শত্রুতামূলক প্রচারণা চালাতে পারবেনা। তারা উভয় পক্ষই আরবদের সাথে সমান শর্তাধীনে চুক্তি করতে পারবে। কোন মুসলমান কুরাইশদের কাছ থেকে মুসলমানদের কাছে পালিয়ে এ মুসলমানগণ তাকে কুরাইশদের কাছে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে।

মুসলমানগণ এরূপ চুক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করলেন, তারা চুক্তির শর্তাবলীতে অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন। এর কারণ, চুক্তিটি ইসলামী বিধান অনুযায়ী সম্পাদিত হয়নি। চুক্তিতে লিপিবদ্ধ "আল্লাহর বার্তাবাহক" শব্দগুলো মুছে ফেলতে আলী ইবনে আবু তালিব অস্বীকৃতি জানালেন। রাসূল (সা) চুক্তিপত্রটি তার হাত থেকে নিয়ে নেন এবং সুহাইল যা চেয়েছিল তা চুক্তিতে লিপিবদ্ধ করতে বলেন।[৫০] যে সব মুসলমান আশ্রয় গ্রহণের জন্য মুসলমানদের কাছে চলে আসত তাদেরকে কুরাইশদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার চুক্তিতে মুসলমানগণ ক্ষুব্ধ হন। তারা বলেন, "হে আল্লাহর বার্তাবাহক, আপনি কি এ জাতীয় চুক্তিতে একমত?" তিনি বললেন, "যারা আমাদের কাছ থেকে তাদের কাছে চলে গিয়েছে, তাদেরকে আল্লাহই আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছেন, আর যারা আমাদের কাছে চলে আসে, আল্লাহ তাকে মুক্তি দেবেন এবং তার জন্য বের হয়ে যাওয়ার রাস্তা করে দেবেন।"[৫১]

উমর ইবনে আল খাত্তাব খুব রাগান্বিত হলেন। তিনি রাসূল (সা) কে চুক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। উমর বললেন, "আমি রাসূল (সা) এর কাছে গেলাম এবং বললাম, "আপনি কি আল্লাহর সত্যিকারের রাসূল নন?" রাসূল (সা) বললেন, "অবশ্যই।" আমি বললাম, "আমরা কি সঠিক পথে নেই? আমাদের শত্রুরা কি ভুল পথে নয়?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "আমি অবশ্যই আল্লাহর বার্তাবাহক। আমি কোনভাবেই তাকে অমান্য করবো না। তিনিই আমার সমর্থনকারী।" আমি বললাম,

"আপনি কি আমাদেরকে বলেন নি যে আমরা কাবা গৃহে যাবো এবং কাবাগৃহ *তওয়াফ* করবো?" তিনি বললেন, "হাঁ", "আমি কি এ বছরই কাবা গৃহ *তাওয়াফের* জন্য বলেছি?"[৫২] কিন্তু উমর তাঁর এ কথায় সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিন আবু বকরের কাছে গিয়ে একই প্রশ্ন করলেন। আবু বকর বললেন, "হে উমর, তিনি যা বলছেন তাই শুন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ।"[৫৩] উমর বললেন, "আমিও তাই সাক্ষ্য দিচ্ছি।"[৫৪]

উমর বললেন "আমি দান খয়রাত বন্ধ করিনি, রোযা রাখা বন্ধ করিনি, গোলাম মুক্ত করা বন্ধ করিনি। আমি ঐদিন ভয়ের কারণে যা করেছি আজও তাই করেছি আমার অবস্থার উন্নয়নের জন্য।"[৫৫]

উমর এসব শর্তাধীনে শান্তিচুক্তির জন্য রাযী হওয়ার পেছনে কি হিকমত থাকতে পারে সে ব্যাপারে রাসূল (সা) কে জিজ্ঞাসা করলেন। উমর *মুশরিকদেরকে* অপমানিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি যা কিছু করেছিলেন তার পেছনে কারণ ছিল। তিনি এজন্য পুরস্কৃত হয়েছিলেন। কারণ তিনি এগুলো বুঝার জন্য কঠিন চেষ্টা করেন।[৫৬]

মুসলমানগণ সন্দেহহীনভাবে মক্কা হতে বের হয়ে যেতে লাগলেন। চুক্তির শর্তানুযায়ী তারা এরূপ করলেও তারা বিমর্ষ হয়ে পড়েন, তারা প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি এসে পৌছান। এ অবস্থাটি দেখা যায় যখন কুরাইশদের কাছে আবু জিন্দালকে ফেরৎ দেয়া হয় আর সে যখন মুসলমান ভাইদের কাছে সাহায্য চাইতেছিল এ বলে, "হে মুসলমান ভাই সকল, আমাকে কি বহুঈশ্বেরবাদীদের কাছে ফেরৎ দেয়া হবে যারা আমাকে আমার ধর্ম ইসলাম হতে কেড়ে নেয়ার জন্য নানা প্রলোভন দিতে পারে?" রাসূল (সা) বললেন, "হে আবু জিন্দাল, ধৈর্য ধারণ কর, নিজেকে সংযত কর, আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন, তোমার মুক্তির জন্য সুযোগ করে দেবেন, তোমার ন্যায় অসহায় অন্যান্যদেরকেও এভাবে সাহায্য করা হবে।"[৫৭]

উমর আবু জিন্দালের সাথে হাঁটতে লাগলেন, উমর তাকে তার পিতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলছিলেন, তলোয়ারটিকে তার কাছাকাছি নিয়ে এলেন। আবু জিন্দাল এগুলোর কিছুই করলেন না। তাঁকে কুরাইশদের কাছে ফেরৎ দেয়া হয়।[৫৮]

সহল ইবনে হানিফ সিফফিনের যুদ্ধে যা বলেছিলেন তাতে শান্তি চুক্তির ব্যাপারে মুসলমানদের অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। "তুমি মনে কর তোমার মতামত ভুল হতে পারে। আমি নিজেও আবু জিন্দালের ব্যাপারে আমার নিজের মতামত অনুযায়ী কাজ করতে চেয়েছিলাম। আমার যদি আল্লাহর রাসূলের কথা অমান্য করার ক্ষমতা থাকতো আমি তাই করতাম (নাস্তিকদের সাথে যুদ্ধ করতাম)"। উমর ও অন্যান্যগণ শান্তিচুক্তির ব্যাপারে যে মতামত দিয়েছিলেন তা বাদ দেয়া হয়। তাদের মতামত রাসূল (সা) এর মতামতের সাথে অভিন্ন না হওয়ার কারণে বাদ দেয়া হয়। রাসূল (সা) এর মতামত ছিল ওহী উৎসারিত। এর উপর অন্য কোন মতামত থাকতে পারে না। সাথীগণ যখন বুঝতে পারলেন যে, রাসূল (সা) এর মতামত কুরআনের মতামত তখন কেউ আর তার বিরোধিতা করেননি। কোন আপত্তি ছাড়াই তাঁর মতামত মেনে নেন।

> আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে। (৩৩:৩৬)

কুরাইশরা আলাপ আলোচনার সময়ে বা চুক্তির পরেও মুসলমানদেরকে প্ররোচিত করা বন্ধ করেনি। কুরাইশ নেতাদের সম্মতিতে হলেও আলাপ আলোচনার সময়ে চাপ সৃষ্টির জন্য তারা সব কিছুই করেছিল। কিন্তু এ সবের সবই মহাশৃংখলার সাথেই পালন করেন। মক্কার আশিজন লোক মুসলিম শিবিরে আক্রমণ করে তাদেরকে পরাজিত করতে চেয়েছিল। এগুলোকে ধরে ফেলা হয়। তাদেরকে মাফ করে দেয়া হয় ও ছেড়ে দেয়া হয়।[৫৯] চুক্তি লেখাকালে ত্রিশজন কুরাইশ যুবক মুসলমান শিবির আক্রমণ করতে চাইলে মুসলমানগণ তাদেরকে ধরে ফেলে, রাসূল (সা) তাদের ছেড়ে দেন।[৬০]

সন্ধিচুক্তি যখন চূড়ান্ত হয়ে গেল মুসলমানগণ মুক্তভাবে মুশরিকদের সাথে মেলামেশা করেছিল, চার মুশরিক রাসূল (সা) এর নামে অপবাদ দিয়ে যাচ্ছিল। সালমান ইবনে আল আকওয়া তাদেরকে রাসূল (সা) এর কাছে নিয়ে যান। রাসূল (সা) মুক্তির শর্ত অনুযায়ী তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন। এ ব্যাপারে কুরআনের নিম্ন বর্ণিত আয়াত নাযিল হয় ঃ

> তিনি মক্কা উপত্যকায় তাদের হস্ত তোমাদিগ হতে এবং তোমাদের হস্ত তাদিগ হতে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদের বিজয়ী করার জন্য। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। (৪৮:২৪)[৬১]

মুসলমানগণ ভাবতে লাগলেন যে ,শান্তি চুক্তিটি তাদের জন্য ছিল অন্যায় অবিচারমূলক। তারা এতই রাগান্বিত হয়ে পড়লো যে, রাসূল (সা) যখন তাদেরকে তাদের পশু যবাহ'র জন্য তিনবার নির্দেশ দিলেন, তাদের মাথা মুন্ডনের জন্য বললেন, তাদের মধ্যে একজন তাঁর কথামত উঠলোই না। তারা মনে করতে লাগলো যে চুক্তিটি বাতিল করা হবে। উম্মে সালামার পরামর্শ মোতাবেক তারা যখন তাকে উঠতে দেখলো, তিনি কুরবানি করলেন ও মাথা মুন্ডন করলেন, তারা সবাই উঠলো, কুরবানি দিল, একজন আরেকজনের মাথা মুন্ডন করে দিল। তারা এতই ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল মনে হচ্ছিল তারা একে অপরকে হত্যা করছিল।[৬২] যারা মাথা মুন্ডন করেছে আর তাদের পশু কুরবানি করেছে তাদের জন্য রাসূল (সা) তিনবার দোয়া করলেন।[৬৩] মুসলমানগণ এভাবে ৭০টি উট কুরবানি দিলেন।[৬৪] প্রতিটি কুরবানিই সাতজনের পক্ষে করা হয়।[৬৫]

রাসূল (সা) একটি উট কুরবানি দেন। এ উটটি একসময় আবু জাহলের ছিল। মুসলমানগণ এটিকে বদরযুদ্ধে যুদ্ধলব্ধ মাল হিসাবে পেয়েছিলেন। পশুদিয়ে কুরবানি দেয়াতে মুশরিকরা[৬৬] তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো। *হারামের* বাইরে আল হুদাবিয়ায় পশুগুলো কুরবানি করা হয়।[৬৭] নাজিয়া ইবনে জুনুব কিছু পশু হারামের বাইরে নিয়ে কুরবানি করেন।[৬৮] মুসলমানগণ এভাবে উমরাহর জন্য *ইহরাম* অবস্থা থেকে বের হয়ে এলেন। বিধান চালু হয়ে গেল, যারা উমরাহ করলো তারা *ইহরাম* অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসবে, তারা ঐ অবস্থায় *উমরাহ* করবে না।

রাসূল (সা) এর সাথীগণ মদীনায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তারা হুদায়বিয়ায় ২০ দিন অবস্থান করলেন।[৬৯] এখানে তাদের এ সফরে দেড়মাস সময় ব্যয় হয়।[৭০]

হুদায়বিয়ায় অভিযান কালে রাসূল (সা) কা'ব ইবনে উযরাকে তার অসুস্থতার জন্য *উমরাহর* নিমিত্ত *ইহরাম* বাঁধা অবস্থায় তারা মাথা মুন্ডনের অনুমতি দিলেন এক শর্তে যে, এর জন্য তিনি একটি মেষ কুরবানি দেবেন, তিনদিন রোযা রাখবেন, ছয়জন অভুক্ত লোককে খাবার দেবেন। এ ব্যাপারে নিম্নবর্ণিত আয়াত নাযিল হয়ঃ[৭১]

> তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে তবে *সিয়াম* কিংবা *সাদকা* অথবা কুরবানির দ্বারা এর *ফিদয়া* দেবে। (২২:১৯৬)

রাসূল (সা) বৃষ্টি হওয়ার সময় তাঁর সাহাবীদেরকে তাবুর ভেতরে থেকে নামায আদায় করতে বলেন।[৭২]

এ অভিযান কালে রাসূল (সা) *শূরার* নিয়ম নীতি চালু করেছিলেন। তিনি *মুশরিকদের* ভূ-খন্ড আক্রমণ করবেন কিনা বা তাদের শিশুদেরকে আটক করবেন কিনা এ ব্যাপারে তিনি তাঁর সাথীদের সাথে আলোচনা করতেন। এবং আবু বকরের সাথে আলাপ করতেন। যারা রাসূল (সা) এর নির্দেশমত পশু কুরবানী দেয়নি, মাথা মুন্ডন করেনি তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করা হবে এ ব্যাপারে রাসূল (সা) উম্মে সালমার সাথে আলাপ করেন।

* হুদায়বিয়ার অভিযান থেকে আমরা দেখতে পাই *কাফিরদের* সাথে মুসলমানদের দীর্ঘস্থায়ী শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এসময়ে মুসলমানদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল শত্রুতার, বন্ধুত্বের নয়, শান্তির নয়। আমরা এখানে দেখলাম *কাফিরদের* সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন হতে পারে এ শর্তে যে, মুসলমানদের কাছে কোন ব্যক্তি মুসলমান অবস্থায় এলেও তাকে *কাফিরদের* কাছে ফেরৎ দেয়া হবে।

ইসলামী আকীদা, নিয়ম-নীতি সম্পর্কে রাসূল (সা) কিছু কিছু বিষয়ে এ সময় স্পষ্ট ধারণা দিলেন। কেউ একজন তার কাছে এসে আকীদা সম্পর্কে বললো "উমুক উমুক নক্ষত্র হতে আমরা বৃষ্টি পাই, সে আল্লাহ অবিশ্বাসী, আর নক্ষত্রে বিশ্বাসী।"[৭৩] তার একথার পর তিনি এটা গুরুত্বের সাথে বুঝাতে চাইলেন যে, আশাবাদী হওয়া যায় যখন সুহাইল ইবনে আমরের সামনে রাসূল (সা) বললেন, "তোমাদের অবস্থা সহজ হয়ে গিয়েছে।"[৭৪]

রাসূল (সা) যা কিছু ব্যবহার করতেন তা থেকে বরকত আশা করা জায়েয বলে প্রতীয়মান হলো। যেমন, রাসূল (সা) যে পানিতে ওযু করতেন তা আবার ব্যবহার করা, এটি শুধুমাত্র রাসূল (সা) এর জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে উম্মাহর অন্য কোন পূণ্যবান লোকদের জন্য নয়।[৭৫]

মদীনার পথে মুসলমানগণ ঘুমিয়ে পড়েন। ক্লান্তির কারণে তারা এতই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন যে, *ফজরের* সালাতের সময় পার হয়ে যায়। সূর্যের তাপেই তারা ঘুম থেকে উঠেন। বিলাল ইবনে রাবাহ তাদের পাহারার দায়িত্বে ছিলেন। তিনিও গভীর

ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। নির্ধারিত সময়ের পরেই তারা সালাত আদায় করেন। কেউ ঘুমের কারণে বা ভুলে গিয়ে পরে কাযা সালাত পড়ে নিলে তা হবে সুন্নত।[৭৬]

মদীনায় ফেরার পথে রাসূল (সা) খাদ্য ও পানীয় বৃদ্ধির ব্যাপারে অলৌকিক অবস্থা দেখায়েছিলেন। সালাম ইবনে আল আকওয়া বলেন ঃ

> আমরা রাসূল (সা) এর সাথে একটি অভিযানে বের হই। আমরা এতই ক্লান্ত-শ্রান্ত ও ক্ষুধার্থ হয়ে পড়ি যে, আমরা আমাদের সাথে থাকা উট যবহ করে ফেলতে চাইলাম। রাসূল (সা) আমাদেরকে খাবার সামগ্রী একসাথে করতে বললেন। আমরা এক খন্ড চামড়ার দস্তরখান বিছালাম ও সবগুলো খাবার এর উপর রাখলাম। আমি আবার গলা উঁচু করে দেখলাম কি পরিমাণ খাবার জমা হয়েছে। বুঝতে পারলাম একটি ছাগলের উচ্চতার সমান খাবার স্তুপ জমা হয়েছে। আমরা মানুষ ছিলাম ১,৪০০ জন। আমরা সবাই সন্তুষ্টির সাথে খেলাম, এরপর আমরা আমাদের খাবারের পত্র ভর্তি করলাম। রাসূল (সা) বললেন, "ওযূর কোন পানি আছে?" জনৈক সাথী তার পানির পাত্র নিয়ে এলেন। এর মধ্যে মাত্র কয়েক ফোটা পানি। এ পানি একটা গামলায় রাখলেন। আমরা চৌদ্দশত লোক গামলার পানি দিয়ে ওযু করলাম।[৭৭]

মদীনা ফিরে যাওয়ার সময় *সূরা ফাত্হ্* নাযিল হয়। "নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়" (৪৮.১)।[৭৮] রাসূল (সা) এ *সূরা* নাযিল হওয়ায় ভীষণ আনন্দিত হন। তিনি বলেন, "আজ রাত আমার উপর একটি সূরা নাযিল হয়েছে, এটা আমার[৭৯] কাছে সূর্য উঠার চেয়েও (অর্থাৎ বেশি) প্রিয়।" আনাস ইবনে মালিক হুদায়বিয়ার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, "আমরা আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দিয়েছি।"[৮০] তার সাথীগণ বললেন, "এতে আপনার কল্যাণ হয়েছে কিন্তু আমাদের কি হবে?" তখন আল্লাহ নিম্নবর্ণিত আয়াত নাযিল করেন :

> "ইহা এজন্য যে, তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা স্থায়ী হবে এবং তিনি তাদের পাপ মোচন করবেন; এটাই আল্লাহর সৃষ্টিতে মহাসাফল্য।" (৪৮:৫)

রাসূল (সা) এর কাছে মানুষ দৌড়ে গেল। এ সময় তিনি কিরা আল গামিমে তাঁর উটে বসা ছিলেন। তিনি তাদের কাছে তেলাওয়াত করলেন। "নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে স্পষ্ট বিজয় দিয়েছি।" জনৈক লোক বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, এটা কি বিজয়?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।"

যার হাতে আমার জীবন তার শপথ এটা আমাদের বিজয়।[৮১] তাঁর কথা শুনে মুসলমানগণ দুঃখের মধ্যে পেল অঢেল আনন্দ। তারা এখন বুঝতে পারলো, তারা আসলে সন্ধিচুক্তির অর্থ বুঝতে পারছিলেন না, বা এর পরিণাম কি হবে তাও তারা বুঝতে পারছিলেন না। তারা বুঝতে পারলেন আল্লাহর আদেশ মানার মধ্যে তাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে আর ইসলামের দাওয়ার মধ্যেও রয়েছে তাদের জন্য শান্তি।

অনেকগুলো ঘটনা এ শান্তি চুক্তির মধ্যে নিহিত। গভীর জ্ঞান ও এর অপূর্ব ফলাফলের বিষয়টি চুক্তিতে ফুটে উঠেছে। আল্লাহ এটিকে "প্রকাশ্য বিজয়" বলেছেন। কুরাইশরা যখন প্রথমবারের মত মুসলমানদের আত্মাকে স্বীকৃতি দিল এবং তাদের সাথে সমানে সমানে আচরণ করেছে, তাদের করুণ পরিণতি যখন মানুষের কাছে ফুটে উঠেছে তখন এ বিজয় "স্পষ্ট বিজয়" ছাড়া অন্যকিছু কিভাবে হতে পারে? বিষয়টি নিয়ে মক্কায় বিরাট আলাপ আলোচনা চলে এবং পুরো আরব উপদ্বীপেও এর প্রতিধ্বনি চলতে থাকে। এর প্রথম দৃষ্টান্তটি পাওয়া যায় যখন খুজা কুরাইশদের সাথে কোন পরামর্শ ছাড়াই খোলাখুলিভাবে মুসলমানদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে। নতুন সম্পর্কের বিষয়টির একটি গভীর ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, এর কারণ ঐতিহ্যগতভাবে খুজা ও কিনানের বানু বকর গোত্রের মধ্যে শত্রুতা বিদ্যমান ছিল। বানু বকরের বন্ধু কুরাইশরাই রাসূল (সা) এর পিতাসহ আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হিশামের সাথে খুজাকে মিত্রতা স্থাপনের দিকে ঠেলে দেয়। আমর ইবনে সালিম এ সন্ধির কথা তার কাব্য "আমাদের পিতাদের মধ্যকার পুরনো মিত্রতা"-এ বর্ণিত হয়েছে। তার এ কাজে মক্কা বিজয়ের ঠিক পূর্বে রাসূল (সা)এর সাহায্য চাওয়া হয়েছিল।[৮২]

খুজারা স্পষ্টতই মদীনা রাষ্ট্রের শুরুতেই মুসলমানদের ব্যাপারে সমব্যাথী ছিল। তাদের এ সম্পর্ক হুদায়বিয়ায় তাদের কৃত চুক্তি সম্পাদনের পূর্ব পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। "মক্কায় কি হচ্ছিল সে সম্পর্কে মুসলমান ও খুজার মুশরিকরা উভয়েই রাসূল (সা) কে গোপনে খবরাখবর সরবরাহ করতো।"[৮৩] খুজারা মুসলমানদের প্রতি যে প্রকৃত অর্থেই সমব্যথী ছিল মুসলমানদের সাথে চুক্তির পূর্বে তা তারা কুরাইশদের কাছে গোপন রেখেছিল। এজন্যই খুজারা অনেকদিন ধরে মুসলমানদের সাথে তাদের সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছিল।

সন্ধি চুক্তির ফলে বিরাজিত শান্তি মুসলমানদেরকে খায়বারের ইহুদীদের সাথে শান্তি স্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছিল। খায়বার ছিল সর্বশেষ দুর্গ যেখান থেকে ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্যদের উত্তেজিত করতে পারতো। এ অবস্থা *খন্দকের* যুদ্ধ ও এরপরের সময় পর্যন্ত থাকে।[৮৪]

মুসলমানদেরও ইসলাম প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। আল যুহরী বলেন, "আগের কোন বিজয়ই এর চেয়ে বড় ছিল না। এ সময়ে মানুষ যুদ্ধ ছাড়া কিছুই দেখেনি। কিন্তু যখন অস্ত্রবিরতি হলো তখন যুদ্ধ তিরোহিত হলো, মানুষ নিরাপদে বসবাস করতে লাগলো এবং একে অপরের সাথে আলাপ আলোচনার সুযোগ উপভোগ করলো। না জেনে কেউ ইসলামের উপর আলোচনা করতো না। ঐ দু'বৎসরে পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ মানুষ ইসলামে দাখিল হয়েছিল।"

ইবনে হিশাম বলেন, "রাসূল (সা) মাত্র ১,৪০০ লোক নিয়ে যে হুদায়বিয়ায় গিয়েছিলেন এর দ্বারা আল যুহুরীর পরামর্শের বিষয়টি সমর্থিত হয়েছে। দু'বছরপর রাসূল (সা) মক্কা মুক্ত করার সময় তাঁর সাথে ১০,০০০ লোক ছিল।"[৮৫]

অন্যভাবে এই সন্ধির প্রজ্ঞার বিষয়টি স্পষ্ট বুঝা যায়। রাসূল (সা) মদীনায় যাওয়ার পর কুরাইশদের কাছ থেকে সদ্যমুক্ত আবু বশির নামে একজন মুসলমান রাসূল (সা) এর কাছে চলে আসেন। কুরাইশরা তাকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য দু'জনকে পাঠায়। রাসূল (সা) আবু বশিরকে তাদের হাতে তুলে দেন। মক্কায় ফিরার পথে আবু বশির তাদের একজনকে হত্যা করেন, আরেকজন আবু বশীরের সাথে মদীনায় পালিয়ে চলে আসেন। তিনি রাসূল (সা) এর কাছে এসে বলেন, "আপনার দায়িত্ব শেষ হয়েছে। আপনার উপর থেকে আল্লাহ তা সরিয়ে নিয়েছেন। আপনি যথাযথভাবে আমাকে লোকগুলোর হাতে তুলে দিয়েছেন। আল্লাহ আমাকে তাদের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেন।" রাসূল (সা) বললেন, "তার মায়ের কষ্টের শপথ, তার সাথে কেউ থেকে থাকলে সে একটি যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করে দিত।" তিনি যখন ঐ খবর জানতে পারেন, তখন বুঝতে পারেন যে, তাকে কুরাইশদের কাছে ফেরৎ পাঠানো হবে সেজন্য তিনি মদীনা থেকে পালিয়ে সুদূর সাইফ আল বাহারে চলে যান।[৮৬]

যেসব মুসলমান মক্কায় নির্যাতিত হচ্ছিলেন তারা বিষয়টি বুঝতে পারলেন। ঐ ঘটনা থেকে রাসূল (সা) বললেন, আবু বশিরের লোকের প্রয়োজন ছিল। লোকজন মক্কা থেকে পালাতে লাগলো। তারা সাইফ আল বাহার-এ এসে আবু বশিরের কাছে পালালো। তিনি একটি দল গঠনের লক্ষ্যে এখানে এসে আবু জানদল ইবনে সুহাইল ইবনে আমর ও অন্যান্যদের সাথে যোগ দিলেন। এ দলটি কুরাইশদের বণিকদলের উপর আক্রমণ চালাতো। তাদের প্রহরীদের হত্যা করতো এবং সহায় সম্পদ লুট করে নিতো । কুরাইশরা এ অবস্থায় রাসূল (সা) এর কাছে পত্রপ্রেরণ করলো। তাঁর কাছে তাদের আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে ঐ দলটির জন্য লোক পাঠাতে অনুরোধ জানালো। তারা আরো জানালো যে, মদীনায় যারাই রাসূলের কাছে গিয়েছে তারা তাদের কাছ থেকে নিরাপদে থাকবে (অর্থাৎ কুরাইশরা তাদের জন্য দাবি করবে না)। তাদের এ অঙ্গীকারের ভিত্তিতে রাসূল (সা) ঐ দলটির জন্য লোক পাঠালেন।[৮৭] দলটি ছিল আল আইসের এলাকায়। তারা তাঁর কাছে আসলো। তাদের দলে ছিল ৬০ বা ৭০ জন।[৮৮]

আবু জানদল ও আবু বশির ঈমান আনার কারণে অনেক নির্যাতন সহ্য করেন। মুশরিকদেরকে অপমাণিত করার ব্যাপারে তারা অনেক দৃঢ়তা, নিষ্ঠা, অঙ্গীকার ও সক্রিয় সংগ্রাম করেছিলেন। আর হুদায়বিয়ায় মুসলমানদের উপর যেসব শর্তাবলী চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল তাকে ঘৃণা করতে বাধ্য করেছিল। ঈমানের ব্যাপারে সুদৃঢ় থাকা এবং ঈমানের সমর্থনে এ উদাহরণটি একটি প্রমাণ। এটা আরেকটা প্রমাণ যে, একটা মানুষ যা করতে পারে একটা সমাজও তা করতে পারে না। আবু বশির ও তার দল মুশরিকদের উপর এমন চাপ সৃষ্টি করেছিল এবং তাদের এমন ক্ষতি সাধন করেছিল যে, তখনকার ইসলামী রাষ্ট্র শান্তি চুক্তির শর্তের কারণে তেমন কিছু করতে পারেনি। আবু বশির ও তার দলের কার্যাবলীর উপর ইসলামী রাষ্ট্রের কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকলেও তারা রাসূল (সা) এর অনুমতি ছাড়া কোন কাজ করতো না। শুরুতেই কুরাইশ বণিক দলের উপর আক্রমণ না করার জন্য আবু বশির ও তার দলকে নিষেধ করে দিতে পারতেন কিন্তু রাসূল (সা) তা

করেননি। তিনি তাদেরকে মক্কায়ও ফেরত পাঠান নি। এটাতেও যে রাসূল (সা) এর সম্মতি ছিল তা বুঝা যায়। আবু বশির ও তাঁর দলের লোকজন ছিলেন বেশ জ্ঞানী। যে নির্যাতন তাদেরকে মক্কা ছাড়তে বাধ্য করেছিল তার ব্যাপারে তারা চুপ ছিল না। তাদের নির্যাতনের কারণে আবু বশিররা আর তাদের পূর্ব ধর্মে ফিরে যায়নি এবং মদীনা ছেড়ে যায়নি। তারা এমন একটা পন্থা অবলম্বন করে যে, যা তাদেরকে মুক্তি দান করেছিল, তাদের রাষ্ট্রের প্রতি সমর্থন বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং মক্কার অর্থনীতিকে দুর্বল করে দিয়েছিল।

শুধু তাই নয় তাদের শান্তি চুক্তির সময়ে মুশরিকদের নিরাপত্তার ভিতকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। আমরা এখন এটা বলতে পারি যে, রাসূল (সা) তাদের এসব কার্যাবলীকে নেপথ্যে থেকে সমর্থন যুগিয়েছিলেন। এটির প্রমাণ পাওয়া যায় যখন রাসূল (সা) বশিরকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন। "...যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, তার সাথে অন্যরাও থাকতে পারে ...।"

এসব কারণে এ ঘটনাগুলো ছিল সুপরিকল্পিত, এ ব্যাপারে সৈন্যবাহিনী ও নেতাদের মধ্যে ছিল পারস্পরিক সহযোগিতা, সে জন্য মদীনার ভেতরে ও বাইরে মুসলমানদের উপর কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। সকল মুসলমানই এসব কার্যকারণের ফলাফল থেকে উপকৃত হয়েছিল।

শান্তি চুক্তির কারণে যেসব মুসলমান তাঁর কাছে পালিয়ে গিয়েছিল তিনি শুধু তাদেরকেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কোন মহিলা মদীনায় হিজরত করে গেলে তাকে ফিরিয়ে দেননি। উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা ইবনে আবু মুয়াইত *মুহাজির* হিসাবে তাঁর কাছে আসেন। তার পরিবার তাকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। যখন নিম্নবর্ণিত আয়াত নাযিল হয় তখন আর তাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়নি।

"বিশ্বাসী নারীরা দেশ ত্যাগী হয়ে তোমাদের কাছে এলে তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করো। আল্লাহ তাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে ভাল করেই জানেন। যদি তোমরা জানতে পার যে তারা বিশ্বাসী তবে তাদেরকে অবিশ্বাসীদের কাছে ফেরৎ পাঠিয়ো না। বিশ্বাসী নারীরা অবিশ্বাসীদের জন্য বৈধ নয়। (৬০:১০)[৮৯]

রাসূল (সা) নারীদেরকে তাদের ঈমানের ব্যাপারে পরীক্ষা করে দেখতেন। তারা যদি ইসলাম গ্রহণের কারণে মক্কা ত্যাগ করতো রাসূল (সা) তাদের স্বামীদেরকে ঐ পরিমাণ মোহরানা দিয়ে দিত যে পরিমাণ তার বিবাহের সময়ে মোহরানা হিসাবে দিয়েছিল। শান্তি চুক্তির পূর্বে রাসূল (সা) এভাবে কোন মোহরানা দিতেন না।[৯০]

ঈমান গ্রহণকারী কোন মহিলাকে *মুশরিকদের* কাছে ফেরৎ দেয়া হয়নি। এর কারণ শান্তি চুক্তিতে মহিলাদের ফেরত দেয়ার ব্যাপারে কোন চুক্তি হয়নি। চুক্তিতে শুধুমাত্র পুরুষ লোকদের ফিরিয়ে দেয়ার কথাই বলা হয়েছিল। বুখারীতেও এ বিষয়টির উল্লেখ আছে। "কোন পুরুষ লোক আসবে না ও তোমাদের সাথে যোগ দেবে না।"[৯১] কুরআনেও মহিলাদের ফেরৎ দেয়া সম্পর্কিত কোন শর্তকে বাতিল করে দেয়া হয়েছে,

"তোমাদের কাছে ঈমান গ্রহণকারী কোন আশ্রয়প্রার্থী আসলে তোমরা তা (পরীক্ষা) যাচাই করে দেখবে..." (৬০:১০)[৯২] এ আয়াতের মাধ্যমেই ঈমান গ্রহণকারী মুসলিম নারীদেরকে *মুশরিক* পুরুষ বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে। ইসলামের প্রথম যুগে এ ব্যাপারে অনুমতি ছিল। একইভাবে মুসলিম পুরুষদের *মুশরিক* মহিলাদের বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। "তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না ...।" (৬০:১০)[৯৩]

খালিদ ইবন আল ওয়ালিদ ও আমর ইবনে আস ছিলেন মক্কার দু'প্রভাবশালী বিখ্যাত ব্যক্তি, তারা ইসলাম কবুল করে কুরাইশদের চুক্তি ভংগের পর মদীনায় চলে যান। চুক্তি ভংগে বলা হয়, যেসব নওমুসলিম মক্কা থেকে মদীনায় চলে গিয়েছেন তাদেরকে ফেরৎ দিতে হবে। বিচার কার্যের জন্য কাউকে কুরাইশদের ফেরৎ দিতে হবে নতুনভাবে কৃত চুক্তিতে এমন কিছু ছিল না।

অস্ত্রবিরতি চলে ১৭ থেকে ১৮ মাস। কুরাইশরা যখন তাদের মিত্র বানু বকরকে মক্কার কাছে একটি জলাধারের সন্নিকটে মুসলমানদের মিত্র খুজাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে তখনই অস্ত্র বিরতির পরিমাসমাপ্তি ঘটে।[৯৪]

খুজারা মুসলমানদেরকে সাহায্যের জন্য আবেদন করলে কৃত চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। চুক্তি বাতিলের সরাসরি ফল হলো মক্কার মুক্তি।

পাদটীকা ঃ

১. আল বালাদী, আতিক ইবনে গাইত, *নসব হারব*, পৃ. ৩৫০।
২. ইবনে আল কাইয়িম, *জা'দ আল মা'দ*, ৩/৩৮০
৩. আল বায়হাকী, *দালায়েল আল নবুওয়া*, ২/সেকশন ২১২, *হাসান সনদ* সহকারে ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান এর বর্ণনা হতে, কিন্তু এটি নাফির *মারাসিল* হতে গৃহীত, এটা ইবনে উমরের স্বাধীনতা। নিম্নবর্ণিত সকল পন্ডিত তারিখ সম্পর্কে একমত, আল নবাবী, আল মাজমু, ৭/৭৮; ইবনে কাসির, আল *বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৪/১৬৪; ইবনে হাজার, *আল তালকিস আল হাবির*, ৪/৯০. প্রথম দিককার পন্ডিতগণ স্পষ্টভাবে বলেন, দিনটা ছিল সোমবার, পন্ডিতগণ ছিলেন আল ওয়াকিদি এবং তাঁর শিষ্য ইবনে সা'দ, আল ওয়াকিদি, *আল মাগাযী* ২/৫৭৩; ইবনে সা'দ, *আল তাবাকাত আল কুবরা*, ২/৯৫
৪. *সহীহ আল বুখারী, (ইবনে হাজার, ফাতহুর বারী;* পৃ.১৭৭৮),
৫. আল তাবারি, *তফসীর*, ২৬/৭৭, মুজাহিদের সহীহ সনদ সহকারে এবং এটি মুরসাল।
৬. সহীহ বুখারী (ইবনে হাজার, *ফাতহুরবারী*, হাদীস নং ৪১৭৯)
৭. আল ওয়াকিদি, আল মাগাযি, ২/৫৭৩।
৮. *সহীহ আল বুখারী* (ইবনে হাজার *ফাতহুর বারী*, হাদীস নং ৪১৫১); সহীহ মুসলিম, কিতাব *আল ইসারাহ*, ৭৬; *কিতাব আল জিহাদ ওয়া আল সিয়ার*, ১৩২
৯. ইয়াহিয়া ইবনে মু'ইন, *আল তারিখ*, ১/৩২১; আল বায়হাকী, দালায়েল আল নুবুয়্যা, ২/সেকশন ২/৪। কাতাদার আনানা এর অন্তর্ভুক্ত। তবে এটি এর কোন ক্ষতি করে না, এর কারণ এর মূল হলো *সহীহ*।

১০. আল বুখারী, (ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, হাদীস নং ৩৫৭৬, ১৪৫৩); সহীহ *মুসলিম, কিতাব আল ইমারা*, ৭৩

১১. সহীহ মুসলিম, *কিতাব আল ইমারা*, ৭৫

১২. *সহীহ আল বুখারী*, (ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, হাদীস নং ১৬৯৪, ১৬৯৫)। এটি *মিকাতকে* যুদ্ধের পূর্বে সংগঠিত করে।

১৩. আহমাদ, *আল মুসনাদ*, ৪/৩২৩, *হাসান সনদ সহ*। সীরা ইবনে হিশাম-এ ইবনে ইসহাক স্পষ্টভাবে *সামা* বর্ণনা করেছেন ৩/৩০৮।

১৪. *সহীহ আলবুখারী* (ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, হাদীস নং ৪১৭৯); আহমাদ, *আল মুসনাদ*, ৪/৩২৩, *সনদ* সহকারে যার মানুষগুলো *সিকাহ*, এর মধ্যে ইবনে ইসহাকের *আন আনাহ* রয়েছে। তিনি এটিকে স্পষ্ট করেন যে, তিনি *সিরাহ ইবনে হিশামের* ন্যায় *তাহাদীস* ব্যবহার করেছেন, ৩/৩০৮।

১৫. *সহীহ আল বুখারী*. (ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী* হাদীস নং ১৮২১, ১৮২২, ১৯২৪)। আল বাজার, *হাসান সনদ* সহকারে বর্ণনা করেন। আসাফানে বন্য গাধা শিকার করা হতো। এখানেই *সহীহ* হওয়ার বিষয়টির সমস্যা। আরও বিভ্রান্তি রয়েছে যে, আবু কাতাদাকে সদকা সংগ্রহে প্রেরণ করা হয়েছিল, এগুলোর সাথে মিল খুঁজে পাওয়ার আল কান্দালবীর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কারণ বিভ্রান্তিটি এতই শক্তিশালী যে, এটির বাতিলের জন্য একাধিক রিপোর্টের প্রয়োজন (আওয়াজ আল মাসালিক ইলা মুয়াত্তা মালিক, ৬/৩৫২)।

১৬. *সহীহ আল বুখারী* (*ফাতহুর বারী*, হাদীস নং ৪১৭৯)। তিনি আসাফানের পরিবর্তে গাদির আল আশতাতের কথা বলেছেন। কারণ এটি কাছাকাছি। ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৫/৩৩৪। সে অধ্যায়ে খালিদ ইবনে আল ওয়ালিদের বর্ণনা আছে তার থেকে এটি বাইরে। এটি *মুসনাদ আহমাদ*, ৪.৩২৪, *হাসান সনদসহ*। ইবনে ইসহাক স্পষ্টই বলেছেন যে, তিনি এটি শুনেছেন (*আল সামা*) ইবনে হিশামের সীরাহ, ৩/৩০৮। কিরা আল গামিমের অবস্থানের জন্য, দেখুন, আল বালাদি, মুযাম *আল মা'লিম আল জুগরাফিয়্যাহ*, পৃ.২৪৬।

১৭. *আবু দাউদ, মা'লিম আল সুনান, কিতাব আল সালাহ* পৃ.২১৫। আল হাকীম এর বর্ণনা করেন। আল যাহাবি এটিকে *সহীহ* বলেছেন এবং তার সাথে একমত হয়েছেন। (*আল মুসতাদরাক*. ৩/৩৩৮)। আল বায়হাকী ও ইবনে কাসির এটিকে *সহীহ* বলেছেন (আল বায়হাকী, *আর সুনান আল কুবরা*, ৩/২৫৭; আল কাসির, *তফসীর*, ১/৫৪৮)। ইবনে হাজার এ ব্যাপারে বলেন, "*সনদটি সাইয়েদ।*" (*আল ইসহাব*, ৭/২৯৪)। কিন্তু হাদীসটিতে যুদ্ধটিকে সুনির্দিষ্ট করেননি। ইবনে হাজার বলেন এটা সম্ভবত হুদায়বিয়ার যুদ্ধ হতে পারে। *ফাতহুর বারী*, ৭/৪২৩), এ বক্তব্য জোরালো হয় যখন খালিদ ইবনে আল ওয়ালিদ বলেন যে, তিনি আসাফানের কাছে ছিলেন, এটা ছিল হুদায়বিয়ার যুদ্ধ।

১৮. হাফিয মুহাম্মদ আল হিকমি, *মারবিয়াত গাযওয়াত আল হুদায়বিয়া*, পৃ. ১১৫-১৩৩।

১৯. ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, হাদীস নং ৪১২৫, ৪১২৮; ইবনে আল কাইয়্যিম, জাদ আল মা'দ, ৩/২৫৩; ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৪/৮৩; ইবনে হাজার, ফাতহুর বারী, ৭/৪১৯-২০,

২০. ইবনে হিশাম, *আল সীরাহ*, ৩/২০৩,৩০৪; আল ওয়াকিদি, *আল মাগাযী* ১/৩৯৬।

২১. ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, হাদীস নং ৪১২৯, ৪২৩৩; আবু দাউদ, *সুনান মুয়ালিম আল সুনান কিতাব আল সালাহ*, পৃ. ১২৪০, ১২৪১, আহমাদ, *মুসনাদ*, ২/৩৪৫, *হাসান* সনদসহ।

২২. মুসলিম, *সহীহ কিতাব মিফাত আল মুনাফিকিন ওয়া আহকামিহিন*, মুনাফিকদের বর্ণনা এবং এতদসংক্রান্ত আইন, পৃ.১২।

২৩. ওয়াদি আল উশর-এ সৃষ্ট মক্কার একটি উপত্যকা, এখন জানা যায় এটি আল যাহীর হতে শুরু হয়েছে, হুদায়বিয়ার দক্ষিণে মার-আল জাহরানে এর সমাপ্তি হয়েছে (আল বালাদি, *মুয়ালিম আল জুগরাফিয়্যা*, পৃ.৪৯)। কুরাইশদের বলদা যাওয়ার বিষয়টি কোন *সহীহ সনদে* প্রমাণিত হয়নি। তবে এটি দালাইল *আল নবুয়্যা* কর্তৃক বর্ণনাকৃত, ২/সেকশন ২১৯-২২০, দুর্বল সনদসহকারে উরওয়ার মুরসাল হতে তার বরাবরে গৃহীত। আল ওয়াকিদি (*আল মাগাযী* ২/৫৮২) এবং ইবনে সা'দ (*আল তাবাকাত আল কুবরা*, ২/৯৫) এর উল্লেখ করেন।

২৪. *সহীহ আল বুখারী* (ইবনে হাজার *ফাতহুর বারী*, ৫/৩২৯, হাদীস নং ২৭৩১)। এক বর্ণনা দেখা যায়, রাসূল (সা) পানির জন্য দোয়া করেন এবং কূপে থুথু ফেলেন। *সহীহ আল বুখারী* (ইবনে হাজার, ফাতহুর বারী, হাদীস নং ৩৫৭৭)। তিনি উভয়টিই করেছেন এব্যাপারে কেন আমরা একমত হতে পারি না।

২৫. প্রাগুক্ত।

২৬. আহমাদ, *মুসনাদ*, ৪/৩২৩, হাসান সনদসহ। ইবনে ইসহাক স্পষ্টভাবে *সীরা ইবনে হিশামে তাহাদীস* বর্ণনা করেছেন, ৩/৩০৮।

২৭. *সহীহ আল বুখারী* (ইবনে হাযার, *ফাতহুর বারী*, হাদীস নং ২৭৩১, ২৭৩২)।

২৮. আহমাদ, *মুসনাদ*, ৪/৩২৪; ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ৩/৩০৮, এর *সনদ হাসান*।

২৯. প্রাগুক্ত।

৩০. প্রাগুক্ত।

৩১. আহমাদ, *মুসনাদ* ৪/৩২৪, পূর্বে বর্ণিত, হাসান সনদসহকারে।

৩২. সহীহ মুসলিম, *কিতাবাল ইকরাহ*, পৃ. ৬৯১, জাবির ইবনে আবদ আল্লাহ, তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী।

৩৩. *সহীহ আল বুখারী*, (ইবনে হাযার, *ফাতহুর বারী*, *হাদীস নং* ৪১৬৯); সহীহ মুসলিম, কিতাব আল ইমরাহ, ৮১।

৩৪. মুসলিম, *সহীহ কিতাব আল ইমারাহ*, ৭৬, ৬৭, ৬৮; সহীহ আল বুখারী (ইবনে হাযার, *ফাতহুর বারী*, হাদীস নং ২৯৫৭)।

৩৫. ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৬/১১৮।

৩৬. ইবনে হাযার, *আল ইসাবাহ*, ১১/১৭১।

৩৭. *সহীহ আল বুখারী* (ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, হাদীস নং ৪১৫৪)।

৩৮. *সহীহ মুসলিম*, *কিতাব ফাযায়েল আল সাহাবাহ*, ১৬৩।

৩৯. *সহীহ আল বুখারী* (ইবনে হাযার, *ফাতহুর বারী*, হাদীস নং ৩৬৯৮)।

৪০. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৭৩১, ২৭৩২। আরও দেখুন, আহমাদ, *মুসনাদ*, ৩/৩২৪, ইবনে ইসহাকের বর্ণনা হতে *হাসান সনদ সহকারে*।

৪১. প্রাগুক্ত, *ফাতহুর বারী*, হাদীস নং ২৭৩১, ২৭৩২।

৪২. আহমাদ, *মুসনাদ*, ৪/৩২৪, *হাসান সনদসহকারে*

৪৩. *সহীহ আল বুখারী* (ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, হাদীস নং ২৭৩১, ২৭৩২)

৪৪. প্রাগুক্ত।

৪৫. আবদ আল রাজ্জাক, *আল মুসান্নাফ*, ৫/৩৪৩, ইবনে আব্বাসের হাদীস হতে সহীহ সনদসহকারে এবং আরেকটি আল যুহরীর মুরসাল হতে।

৪৬. *সহীহ আল বুখারী* (ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, হাদীস নং ২৭৩১, ২৭৩২)। এতে বুঝা যায় মাকরাজ যা বলেছেন তাতে সুহাইল কোন ভ্রুক্ষেপ করেন নি। কারণ তিনি আবু জানদালকে মক্কায় ফেরৎ নিয়ে যান।

৪৭. ইবনে আল আসির, মাযদ আল দীন আবু আল সা'দা, *আল নিহ্যায়া ফি গারিব* আল হাদীস, ৩/৩২৭।

৪৮. প্রাগুক্ত, ২/৩৯২, ৩,৩৮০।

৪৯. আহমাদ মুসনাদ, ৪/৩২৫, *হাসান সনদসহ* ইবনে ইসহাক হতে যেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এটি শুনেছেন (*আল সামা*), *সীরাহ ইবনে হিশাম*, ৩/৩০৮।

৫০. *সহীহ আল বুখারী* (ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, হাদীস নং ২৬৯৯)। ইবনে ইসহাক বলেন, তিনি ভাল লিখতে পারেন না তবুও লিখেন," (*ফাতহুর বারী*, হাদীস নং ৪২৫১)। আরেক রিপোর্টে বলা হয়, "আল্লাহর *রাসূল* এটি তাঁর হাত দিয়ে মুছে দেন।" (*ফাতহুর বারী*, হাদীস নং ২৬৯৮, আল বুখারীর সহীহ ভাষ্য হতে গৃহীত)। অন্য বর্ণনায় দেখা যায়, রাসূল (সা) *রাসূল* আল্লাহ" শব্দটি পড়েন। এ দ্বারা, তিনি পড়তে ও লিখতে জানতেন তা বুঝায় না। আবু ওয়ালিদ, আলী ও অন্যরা না জেনে এরূপ ভেবেছেন। আসল কথা হলো, তিনি এ শব্দগুলো বুঝতে পারতেন কারণ এ শব্দগুলো দিয়ে বিশেষ দলিলটি লিখা হয়েছিল, এর দ্বারা তিনি নিরক্ষর ছিলেন বুঝায় না কুরআনে যেমন উল্লেখ আছে। তাঁর পয়গাম্বরীর এটা একটা নমুনা। বেশির ভাগ পন্ডিত বলেছেন "তিনি লিখেছেন" বলতে "তিনি বলেছেন লিখতে হবে।" এটা আমাদের নিরাপদ দিক, এর ফলে কোন ভুল বুঝাবুঝি বা ভুল ব্যাখ্যা হবে না।

৫১. *সহীহ মুসলিম*, *কিতাব আল জিহাদ*, ৯৩।

৫২. *সহীহ* (ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, হাদীস নং ২৭৩১, ২৭৩২)

৫৩. আহমাদ, *মুসনাদ*, ৪/৩২৫, *হাসান সনদ* সহকারে, যাতে, ইবনে ইসহাক, স্পষ্টভাবে তাহদীস ঘোষণা করেন। *সীরাহ ইবনে হিশাম*, ৩/৩০৮। এতে বর্ণিত আছে, উমর প্রথমে আবু বকরের সাথে কথা বলেন এর পর তিনি একই বিষয় নিয়ে রাসূল (সা) এর সাথে কথা বলেন (ইবনে হাযার, *ফাতহুর বারী*, ৫/৩৪৬)।

৫৪. আহমাদ, *মুসনাদ*, ৪/৩২৫, *হাসান সনদ সহকারে*।

৫৫. ইবনে হাযার, *ফাতহুর বারী*, ৫/৩৪৬-৭

৫৬. আহমাদ, *মুসনাদ*, ৪/৩২৫, হাসান সনদসহ

৫৭. প্রাগুক্ত।

৫৮. *সহীহ আল বুখারী* (*ফাতহুর বারী*, হাদীস নং ৩১৮, ৪১৮৯)

৫৯. প্রাগুক্ত।

৬০. আহমাদ, *মুসনাদ*, ৪/৮৬, *সহীহ সনদ* সহ এর বর্ণনা কারীগণ *সহীহ*, হায়সামীর বক্তব্যে এটি বলা হয় (*মাজমা আল জাওয়াইদ*, ৬/১৪৬)। আল হাকিম বলেন, "দু'জন শাইখের মতানুসারে এটি *সহীহ*" (*আল মুসতাদরাক*, ২/৪৬০)।

৬১. সহীহ মুসলিম, *কিতাব আল জিহাদ*, ১৩২।

৬২. *সহীহ আল বুখারী* (ইবনে হাযার, *ফাতহুর বারী*, হাদীস নং ২৭৩১, ২৭৩২); আহমাদ, *মুসনাদ*, ৪/৩২৬।

৬৩. আহমাদ, *মুসনাদ*, ২/৩৪, ১৫১, *সহীহ সনদ সহ*।

৬৪. প্রাগুক্ত। ৪/৩২৪, *সহীহ সনদসহ*।

৬৫. সহীহ মুসলিম, *কিতাব আল হাজ্জ*, ৩৫

৬৬. আবু দাউদ, *মা'লিম আল সুনান*, *কিতাব আল মানাসিক*, ১৭৪৯; সহীহ ইবনে খুযায়মা, ৪/২৮৬-৭; আল হাকিম, আল *মুসতাদরাক*, ১/৪৬৭। তিনি বলেন, "মুসলিমের শর্তানুসারে এটি সহীহ যদিও তিনি এটি বর্ণনা করেননি।"

৬৭. *সহীহ আল বুখারী*, (ইবনে হাযার *ফাতহুর বারী*, হাদীস নং ২০৭১); সহীহ মুসলিম, *কিতাব আল জিহাদ ওয়া আল সিয়ার* ৯৭।

৬৮. আল তাহাবী, *শারহ্ মা'নি আল আসার* ২/২৪২, *সহীহ সনদসহ*।

৬৯. আল ওয়াকিদি, *আল মাগাযী* ২/৬১৬; ইবনে সা'দ, *আল তাবাকাত আল কুবরা*, ২/৯৮।

৭০. ইবনে সাইদ, আল নাস, *উয়ুন আল আসার*, ২/১২৩, ইবনে আইয'র বর্ণনা হতে গৃহীত।

৭১. *সহীহ আল বুখারী* (ইবনে হাজার, *ফাতহুরবারি*, হাদীস নং ১৮১৬, ১৮১৭, ১৮১৮, ৪১৯০); মুসলিম *সহীহ*, *কিতাব আল হাজ্জ*, ৮০, ৮২, ৮৩, ৮৪।

৭২. *ইবনে মাজাহ*, *সুনান*, *ইকামাত আল সালাহ*, ৯৩৬, *সহীহ সনদসহ*।

৭৩. *সহীহ আল বুখারী* (ইবনে মাজাহ, *ফাতহুর বারী*, *কিতাব আল আযান*, ৮৪৬)।

৭৪. ইবনে আল কাইয়্যিম, *জাদ আল মা'দ*, ৩/৩০৫; দেখুন, *ফাতহুর বারী*, *কিতাব আল তিব্ব*, ৫৭৫৫, ৫৭৫৬।

৭৫. আল শাতিবি, *আল ইতিসাম*, ২/৮

৭৬. আবু দাউদ, *মা' মা'লিম আল সুনান*, *কিতাব আল সালাহ* ৪৪৭; আল নাসাই, আল সুনান আল কুবরা, অধ্যায় ১১৯। আল হায়সামী এটিকে *সহীহ* বলেছেন, তাবিয়ুন হতে আবদ আল রহমান ইবনে আল কামাহ সহ। একমাত্র হিব্বানই তাকে *সিকাহ* বলেছেন, তবে কেহই তাকে মাযরুহ, মায মা'আল জাওয়াইদ বলেননি, ১৩১৯; *সিকাহ ইবনে হিব্বান*, ৫/২০৬; ইবনে হাজার *তাহজীব আল তাহযীব*, ৬/২৩০। খায়বারের একই ঘটনা প্রবাহের ধারাবাহিকতা, দেখুন, *ফাতহুর বারী*, ১/৪৪৯।

৭৭. সহীহ মুসলিম, *কিতাব আল লুগাত*, ৭৯; *সহীহ আল বুখারী*, (ইবনে হাজার ফাতহুর বারী, হাদীস নং ৪১৫২); আল গারীয়াবী, *দালাইল আল নবুয়্যা*, উমর হতে খাদ্য বরকতের *হাদীস*, আহমাদ *মুসনাদ*, ৩/৪১৭-৪, আবু আমরা আল আনসারী, আল বায়হাকী, *দালাইল আল নবুয়্যা*, ২/সেকশন ২২২-৩।

৭৮. *সহীহ আল বুখারী* (ইবনে হাযার, *ফাতহুর বারী*, হাদীস নং ৪১৭৭)।

৭৯. প্রাগুক্ত।

৮০. প্রাগুক্ত (হাদীস নং ৪১২৭)। কাতাদার মতে হুদায়বিয়ার বর্ণনাটি আনাস হতে এসেছে। *সহীহ* বর্ণনা হলো, 'এটি তোমার ভাল করতে পারে...' ইকরিমা হতে গৃহীত।

৮১. আবু দাউদ, *মা'লিম আল সুনান*, *কিতাব আল জিহাদ*, ২৭৩৬; আহমাদ, *আল মুসনাদ*, ৩/৪২০; *আল হাকীম*, *আল মুসতাদরাক*, ২/৪৫৯। তিনি বলেন, "*সহীহ সনদসহ* দীর্ঘ হাদীস, যেটির বর্ণনা তারা করেন নি।" আল যাহাবী তার সাথে একমত।

৮২. ইবনে হিশাম, *সহীহ*, ২/৩৯৪, ইবনে ইসহাককের বর্ণনা হতে গৃহীত; আল ওয়াকিদি, *আল মাগাযি*, ২/৭৮৯; আল তাবারী, *আল তারীখ*, ৪/৪৫; ইবনে জান যওয়াহ, *আল আমওয়াল*, ১/৪০১।

৮৩. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ৭৪৩, কায়রো সংস্করণ; আল তাবারী, ১৪২৮, ইউরোপিয়ান সংস্করণ।

৮৪. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ৩/৩২২।

৮৫. প্রাগুক্ত।

৮৬. *সহীহ আল বুখারী* (ইবনে হাযার, *ফাতহুর বারী*, হাদীস নং ২৭৩১, ২৭৩২)।

৮৭. প্রাগুক্ত।

৮৮. আল বায়হাকী, *আল সুনান* আল কুবরা, ৯/২২৭, ইউনুস ইবনে বাকীর সহ সনদসহকারে যিনি একজন সাদুক তবে তিনি ভুল করেন। হাদীসটি *হাসান* কারণ এর অনেকগুলো *মুতাবিয়াত* রয়েছে। দলিলগুলো ইবনে ইসহাকের মাধ্যমে করা হয়েছে; আল বায়হাকী এটিকে আল যুহরীর মাধ্যমে *মুরসাল* বলেছেন। আল আইস-এ এর সংখ্যা দাড়ায় ৩০০ জনে। আবু বশির রাসূল (সা) এর চিঠিটি তার মৃত্যু শয্যায় পেয়েছিলেন। আবু বশির তার পত্র হাতে মৃত্যুবরণ করেন। আবু জান্দাল তাকে সেখানেই সমাহিত করেন। আবু জান্দাল অবশিষ্ট লোকগুলোকে মদীনায় রাসূল (সা) এর কাছে নিয়ে আসেন (*দালাইল আল নবুওয়্যা*, ২/সেকশন ৩৪৩-৪)।

উরওয়া (*দালাইল আল নবুওয়্যা*, ২/সেকশন ২৪৫) হতে একই মুরসাল বর্ণনা রয়েছে। *মুরসাল* হলো যয়ীফ অনেকগুলো সূত্র থাকলে এটিকে জোরালো করা যেতে পারে। তবে উরওয়াহ হলো আল যুহরীর শায়েখ এবং আল যুহরীই উরওয়াহ হতে সবচেয়ে বেশী সংখ্যাক বর্ণনা বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটির বেশী একটি *মা'খরাজ* রয়েছে এবং এটিকে জোরালো করা যাবে না।

৮৯. *সহীহ আল বুখারী*, (ইবনে হাযার, *ফাতহুর বারী*, ২৭১১, ২৭১২)।

৯০. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ৩/৩২৬, উরওয়ার *মুরসাল* হতে; আল বায়হাকী, আল সুনান আল কুবরা, ২/২২৯, আল যুহরীর মুরসাল এবং আবদ আল্লাহ ইবনে আবু বকর ইবনে হাযম।

৯১. *সহীহ আল বুখারী* (ইবনে হাযার, *ফাতহুর বারী*, ২৭১১, ২৭১২), তবে এটি ৬/২৪০, এটি নেয়া হয়েছে *আহাদ* সহ *আকীল লায়েথ* এর মাধ্যমে। *রাযুল* এর পরিবর্তি *আহাদ* নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনা যাচাইয়ের মাধ্যমে যদি সিদ্ধান্ত নেয়া যেতো এবং বর্ণনাটি বিভিন্ন মাখরাজ সত্বেও একই হতো, যে নারীদের এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

৯২. *সহীহ আল বুখারী*, *ফাতহুর বারী*, ২৭১১, ২৭১২।

৯৩. প্রাগুক্ত; আল বায়হাকী, *আন সুনান আল কুবরা*, ৯/২২৮; ইবনে কাসির, *তাফসীর*, ৪/৩৫১।

৯৪. উবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৪/২৭৮, *হাসান সনদসহ*; আল হায়সামী, *মাওয়ারিদ আল যামান ইলা জাওয়ায়িদ ইবনে হিব্বান*, ৪১৪; আল হায়সামী, মাজমা আল *জাওয়ায়িদ*, ৬/১৬২; আল হায়সামী কাসফ আল আসতার *আন জাওয়ায়িদ, আল বায্যার*, ২/৩৪২। আল বায্যারের *সনদ* সম্পর্কে ইবনে হাজার বলেন, "এটি *হাসান মওসুল ইসনাদ* (*ফাতহুর বারী*, ৭/৫২০)।

অধ্যায় ৯

রাজা ও শাসকদের কাছে রাসূল (সা) এর পত্র

হুদায়বিয়ার সন্ধি আরব উপদ্বীপ ও এর বাইরে ইসলাম প্রচারে মুসলমানদেরকে সুযোগ এনে দিয়েছিল। রাসূল (সা) বাইজেন্টাইন সম্রাট সীজারের কাছে দিহিয়্যাহ ইবনে খালিফাহ্ আল কালবিকে; আব্দ আল্লাহ ইবনে হুযাফা আল মাহাসি কে পার্সিয়ান সম্রাট খোসরুর কাছে; আমর ইবনে উমাইয়্যাহ আল দামারীকে আবিসিনিয়ার নেগাসের কাছে; হাতিব ইবনে আবু বালতা' আল লুখামীকে মিশরের সম্রাট আল মুকাওকিসের কাছে; এবং সালিত ইবনে আমর আল আমিরিকে আল ইয়ামাহ'র হাওদাহ ইবনে আলী আল হানাফীর কাছে প্রেরণ করেন।[১]

আল ওয়াকিদি ও আল তাবারির মতে দূতদেরকে প্রেরণ করা হয় হিজরীর ষষ্ঠ বৎসরের যিলহজ্ব মাসে।[২] ইবনে সা'দের মতে এ তারিখ ছিল হিজরীর ষষ্ঠ বৎসরের মুহররমে।[৩] ইবনে কাইয়্যিমও তাঁর এ মত সমর্থন করেন।[৪] ইবনে সা'দের মতে খোসরুর কাছে যখন এ পত্র প্রেরিত হয় সে রাতে খোসরুকে হত্যা করা হয়। এটি সপ্তম হিজরীর জমাদিউল আউয়ালের দশ তারিখ মঙ্গলবার।[৫] আল বুখারী খোসরুর পত্রের বিষয়টিকে নবম হিজরীর তাবুক অভিযানের সময়ে বলে উল্লেখ করেন।[৬] আল বুখারী তাঁর *সহীহ* প্রণয়ণের সময় দিনকালের বিষয়টিকে বিবেচনায় আনেন নি। তিনি সম্ভবত এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, পত্রটি তার কাছে পৌছানো হয় তাবুক অভিযানের পরে। আল হাফিয ইবনে হাযারও বিষয়টির কথা এভাবে বলেছেন। তবে বিষয়টি অনুমাননির্ভর এবং এটিকে সঠিক হিসাবে গ্রহণ করা যায় না।[৭] ইবনে হিশাম বলেন হিজরীর দশম বৎসরে বিদায় হাজ্জের পরে বিভিন্ন সম্রাটের কাছে দূত প্রেরণ করা হয়। তবে পত্রের বিষয় বস্তু হতে এটি স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পত্র প্রেরণের বিষয়টি ঘটে আল হুদায় বিয়ার উমরাহর পরে।[৮] আল হাফিয ইবনে হাজারও এ কথাটিই বুঝাতে চেয়েছেন। ইবনে হিশামের *সীরার* ধারাবাহিক বর্ণনা আল বুখারীর *সহীহ'র* চেয়েও জোরালো। আল হাফিয ইবনে হাজার বলেন *সহীহ আল বুখারীর* কোন কোন বর্ণনাকারী বিভিন্ন রিপোর্টের ধারাবাহিকতা পরিবর্তন করে ফেলেছেন। উদাহরণ হিসাবে তিনি বলেন, আবু বকরের হাজ্জকে প্রতিনিধি দলের রিপোর্টের পূর্বে হিজরীর নবম বৎসরে বা বিদায় হাজ্জকে তাবুকের অভিযানের পূর্বে দেখানো হয়েছে।[৯] হাফিয ইবনে হাজার আরও বলেন, আল বুখারী বিভিন্ন মিশনের বর্ণনা, অভিযানের ও প্রতিনিধি প্রেরণের বিষয়গুলোকে একসাথে করে ফেলেছেন, এতে তাঁর শর্তাদি পূরণ হয়েছে কিন্তু এগুলো যে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সে ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়েছে।[১০]

দু'টো তারিখের মধ্যে ভিন্নতা খুবই সামান্য। ইবনে হাজার সময়ের ব্যবধান সম্পর্কে বলেন, হেরাক্লিয়াসের কাছে দিহিয়্যাকে প্রেরণ করা হয় ষষ্ঠ হিজরীর শেষ দিকে

এবং আল হুদায়বিয়া থেকে রাসূল (সা) এর ফিরে আসার পর, সপ্তম হিজরীর মুহররমে তিনি হেরাক্লিয়াসের কাছে পৌছেন।[১১] *সহীহ হাদীসের* বর্ণনায় দেখা যায় হেরাক্লিয়াসের কাছে রাসূল (সা) এর পত্র পৌছে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে, এটিকে ইবনে হাজার বলেছেন হিজরীর ষষ্ঠ বৎসর।[১২]

আনাস ইবনে মালিক বলেন, "রাসূল (সা) প্রত্যেক অত্যাচারী শাসকের নিকট পত্র লিখেছিলেন।" তিনি খোসরু, সীজার এবং নেগাসের নাম বলেছেন। এর মধ্যে শুধু নেগাসই ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৩]

আরব উপদ্বীপের বাইরে বিভিন্ন রাজার কাছে যে রাসূল (সা) পত্র লিখেছিলেন তাতে বাস্তবতার নিরিখে ইসলামের বার্তার চিরন্তনতার কথাই প্রকাশ করে। ইসলামের দাওয়াতের এ শাশ্বত রূপটি ফুটে উঠে রাসূল (সা) এর মক্কা জীবনে যখন আল্লাহ বলেনঃ

> আমি তো তোমাকে বিশ্ব জগতের প্রতি কেবল রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি। (২১:১০৭)

কুরআনের আয়াতে রাসূল (সা) এর দাওয়াতী কার্যক্রমের বিষয়ে বলা হয়েছে যে, রাসূল (সা) এর কার্যক্রম দেশের ভেতর থেকে দেশের বাইরে প্রসারের ফলে তার রাজনৈতিক প্রভাবই প্রকাশিত হয়েছে। মুসলমানগণ মক্কায় থাকতেই ইসলামের বিশ্বজনিনতা প্রকাশিত হয়। এ সময় মুসলমানগণ নির্যাতিত হয় এবং ভীত হয়।

> স্মরণ কর তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক, পৃথিবীতে তোমরা দুর্বলরূপে পরিগণিত হতে; তোমরা আশংকা করতে যে লোকেরা তোমাদেরকে অকস্মাৎ ধরে নিয়ে যাবে। (৮:২৬)

সহীহ আল বুখারী পত্রের বিষয় উদ্ধৃত করেন (রাসূল (সা) এর পত্রের বিষয় বস্তু)। এখানে তিনি বলেন, রাসূল (সা) বসরার গভর্ণরের কাছে দিহিয়াকে প্রেরণ করেন আর বসরার গভর্ণর রাসূল (সা) এর পত্রটি হেরাক্লিয়াসকে দেন। বিভিন্ন রাজা বাদশার কাছে রাসূল (সা) প্রেরিত পত্রের বিষয়গুলোকে মুহাদ্দিসগণের নির্ধারিত শর্তের মাধ্যমে যাচাই করে নেয়া হয়েছে। এভাবে সনদ ও মূল বিষয় (text) এর ব্যাপারে এগুলোকে ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসাবে ব্যবহারের পূর্বেই পুংখানুপুংখভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা দরকার। এমনকি বিধান হিসাবে এগুলোকে ব্যবহারের পূর্বে আরও বেশী করে যাচাই বাছাই করে দেখা উচিৎ।

> পরম করুণাময়, দয়ালু ও দাতা আল্লাহর নামে। আল্লাহর রাসূল ও তার বান্দা মুহাম্মদ হতে রোমের শাসক হেরাক্লিয়াসের নিকট ঃ সঠিক নির্দেশনা অনুসরণকারীর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহবান জানাই। মুসলমান হউন ও নিরাপদে থাকুন, আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন। আপনি যদি প্রত্যাখ্যান করেন, আপনার লোকজনের পাপ আপনাকে বহন করতে হবে।

'হে কিতাবীগণ, আস সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করি এবং আমাদের কেউ কাকেও আল্লাহ ব্যতীত প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করে'। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল, 'তোমরা সাক্ষী থাক আমরা মুসলমান।'[১৪] (৩:৬৪)

পরবর্তীতে পন্ডিতগণ এ ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে পড়েছেন যে, নাজরানের প্রতিনিধি দল প্রেরণের ব্যাপারে যে আয়াত নাযিল হয়েছিল সে নাজরান নবম হিজরীতে মদীনা আগমন করে।[১৫] এ বিষয়টি পত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং এটি হিজরীর ষষ্ঠ বৎসরের শেষ দিকে প্রেরিত হয়েছিল।[১৬] কোন কোন পন্ডিত বর্ণনাগুলোর ব্যাপারে আপোষের মাধ্যমে বিভ্রান্তি অপণোদনের চেষ্টা করেন। তারা এ ব্যাপারে বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করেন যেমন ঃ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রাসূল (সা) লিখেছিলেন, শব্দের ব্যবহার একইরূপ,[১৭] আয়াতটি দু'বার নাযিল হয়েছিল (পরে তারা এ ধারণা বাতিল করেন);[১৮] আয়াতটি হিজরত শুরুর মুহূর্তে আরও আগেই নাযিল হয়েছিল; বা ইহুদীদের ব্যাপারে এটি নাযিল হয়।[১৯]

এরূপ বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য আয়াতটি নাযিলের কারণ আমাদেরকে (*সাবাব* আল নুযুল) জানতে হবে। নাজরানের প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়েছিল বলে কোন *সহীহ সনদ* পাওয়া যায় না। মুহাম্মদ ইবনে জাফর ইবনে আল জুরাইয়ের *মুরসাল* বর্ণনা-এ ইবনে ইসহাক এ ব্যাপারে অনেক কথা বলেছেন। মুহাম্মদ ইবনে জাফর *সিকাহ*। আল তাবারির সনদ ইবনে ইসহাকের মতামত গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ ইবনে হামিদ আল রাযিও একই কথা বলেছেন, যদিও মুহাম্মদ ইবনে হামিদ-এর সূত্র *যয়িফ*। আলসিদ্দিও বলেন যে, আয়াতটি নাজরানের প্রতিনিধিদল প্রেরণের সময় নাযিল হয়নি এবং আল তাবারির *সনদ* আল সিদ্দি সাথে আসবাতকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে। আসবাতকে *সাদুক* বলা হয়েছে। তিনি অনেক ভুল করেন এবং অনেক অতিরঞ্জিত বিবরণ দেন। আলি ইবনে যাইদ ইবনে যাদান ও একটি *মুরসাল* রিপোর্টে একই কথা বলেছেন তবে তাকে দুর্বল বর্ণনাকারী বলা হয়। এ তিনটি বর্ণনাই *মুরসাল*, তাদের সবগুলো সনদেই ভুল রয়েছে।

আল তাবারির[২০] তফসীরের একটি বর্ণনা তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। এ রিপোর্টের কাতাদা'র একটি *হাসান মুরসাল সনদ* রয়েছে। এ বর্ণনা ইবনে যুরাইযের *মুরসাল সনদে* কিছু দুর্বলতা রয়েছে আবার আল রাবি ইবনে খুতাইমের *মুরসাল সনদেও* কিছু দুর্বলতা রয়েছে। এ তিনটি *মুরসাল* রিপোর্টের বক্তব্য হলো "বল, হে কিতাবীগণ..." (৩:৬৪) নাযিল হয়েছিল মদীনার ইহুদীদের উদ্দেশে, তাদেরকে সাধারণ শর্তেই আহবান করা হয়। এটা হয়ে থাকলে আয়াতটি নাযিল হয়েছিল ইহুদিদের বহিষ্কারের পূর্বে, এবং সর্বশেষ বহিষ্কারের ঘটনা ঘটে পাঁচ হিজরীতে খন্দকের যুদ্ধের পূর্বে। এসব বক্তব্য থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, আয়াতটি নাযিল হয়েছে হেরাক্লিয়াসের কাছে পত্রটি হস্তান্তরের পূর্বে। আলবুখারীর *সহীহ* গ্রন্থে পত্রের মূল বিষয়টি (text) উলে-খের কারণে এটাই নির্দেশ করে যে, তিনি ঐ বর্ণনাগুলোকে আমলে নিয়েছিলেন,

যে বর্ণনাগুলোতে বলা হয়েছে যে, আয়াতটি পূর্বেই নাযিল হয়েছিল। এরূপ না হলে তাঁর *সহীহ* গ্রন্থে পত্রের মূল বিষয়ের উল্লেখ করতেন না।

একটি পত্রের *সহীহ'র* মূল পাঠ্যাংশে আয়াতটি বর্ণিত হয়েছে, পত্রটি লেখা হয়েছিল হিজরী ষষ্ঠ বৎসরে। সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ হলো, নাজরান থেকে প্রতিনিধিদল মদীনায় আসার পূর্বে আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। পত্রের মূল পাঠ্যাংশই পূর্ববর্তী মতামতের বিষয়ে একটি নির্দেশনা দিবে; এসব আলোচনা ও মতামত থেকে এটা স্পষ্ট যে, পত্রের মূল পাঠ্যাংশের ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।

রাসূল (সা) কর্তৃক খোসরুকে প্রেরিত পত্রের মূল পাঠ্যাংশের বর্ণনা ছাড়াই আল বুখারী তার *সহীহ* গ্রন্থে বিষয়টি বর্ণনা করেন। বুখারী বলেন যে, রাসূল (সা) পত্রটি সহ আবদ্ আল্লাহ ইবনে হুযাফা আল সাহামীকে বাহরাইনের গভর্ণরের কাছে পাঠান। তাকে পত্রটি হস্তান্তর করতে রাসূল (সা) আবদ্ আল্লাহকে নির্দেশ দিয়ে পাঠান। এ সময় বাহরাইনের গভর্ণর ছিল আল মুন্দির ইবনে সাবী আল উবাদী। আল মুন্দির পত্রটি খোসরুকে দেন। খোসরু পত্রটি পড়ে টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলেন। রাসূল (সা) এ সংবাদ পেয়ে মর্মাহত হলেন। তিনি তাকে বদদোয়া করে বলেন, আল্লাহ তাকে "টুকরা টুকরা করে ফেলবেন এবং সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেবেন"।[২১] আল্লাহ খোসরুর রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। খোসরু তার পুত্রের হতে নিহত হন। পুত্র তার সিংহাসনে বসে। এভাবে পার্সিয়ান সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যায় আর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। খোসরোকে লেখা পত্রের মূল পাঠ্যাংশটি কোন সহীহ রিপোর্টে প্রমাণিত হয়নি। তবে আল তাবারি ও অন্যান্যগণ এটিকে *যঈফ সনদ* বলেছেন।

সহীহ মুসলিমে বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, রাসূল (সা) নেগাসের কাছে একটি পত্র লিখেছিলেন। ইমাম মুসলিমের মতে নেগাস ইসলাম কবুল করেনি।[২২] পত্রের মূল পাঠ্যাংশটি প্রমাণিত নয়। তবে ইবনে ইসহাক সনদ ছাড়াই এটি বর্ণনা করেন।[২৩]

মিকারের শাসনকর্তা আল মুকাওকিসকে লেখা দু'টি পত্রের জবাব দেয়া হয়, তবে এগুলো কোন সহীহ রিপোর্টে প্রমাণিত হয়নি। একইভাবে দামেস্কের শাসক আল হারিস ইবনে আবু শুমর্ আল ঘাসানি, ইয়া মামার শাসক হাওদা ইবনে আলি আল হানাফি, ওমানের শাসক যয়ফর ও আবদ ইবন্ আল যালান্দি'র নিকট লিখিত পত্রের মূল পাঠ্যাংশ *হাদীসের* দৃষ্টিকোণ থেকে *সহীহ* প্রমাণিত হয়নি। এর দ্বারা এটা বুঝায় না যে, রাজা ও শাসকদেরকে কোন পত্র লেখা হয়নি, বা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে পত্রের মূল পাঠ্যাংশকে খন্ডন করতে হবে। পত্রের বিষয় ও প্রাসঙ্গিকতার বিচারে এগুলো এখনো *সহীহ* হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। বিধানগত বিষয়ে এগুলোকে কোন প্রমাণ হিসাবে নেয়া যাবে না।

সুতরাং হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে হেরাক্লিয়াসকে লেখা পত্রের মূল পাঠ্যাংশকেই *সহীহ* হিসাবে গ্রহণ করা যায়। তাছাড়া এ পত্রটিকে ঐতিহাসিক সমালোচনার উদ্দেশে অন্য পত্রের সাথে তুলনা করার লক্ষ্যে গ্রহণ করা যায়।

সীরাহ যুগের পর থেকেই এ বিবেচনাটি অন্যান্য সকল দলিলের বেলাতেই প্রযোজ্য। হাদীসের দৃষ্টিকোন থেকে দলিলগুলোকে *সহীহ* হিসাবে প্রমাণ করা না গেলেও এ বিবেচনা প্রযোজ্য হবে। ছয়টি *সহীহ* হাদীস গ্রন্থে এ পত্রগুলোর ব্যাপারে কোন উল্লেখ করা হয়নি। শুধুমাত্র হেরাক্লিয়াসকে লেখা পত্রটিই *সহীহ আল বুখারীতে* বর্ণিত হয়েছে। আর জুনান এ আবুদাউদকে উমায়ের যু-মারানকে লেখা পত্রটির কথাই বর্ণিত হয়েছে।[২৪] অনেকগুলো পত্র ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে *সহীহ* হলেও সেগুলোকে ইসলামী তত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রমাণ হিসাবে এবং আকীদা ও শরীয়া হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না।[২৫]

এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা) যখন বাইজেন্টিয়ান শাসককে লেখার মনস্থ করলেন, তখন তাঁকে বলা হলো যে, পত্রের উপর সীল মারা না হলে বাইজেন্টিয়াম শাসক তা গ্রহণ করবে না। তখন একটি রূপার সীলা বানানো হলো আর তাতে "আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ"[২৬] খোদাই করা হলো। রাসূল (সা) এভাবে নিয়ম ও লৌকিকতার ভিত্তিতে ইসলামী রাজনীতির নমনীয় পদ্ধতিকে দেখালেন। তাঁর এ নীতির সাথে ইসলামের সাধারণ চেতনা মোটেও সাংঘর্ষিক নয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে, হেরাক্লিয়াসকে যে পত্রটি লিখা হয়েছিল তাতে ইসলামী বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা হয়েছিল। পত্রটি শুরু করা হয় *বিসমিল্লাহ* দিয়ে। অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে ইসলাম ও মুহাম্মদ (সা) এর পয়গাম্বরীত্বে বিশ্বাস আনয়নের জন্য পত্রে আহবান জানানো হয়। একই সাথে পত্রটিতে পান্ডিত্ব, ইসলামের হৃদয়গ্রাহী দাওয়াত এবং জনগণের মধ্যে অবস্থানগত কারণে প্রাপকের ("বাইজেন্টিয়ান শাসক") প্রতি যথা সম্মান, ইসলাম কবুল করা হলে তাকে যে পুরস্কার দেয়া হবে তার উল্লেখ, তার জনগণকে ইসলাম হতে দূরে সরিয়ে রাখলে তাকে যে শাস্তি দেয়া হবে তার বিবরণ পত্রে উল্লেখ করা হয়।

পাদটীকা ঃ

১. আল তাবারী, *তারিখ*, ২/২৮৮ (মিশরীয় সংস্করণ); ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ৪/২৭৯। তিনি আল যালানদির পুত্র যাফর ও ইয়াদ এর কাছে আমর ইবন আল আসকে পাঠানোর ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন। ইবনে হিশামের সনদ *মুনকাতি;* তার এবং বর্ণনাকারীর মধ্যে একজন *মাজহুল* বর্ণনা কারী রয়েছে। বর্ণনা কারীটি হলো আবু বকর আল হুযালি, তিনি একজন আখবরি এবং হাদীসে *মাতরূক* (তাকরিব, ২/৪০১) ইবনে সা'দ, *আল তাবাকাত,* ১/২৫৮ (বৈরুত সংস্করণ), আল ওয়াকিদির বর্ণনা হতে, তার সনদের চারজন সাহাবী সংযুক্ত আছেন। *মুহাদ্দিসদের* মতে আল ওয়াকিদি *মাতরূক*। ইবনে সা'দ এ চেইন অনুযায়ী বেশির ভাগ বর্ণনা বর্ণনা করেন। তিনি বর্ণনাগুলো যাচাই করে এক সাথে করেছেন এবং চার সাহাবীর কথা এক করেছেন এবং সংযুক্তিকরণকে একটি মূল বিষয় হিসাবে উপস্থাপন করেছেন।

অবশিষ্ট দূত ও পত্রাবলী হিশাম আল কালাবির মাধ্যমে পাঠানোর ব্যাপারে ইবনে সা'দ কিছু কিছু রিপোর্টের উল্লেখ করেন। হিশাম আল কালবি *যয়িফ*। আলি ইবনে মুহাম্মদ আল মাদানী *সাদুক* (সিয়ার ই'লাম আল নুবালা, ১০/৪০০)। এরপর ইবনে সা'দ এ দু'টি সূত্রের মাধ্যমে যা বর্ণনা করেছেন তা *মুরসাল* বিধায় ত্রুটিমুক্ত নয়।

২. প্রাগুক্ত।

৩. ইবনে সা'দ, *আল তাবাকাত*, ১/২, ১৫।

৪. ইবনে আল কাইয়্যিম, *জা'দ আল মা'দ*, ১/৩০, ইবনে হাজারের মতে এটি ছিল আল ওয়াকিদির পরামর্শ (*ফাতহুর বারী*, ১/৩৮)। ইবনে হাজার আল তারিখ-এ এর বর্ণনা করেন, খলিফা দূত পাঠানোর সময় বলেছেন হিজরীর পঞ্চম বৎসরে। তবে এটি ছিল ভুল। আল তারিখ-এর পৃ. ৭৯ এ খলিফা বলেন যে, এটি ছিল হিজরীর ষষ্ঠ বৎসরে। আল হাফিয হয়ত অন্য কোন কপি পড়তে পারেন বা এটি হতে বর্ণনার বেলাতে বিভ্রান্ত হতে পারেন।

৫. ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৪/১২৭। যে তারিখের কথা বলা হয়েছে সে তারিখে খোসরু তার পুত্রের হাতে নিহত হয়, শীরাওয়ে (ইবনে সা'দ, *তাবাকাত*, ১/২৬০)।

৬. প্রাগুক্ত।

৭. প্রাগুক্ত।

৮. প্রাগুক্ত।

৯. প্রাগুক্ত।

১০. প্রাগুক্ত, ৮/৯৭

১১. প্রাগুক্ত, ১/৩৮

১২. প্রাগুক্ত, ১/৩২, ৩৯

১৩. সহীহ মুসলিম, ৩/১৩৯৭

১৪. ইবনে হাজার, *ফাতহুরবারী*, ১/৩২, ৮/১২৬।

১৫. ইবনে ইসহাক, সনদ ছাড়া (সীরাহ ইবনে হিশাম, ২/২০৭, ২১৫)

১৬. ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ১/৩৯; আল কাসতালানী, *আল মাওয়াহিব আল লাদুনিয়্যা*, ১/২২৩; আল যারকানি। *শারহ্ আল মাওয়াহিব*, ৩/৩৩৮।

১৭. ইবনে হাযার, *ফাতহুর বারী*, ১/৩৯; আল কাসতালানি, *আল মাওয়াহিব*, ১/২২৩।

১৮. প্রাগুক্ত।

১৯. ইবনে হাজার, ফাতহুর বারী, ১/৩৯; আল সাবুনি, *মুখতাসার তাফসীর ইবনে কাসির*, ১/২৮৭।

২০. দেখুন, তাফসীর আল তাবারীর মধ্যে এ বর্ণনাগুলোর *সনদ*, ৩/৩০২-৪। যে কেউ লক্ষ্য করতে পারেন তার সনদটি কাতাদা'র সাথে যুক্ত এবং এটি *হাসান সনদ*। তার সনদটি আল রাবি ইবনে খুযাইম এর যুক্ত এবং আল মুসান্না এর সাথে সংযুক্ত, তার সত্যতা সম্পর্কে জানা যায় না। আবদ্ আল্লাহ ইবনে আবু যাফর *সাদুক* কিন্তু তিনি ভুল করেন। সনদটি আবদ আল মালিক ইবনে আবদ আল আযিয ইবনে যুরিয'র সাথে যুক্ত এবং এর সাথে আল কাসিম ইবনে ইসা'আল ওয়াসিতি সংশ্লিষ্ট, তিনি সাদুক এবং তার পরিবর্তন হয়েছে এবং আল হুসায়ন ইবনে বিশর আল হিমসি কোন ভুল করেননি। বর্ণনাগুলোর সনদের এই-ই-অবস্থা যা মদীনায় ইহুদীদের ব্যাপারে আয়াত নাজিল হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করে। এ বর্ণনা এর সনদ এর বক্তব্যে নাজরান প্রতিনিধির ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হওয়ার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এর সাথে আল সিদ্দি যুক্ত আছে, এর সাথে *সাদুক* আমবাত ইবনে নাসরও জড়িত। তিনি অনেক ভুল করেন এবং তাঁর অন্য বৈশিষ্ট্যও আছে। ইবনে ইসহাকের সনদের সাথে মুহাম্মদ ইবনে হামিদ আল রাযিও যুক্ত আছেন। তাকে হাফিয বলা হয়। তবে এটি *যয়িফ*। তৃতীয় বর্ণনাটির সাথে আলী ইবনে জাহিদ ইবনে যাদান জড়িত, তিনি *যয়িফ*।

২১. ইবনে হাজার, ফাতহুর বারী, ৮/১২৬। আলবুখারীর বর্ণনা বাহরাইনের গভর্ণরের নাম নেই।

২২. ইবনে ইসহাক, সীরাহ, ২১০। অন্য সূত্রগুলোতে দু'টো ভিন্ন ধরনের মূল পাঠ্যাংশ পাওয়া যায় (দেখুন, মুহাম্মদ হামিদ আল্লাহ, *মাজমু আল ওয়ামায়েক আল সিয়াসিয়াহ,*) নং ২১; মাকাবিল, পৃ. ৪৫। মুহাদ্দিসগণের এ বর্ণনাগুলো প্রমাণিত হয়নি। কারণ এগুলো সহীহ সনদে বর্ণিত হয়নি। নেগাস রাসূল (সা) এর কাছে যে দু'টো পত্র লিখিছিলেন তার ব্যাপারেও এটি প্রযোজ্য। (হামিদ আল্লাহ, *মজ-যমুয়াহ আল ওয়াসাইক,* নং ২৩, ২৪)

২৩. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৭৪।

২৪. আবু দাউদ, *সুনান,* ২/৩৮-৯।

২৫. ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী,* ১০/৩২৪।

২৬. ফরাসী প্রাচ্যাবিদ বারথেলিমি আল মুকাওকিসকে রাসূল (সা) এর লেখা পত্র (প্রাচীন চামড়া খন্ডে লেখা) ১৮৫০ খ্রি. মিশরের আখমিম অঞ্চলে দেখতে পান। তিনি ১৮৫৪ খ্রি. এ এটি *আল মাযাল-হ আল আসায়াবিয়াতে প্রকাশ করেন।* ইস্তাম্বুলের টোপকাপি জাদুঘরে এটি রক্ষিত আছে। এটি দেখতে পাতলা ও ময়লাটে, মাঝখানে এটিতে একটি ফাটা আছে, তবে এখনো এটি পড়া যায়। এম বেলিন এটি প্রত্যয়ন করেন এবং নলদিক তার সাথে এক মত হন।

১৮৬৩ খ্রি. এ জার্মান ড. বুস একটি জার্মান ওরিয়েন্টালিস্ট সাময়িকিতে মুনযির ইবনে সওয়ি'র কাছে রাসূল (সা) এর লেখা পত্রের বিষয়টি আবিষ্কার করেন। তবে এটি ভালভাবে প্রমাণিত হয়নি।

১৯৪০ খ্রি. এ ইংলিশ ওরিয়েন্টালিস্ট ডানলপ রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি জার্ণালে ঘোষণা করেন যে, তিনি একটি চামড়ার টুকরা পেয়েছেন। এটি ছিল নেগাসকে লেখা রাসূল (সা)-এর পত্র। তিনি এর সত্যতার বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন।

১৯৬৩ খ্রি. এ ড. সালাহ আল্ দিন আল মুনায্যিফ বৈরুতের *আল হায়া* পত্রিকায় ঘোষণা করেন যে, রাসূল (সা) কর্তৃক খোসরুকে লেখা পত্রটি প্রায় প্রমাণিত সত্য।

১৯৭৩ সালে রাসূল (সা) এর সময়ের একটি পঞ্চম দলিল আবিস্কৃত হয়। এটি ১০০০ বৎসরেরও বেশী পুরনো। তবে এটির সত্যতা এখনো নির্ণিত হয়নি।

বেশিরভাগ ওরিয়েন্টালিস্ট-এর কাছে এ পত্রগুলোর কোনটিই সত্য কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। এদের মধ্যে *The life of Muhammad* এবং *The Caliphates* গ্রন্থে ইংলিশ ওরিয়েন্টালিস্ট উইলিয়াম মুৎর, *Annali del Islam* গ্রন্থে ইটালিয়ান ওরিয়েন্টাল এল সিতানি, *Muhammad* গ্রন্থে থিইশ ওরিয়েন্টালিস্ট মারগোলিউথ উল্লেখযোগ্য। তাদের চিন্ত া কেন্দ্রিভূত হয়েছে ইসলাম ধর্মটি মূলত ঃ আরবদের জন্য এ তথ্যের উপর ভিত্তি করে; ইসলামিক রাষ্ট্র ছিল দুর্বল, তারা ঐ সময়ে আন্তজার্তিক হুমকি মোকাবেলায় সক্ষম ছিল না। ইবনে ইসহাক পত্রগুলোর ব্যাপারে কোন কিছু উল্লেখ করেননি, কারণ এগুলো ছিল উপকথাতে ভরপুর। এর মধ্যে কতগুলোর মধ্যে ছিল কুরআনের আয়াত যেগুলো পত্র প্রেরণের দু'বছরপরে অবতীর্ণ হয়। এসব আলোচনা এ দলিলগুলোর ঐতিহাসিক যে মূল্য আছে তা অস্বীকার করার জন্য যথেষ্ট নয়। যে পত্রগুলো আবিস্কৃত হয়েছে সেগুলোকে গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার, তখনই এগুলো সত্য কিনা বুঝা যাবে।

এ পাদটীকায় বর্ণিত বিষয়ের তথ্য জানার জন্য দেখুন ঃ ড. ইজ্জত আলি-কাহ বি রাসাইল আল নবী ইলা আল মুলুক ফি আসরিহি গ্রন্থের বুহুত *আল মু'তামার আল আলামি আল সালিত লি আল সীরাহ ওয়া আল সুন্নাহ আল নবাবিয়্যাহ* (Research of the Third International Conference of the Prophetic *Sirah* and *Sunnah*), কাতার, ২৬০ হি.।

অধ্যায় ১০

বেদুঈনদের শৃঙ্খলাকরণ

শান্তি চুক্তির সময়েও বেদুঈনরা বিভিন্ন ঝামেলা করেছিল। তবে সেগুলো এত মারাত্মক ছিল না। মুসলমানদের ইসলাম প্রচারের স্বাধীনতার ব্যাপারে এর তেমন কোন প্রভাব ছিল না। ঐ সময়ে পরিচালিত কিছু অভিযানের বিষয় নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

যাত আল কারাদের যুদ্ধ

খায়বার যুদ্ধের তিনদিন পূর্বে এ অভিযান পরিচালিত হয় যখন আবদ আল রাহমান ইবনে উয়াইনা ইবনে হুসান আল ফাজারী রাসূল (সা) এর কিছু উট নিয়ে যায়। মুসলমানদের সতর্ক করে সালামাহ ইবনে আল আকওয়া তাকে ধাওয়া করেন। রাসূল (সা) বের হয়ে দেখলেন সালমাহ ইবন আল আকওয়া লুটেরাদের কাছ থেকে উটগুলো উদ্ধার করেন এবং তাদেরকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন। রাসূল (সা) যাত আল কারাদ পর্যন্ত বাইরে গিয়ে আবার মদীনায় ফিরে আসেন।[১]

উক্ল ও উরাইনার কথা

যাত আল কারাদের অভিযানের পর উক্ল ও উরাইনার গোত্রের কিছু লোক মদীনায় এসে ইসলাম কবুলের কথা ঘোষণা করে। তারা রাসূল (সা) এর কাছে শহরের বাইরের গ্রাম এলাকায় বসবাসের অনুমতি প্রার্থনা করে। তারা মদীনার আবহাওয়া সহ্য করতে পারছিল না। রাসূল (সা) তাদেরকে কিছু দুধের উট ও একটি মেষপালক দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তারা শহর থেকে বাইরে যাওয়ার পরই স্বধর্ম ত্যাগ করে আর মেষ পালটিকে হত্যা করে এবং তার উটগুলোকে তাড়িয়ে দেয়।

রাসূল (সা) কিছু লোককে তাদেরকে ধাওয়া করতে বলেন। দুস্কৃতিদের তাঁর কাছে ধরে আনা হলো। তাদের চোখে লোহার দাগ দেয়া হলো। তাদের হাত কাটা হলো। তাদেরকে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আল হাররায় রেখে দেয়া হলো। রাসূল (সা) এরপর থেকে অংগচ্ছেদ নিষিদ্ধ করে দিলেন।[২]

যাত আল রিকা

সীরাহ লোকগণের মধ্যে এ অভিযানের তারিখ নিয়ে বিভ্রান্তি আছে। আল বুখারীর মতে খায়বার যুদ্ধের পর এ অভিযান অনুষ্ঠিত হয়। ইবনে ইসহাকের মতে বানু আল নাদিরকে বহিষ্কার ও খন্দকের যুদ্ধের পূর্বে চার হিজরীতে এ অভিযান সংঘঠিত হয়। ইবনে সা'দ ও ইবনে হিব্বানের মতে মুহররমের পঞ্চম বৎসরে এ অভিযান পরিচালিত হয়। আবু মা'শায়ের মতে বানু কুরাইযা ও আল খন্দক অভিযানের পর এ অভিযান চালানো হয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই আল বুখারী ও আবু মা'শারের মতটি প্রতিফলিত হয়েছে। কারণ আবু মূসা আল আশআরী এ অভিযানে শরীক হন। তিনি খায়বারের অভিযান শেষ হওয়া মাত্রই আবিসিনিয়ায় ফিরে আসেন; এ অভিযানে আবু হোরায়রাও অংশ নেন। খায়বার বিজয়ের পর তিনি মুসলমান হন। এ অভিযানকে *যাত আল রিকা* বলা হয় এবং নজ্দ অভিযানও বলা হয়। তাছাড়া এটি বানু মুহারিব ওয়া বানু সালাবাহ মিন গাতাফান (বানু মুহাবির ও গাতফানের বানু সালাবাহ-এর বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান) নামেও খ্যাত।

মুসলিমগণ কোন যুদ্ধ ছাড়াই গাতাফানের সমাবেশ পর্যন্ত পৌছান। কোন কোন মুসলমান এ অভিযানে ভীত হন।

মদীনা থেকে দু'দিনের পথ নাখলা। তারা এখানে *খাওফের* সালাত আদায় করেন। এর পর তারা মদীনায় ফিরে আসেন। এ অভিযানকে কেন "*যাত আল রিকা*" বলা হয় এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। আবু মূসা আল আশঅরীর মতে তার জুতা ছিড়ে যাওয়ার পর পায়ের চার দিকে জীর্ণ কাপড় (রিকা) পেঁচায়ে নিত বলেই এটিকে *যাত আল রিকা* বলা হতো। প্রতি ছয় জনের জন্য এখানে ছিল একটি উট, তারা পালাক্রমে উটে চড়তো।[৩]

পূর্বেকার ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনাগুলোর দিকে তেমন মনোযোগ দেননি। এর কারণ বিভিন্ন রাজা বাদশা ও রাজপুত্রদের কাছে প্রেরিত পত্রাবলীর দিকে তারা মনোযোগী ছিলেন বেশী।[৪] তারা তাদের মনোনিবেশ করেন খায়বারের বিজয়ের বিভিন্ন অতিরিক্ত বর্ণনা *কাযা উমরাহ* কালীন মুসলমানদের মক্কায় যাওয়ার বিষয়গুলোর উপর।

খায়বারের পতনের পর সিরিয়ার সীমান্তবর্তী উত্তরাঞ্চলের এলাকাগুলোর উপর মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ এসে যায়। গাতফানের বিরুদ্ধে পরিচালিত *যাত আল রিকা* অভিযানকে পরিচালনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। (খায়বারের ইহুদীদের পর গাতফানরা ছিল এ অভিযানের দ্বিতীয় শক্তিশালী গ্রুপ)। মুতা অভিযানের ঠিক পরপরই একই দিকে অভিযান পরিচালিত হয়। তবে মুসলমানদের কাবা যিয়ারত ও কাযা উমরাহ পালনের কারণে (অর্থ্যাৎ, যে উমরাহটি হুদায়বিয়ার সময়ে করা যায়নি) মুতায় সৈন্য প্রেরণ কিছুটা দেরি হয়ে যায়।

পাদটীকা

১. ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৮/৪৬১; সহীহ মুসলিম, ৩/১৪৩২। ইবনে ইসহাক ও অন্য *সীরাহ* লেখকগণের মতে অভিযানটি পরিচালিত হয় হুদায়বিয়া সন্ধির পূর্বে হিজরীর ষষ্ঠ বৎসরে, ফাতহুর বারী, ৭/৪৬০। আল বায়হাকী বলেন "আমরা যে বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত সেটি হলো যাত কারাদও সংগঠিত হয় আল হুদায়বিয়া ও খায়বারের পরে। সালামাহ ইবন আল আকওয়া'র বর্ণনায় এর স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৭/৪২০-১। এ অভিযানের সময় *সালাতুল খাওফ* আদায় করা হয়। তবে খন্দকের অভিযানের পর এ বিধান চালু করা হয়। খলিফা ইবনে খাইয়াতের মতে উয়ায়না ইবনে হাসানই উটগুলো আক্রমণ করেছিল, তার পুত্র আবদ আল রাহমান নয় (*তারিখ খলিফা*, ৭৭)।

২. ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৭/৪৫৮।

৩. প্রাগুক্ত ৭/৪১৬-৪২১।

৪. এ ঘটনাটি রাসূল (সা) এর হুদায়বিয়াহ হতে ফিরে আসার ঠিক পরে ঘটেছিল। ইবনে সা'দ তাদেরকে পাঠানোর তারিখের উল্লেখ করেছেন। হিজরীর সপ্তম বৎসরের মুহররমের প্রথম দিবসে তাদের ছয়জনকে পাঠানো হয়। তাবাকাত, ১/২/১৫, ইউরোপীয় সংস্করণ)। ইবনে আল কাইয়্যিম তার পথ অনুসরণ করেন। (*জা'দ আল মা'দ*, ১/৩০), আল তাবারী এ তারিখকে আরও কিছুটা আগের দিকে উল্লেখ করেন। তিনি এটিকে ছয় হিজরীর জ্বিলহাজ্জ বলে উল্লেখ করেন *তারিখ আল তাবারী*, ২/২৮৮)।

অধ্যায় ১১

ক্বাযা উমরাহ

হিজরীর ষষ্ঠ বৎসরের যিলকদ মাসে রাসূল (সা) উমরাহহ পালনের জন্য মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা দেন। কুরাইশদের সাথে হুদায়বিয়ার[১] সন্ধি অনুসারে রাসূল (সা) উমরাহর উদ্দেশে মক্কা যান। "তোমরা কোন অস্ত্র নিয়ে মক্কায় যেতে পারবে না। শুধু মাত্র খাপে একটি করে তলোয়ার নিতে পারবে। মক্কাবাসীর কেউ মক্কা ত্যাগ করে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তারা ইচ্ছে করলে মক্কায় থাকতে পারে।[২] সন্ধি চুক্তি অনুযায়ী তারা মক্কায় থাকার জন্য রাযী হয় এবং তিন দিন পরে চলে যাওয়ার বিষয়ও চুক্তিতে লিপিবদ্ধ হয়।[৩]

মূসা ইবনে উকবার মতে কুরাইশদের বিশ্বাসঘাতকতার ভয়ে মুসলমানগণ তাদের সাথে অস্ত্র বহন করে নিয়ে যান। তবে অস্ত্রগুলো তারা হারাম শরীফের বাইরে রেখে[৪] নারী-শিশু ছাড়াই এ *কাযা উমরাহতে* ২০০০ পুরুষ যোগদান করেন। তাদের সাথে হুদায় বিয়ার সন্ধি যারা প্রত্যক্ষ করেছেন তারাও ছিলেন।[৫] রাসূল (সা) মক্কায় প্রবেশের সময় আবদ আল্লাহ ইবনে রাওয়াহা তাঁর সামনে সামনে হেঁটে যান আর বলতে থাকেন।

অবিশ্বাসীগণ তাঁর পথ থেকে সরে যাও, তাঁকে পথ করে দাও, ওহী
নাযিলের ব্যাপারে, আমরা তোমাদের সাথে লড়াই করে তোমাদের
গর্দান থেকে মাথা সরায়ে ফেলবো আর অমনোযোগী বন্ধুদেরকে
মনোযোগী বন্ধুতে পরিণত করবো"[৬]

মুসলমানগণ কাবার চারদিকে *তাওয়াফ* করলেন।

রাসূল (সা) সাহাবীদেরকে মজবুতির সাথে তাদের *তাওয়াফ* সমাধা করার নির্দেশ দিলেন। কারণ ইতোমধ্যে কুরাইশরা গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে যে, মুসলিমরা দুর্বল। ইয়াসরিবের জ্বর তাদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে। মুসলমানগণ প্রথম তিনবার প্রদক্ষিণ করলেন।[৭] কুরাইশরা মক্কা থেকে বের হয়ে কায়কান পাহাড়ে চলে গেল। তারা সেখান থেকে মুসলমানদের *তাওয়াফ* পর্যবেক্ষণ করছিল।[৮] কুরাইশরা মুসলমানদের শক্তি সামর্থ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। *কাবার* দু'টো কোণ কায়কানের দিকে মুখ করা।

তিনদিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর *মুশরিকরা* আলীর কাছে এসে বললো তোমার সাথীদেরকে এবার বের হয়ে যেতে বল। তোমাদের সাথে চুক্তি অনুযায়ী সময় শেষ।" রাসূল (সা) এরপর মক্কা ত্যাগ করলেন।[৯] ক্বাযা উমরাহ সম্পর্কে কুরআনের নিম্ন বর্ণিত আয়াত নাজিল হয়।

> নিশ্চয়, আল্লাহ তাঁর রাসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল *হারামে* প্রবেশ করবে নিরাপদে, কেউ কেউ মস্তক মুন্ডিত করবে, কেউ কেউ কেশ কর্তন করবে। তোমাদের কোন ভয় থাকবে

না। আল্লাহ জানেন যা তোমরা জান না। তা ছাড়াও তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন এক সদ্য বিজয়। (৪৮ :২৭)

এ *উমরাহর* সময় সবগুলো বিধির মধ্যে যে বিষয়টি স্পষ্ট হলো তা হলো *উমরাহর* জন্য যে ব্যক্তিটি এ বিধি প্রণয়ন করলেন তিনি *কাবা* যিয়ারত করতে পারলেন না। তাকে তা থেকে বিরত রাখা হলো, বেশীর ভাগ পন্ডিতের মত হলো তাকে কুরবাণী করতেই হতো। তিনিতো উমরাহকে পরিবর্তন করে অন্য কিছু করতে পারবেন না। এর থেকে যে প্রশ্নটি দাঁড়ায় তা হলোঃ ক্বাযা *উমরাহ* কী যা সম্পন্ন করা যায়নি তার পরিবর্তে কৃত সে আল হুদায়বিয়ার *উমরাহ,* না কি এটি কোন নতুন *উমরাহর শুরু?*

এখানে শিশু যত্নের আরেকটি বিধানের প্রশ্ন আসে। রাসূল (সা) ও অন্যান্য মুসলমানগণ যখন মক্কা থেকে মদীনায় চলে যান তখন আমারাহ বিনতে হামযা ইবনে আবদ আল মুত্তালিব ছিলেন ছোট শিশু। আলী তাকে নিয়ে নিলেন। তাকে লালন পালনের জন্য ফাতিমার কাছে দিলেন। ফাতিমা শিশুটির পিতার পক্ষের চাচাতো বোন সম্পর্কীয় ছিলেন। যায়েদ ইবনে হারিসা এ ব্যাপারে আলীর সাথে তর্ক করলেন এ ভেবে যে, আলী ছিলেন হামযার ভাই। (*মুয়াখ্খার* নিয়মে), যাফর আমারাহর জন্য *মাহরাম,* কারণ ইসলামে কোন ব্যক্তি একই সাথে একজন মহিলা ও মহিলার মামীকে বিবাহ করতে পারে না।[১০]

পাদটীকা ঃ

১. ইবনে হাযম, *যাওয়ামী আল সীরাহ,* ২১৯, ইবনে ইসহাক, মূসা ইবনে ইকবাহ, উয়াকুব ইবনে সুফিয়ান কর্তৃক ইবনে উমর হতে হাসান সনদসহ বর্ণির্ত (ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৭/৫০০)।

২. আল বুখারী কর্তৃক বর্ণিত (ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী,* ৭/৪৯৯)।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী,* ৭/৪৯৯, এ বর্ণনা মূসা ইবনে উকবাহ কোন সনদ দেননি।

৫. আল হাকীম বলেন, সনদ ছাড়া, *আল ইলকিলে* (ইবনে হাযার, *ফাতহুর বারী*, ৭.৫০২)

৬. আল তিরমিজী। তিনি বলেন "এটি একটি *হাসান গারিব হাদীস।*" (*ফাতহুর বারী,* ৭/৫০২)।

৭. আল বুখারী কর্তৃক বর্ণিত। ইবনে হাজার (*ফাতহুর বারী*, ৭/৫০৮৯); আরও দেখুন, আহমদ, *আল মুসনাদ*, নং ৩৫৩৬। (আহমদ শাকীর সংস্করণ হতে), *সহীহ সনদসহ।*

৮. প্রাগুক্ত।

৯. আল বুখারী কর্তৃক বর্ণিত। ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৭/৪৯৯।

১০. ইবনে হাজার *ফাতহুর বারী, ৫/৫০৫।*

অধ্যায় ১২

মু'তা অভিযান

আলওয়াকিদিই একমাত্র পন্ডিত যিনি এ অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ উল্লেখ করেছেন। এ অভিযানে শারাহবিল ইবনে আমর আল গাসসানি রাসূল (সা) কর্তৃক বসরার সম্রাটের কাছে পত্রসহ প্রেরিত আল হারিস ইবনে উমায়ের আল আজদিকে হত্যা করেছিল। দূতদেরকে হত্যা করতে নেই। রাসূল (সা) এ ঘটনায় ক্ষুদ্ধ হন এবং মু'তায় সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন।[১] আল ওয়াকিদিকে *যঈফ* হিসাবে ধরা হয়, তার উপর নির্ভর করা যায় না। তাঁছাড়া একমাত্র বর্ণনাকারী হিসাবে তাকে বিবেচনায় নেয়া হয় না।

সিরিয়ার সীমান্তে আরব গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে কোন অভিযান পরিচালনার প্রত্যক্ষ কারণ খুঁজে বের করার প্রয়োজন নেই। কারণ বের করতে গেলে তার কোন অভাব হবে না। জিহাদের বিধি বিধানের মধ্য দিয়ে আরব গোত্রগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনা ও ইসলামী রাষ্ট্রে সীমানা বিস্তারের উদ্দেশ্যটিই ছিল আসল। অন্য কোন প্রত্যক্ষ কারণ ছাড়া এ উদ্দেশ্যেগুলোও মু'তা অভিযানের কারণ। বাইজেন্টিইনীয় শাসকের অধীনস্থ আরব খ্রিস্টান গোত্রগুলোকে জয় করা ছাড়া মুসলমানদের সামনে আর কোন বিকল্প পথ খোলা ছিল না। যার ফলে মুসলমানগণ কর্তৃক এ এলাকায় বাইজেন্টিয়াম প্রভাবের উপর আগামচিন্তার ভিত্তিতেই আক্রমণের চিন্তা করা হয়। বাইজেন্টিয়ামদের ইসলামী শিশু রাষ্ট্রে বিরুদ্ধে আক্রমণের পূর্বেই এ ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল।

কাযা উমরাহ করে ফিরে যাওয়ার সময় রাসূল (সা) যিল হজ্জের বাকী অংশসহ জমাদিউল আউয়াল পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করেন। এ সময় তিনি ৩,০০০ যোদ্ধার এক বাহিনী[২] সিরিয়ায়[৩] প্রেরণ করেছিলেন। জায়েদ ইবনে হারিসাকে এ বাহিনীর *আমীর* নিযুক্ত করা হলো। যায়েদ শহীদ হয়ে গেলে যাফর ইবনে আবু তালিব, এর পর আবদুল্লাহ ইবনে আবু রাওয়াহা পর্যায়ক্রমে বাহিনীর দায়িত্ব নেবেন এটি স্থির হলো।[৪] বিকল্প পদ্ধতিতে নিযুক্ত করণের ফলে এটি প্রতিষ্ঠিত হলো যে, *আমীর* নিযুক্তির ব্যাপারে শর্ত রয়েছে। একজনের[৫] অবর্তমানে আরেকজন দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এই প্রথমবার কোন অভিযানের পূর্বে সতর্কতামূলক অবস্থা গ্রহণ করা হলো। রাসূল (সা) মনে করেছিলেন দূরত্বের কারণে এ অভিযান বিপজ্জনক হবে। এর পূর্বে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের মত শক্তিশালী রাষ্ট্রের ভিতরে, যেখানে সিরিয়ার বিভিন্ন ক্ষেত্র ও এর সীমান্ত অঞ্চল রাজনৈতিক ভাবে মিত্র সেখানে মুসলিমরা কোন আক্রমণ পরিচালনা করেনি।

মুসলমান বাহিনী যখন মা'নে পৌছলো তখন খবর পৌছলো যে, ১,০০,০০০ বাইজেন্টিয়াম সৈন্য, লুকহাম, যুধাম ও কাদাহা (বাহরা, বালী ও বালাকীন) হতে ১,০০,০০০ আরব খ্রিস্টান সৈন্যের বাহিনী নিয়ে হেরাক্লিয়াস মা'নে (আল বিলকা) পৌছেছে। মুসলমানগণ দু'রাত মা'নে অবস্থান করে যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-

আলোচনা করছিল। কেউ কেউ রাসূল (সা) এর কাছে শত্রু বাহিনীর শক্তির কথা উল্লেখ করে পত্র লিখতে বললেন, আবার কেউ আরও সৈন্য পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে খবর পাঠাতে বা অন্য কোন নির্দেশনা কামনা করে পত্র লিখতে বলেন। আবু রাওয়াহা সৈন্যদেরকে এ বলে উৎসাহিত করেন, "হে জনগণ, তোমরা যে উদ্দেশে বের হয়ে আসছ তাকে কি তোমরা অপছন্দ করছ? তোমরা কি শহীদ হওয়াকে অপছন্দ করছ? সংখ্যার, শক্তির বা সাজসরঞ্জামের বিবেচনায় আমরা শত্রুর মোকাবেলা করতে আসিনি, আমরা এসেছি সে দীন নিয়ে যা দিয়ে আল্লাহ আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন। কাজেই আস, উভয়টাই উত্তমঃ জয় বা শহীদী মর্যাদা।"[৬]

এ আহবানে মুসলমান বাহিনী উৎসাহিত হলো। যারা দ্বিধা সংকোচ করলো তারা হতোদ্যম হয়ে পড়লো। যায়িদ ইবনে হারিসা তার বাহিনীকে আল কারকের একটু দক্ষিণে মুতা প্রান্তরে নিয়ে হাযীর হলেন। এখানে তিনি বায়জেন্টাইন বাহিনীর মোকাবেলা করেন। এখানে ঘোরতর যুদ্ধ সংগঠিত হলো। অসীম সাহসিকতার সাথে মুসলমান বাহিনী লড়াই করলো। অবশেষে তিনজন নেতা এখানে শহীদ হলেন। শত্রুবাহিনীর বর্শার আঘাতে রক্ত ঝরতে ঝরতে যায়িদ ইবনে হারিসা শহীদ হলেন। এর পর যাফর ইবনে আবু তালিব মুসলমান বাহিনীর পতাকা হাতে নিলেন। তাঁর হাল্কা রঙ্গীন অশ্বের পায়ের পেছনের শিরা কেটে দেয়া হলো। এর পর পতাকা হাতে নিয়ে লড়াই করলেন। যখন লড়াইয়ে ডানহাত কাটা গেল, বাম হাতে পতাকা ধরলেন। যখন তাঁর বাম হাত কাটা গেল তখন দু'বাহু দিয়ে পতাকা জড়ায়ে ধরে শহীদ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। এর পর আবদ আল্লাহ ইবনে রাওয়াহা পতাকা ধরলেন। তিনি কিছুক্ষণ ইতঃস্তত করছিলেন। এরপর তিনি সামনে এগিয়ে যান আর শহীদ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। এবং সাবিত ইবনে ইকরাম পতাকা হাতে নিয়ে মুসলমানদেরকে নেতা নির্বাচনের আহবান জানালেন। খালিদ ইবনে আল ওয়ালিদকে নেতা নির্বাচন করা হলো। খালিদ পরিস্থিতি বুঝতে পারলেন। তিনি তাঁর বাহিনী পুন:সংগঠিত করলেন। তিনি ডান ও বামের বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি পেছন থেকে একটি সেকশনকে সামনে নিয়ে আসেন এমন ভাবে তারা যেন নতুন বাহিনী। বায়জেন্টাইন বাহিনীকে বিভ্রান্ত করার জন্যই তিনি এ কৌশল অবলম্বন করেন। এ পদ্ধতিতে তিনি তাঁর বাহিনীকে পরিকল্পিতভাবে প্রত্যাহার করে নিতে সক্ষম হন, যার ফলে তাঁর বাহিনীর সামান্য সংখ্যক সৈন্যই ক্ষয় হয়। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় এখানে মাত্র ১৩ জন সৈন্য শহীদ হন।[৭]

পরিকল্পিত এ প্রত্যাহারের কারণে সামান্য ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়। তাঁর এ প্রত্যাহারকে মুসলমানদের বিজয় হিসাবে ধরা হয়। অপর দিকে বায়জেন্টাইন বাহিনীর বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়। তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে অনেক মৃত ও আহত সৈন্যের লাশ ফেলে যায়। মুসলমানদের দুর্দান্ত লড়াই, প্রশংসনীয় সাহস এবং শহীদ হওয়ার প্রেরণা, খালিদের সামরিক প্রতিভা তাদেরকে এরূপ সংকটাপন্ন অবস্থা থেকে উদ্ধার করে।

যাফর ইবনে আবু তালিবের শরীরে বর্শা ও তীরের[৮] ৯০ টিরও বেশী যখম পাওয়া যায়। এত কিছু তাকে বিরত রাখতে পারেনি। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ নয়টি তলোয়োর ব্যবহার করেন ও ভাংগেন।[৯]

এ সময় রাসূল (সা)-এর একটি অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশিত হয়। তিনি যুদ্ধে না গিয়েও যুদ্ধের অবস্থা সাহাবীদেরকে জানালেন। তিনজন নেতার শহীদ হওয়ার বিষয় জানতে পেরে তাঁর অশ্রু ঝরছিল। কোন বার্তাবাহকের মারফৎ এ খবর পাওয়ার পূর্বেই যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা তিনি অবগত হতে পেরেছিলেন। রাসূল (সা) এরপর সাহাবীদেরকে খালিদের পতাকা উত্তোলনের কথা জানালেন। খালিদের নেতৃত্বে মুসলমানদের বিজয়ের কথা জানালেন।[১০] এখানে বিজয়ের ব্যাপারে সহীহ্ হাদীস হলো সফলভাবে পরিকল্পিত সৈন্য প্রত্যাহার বা সংখ্যায় বেশী হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান কর্তৃক বায়জেন্টাইন বাহিনীর ঘোরতর ক্ষতি সাধন।

মুসলিম বাহিনীর সফল প্রত্যাহারের পরিবর্তে লোকেরা সেনাবাহিনীর প্রতি চিৎকার করছিল, তাদের প্রতি ধুলো নিক্ষেপ করেছিল ঃ "তোমরা পলাতক, তোমরা আল্লাহর পথে পালিয়ে এসেছ।" রাসূল (সা) বললেন, "তারা পলাতক নয় তবে আল্লাহর ইচ্ছায় আরেক দিন যুদ্ধের জন্য বেঁচে থাকবে।"[১১] ঐ সময়ে মানুষের মতামত ইসলামী জনসচেতনতাকে প্রকাশ করছিল।

রাসূল (সা) আল্লাহর দৃষ্টিতে মু'তায় শহীদদের পদমর্যাদা সম্পর্কে বলেছেন। "তারা এখন আমার কাছে থাকুক তা আমি পছন্দ করবোনা (বা তারা এখন আমাদের সাথে থাকুক তা তারা পছন্দ করবে না) শহীদ হওয়ার পর তারা যে মর্যাদা পেয়েছে সেজন্য। যাফর ইবনে আবু তালিবের সন্তানদেরকে রাসূল (সা) এর কাছে আনা হলো। তিনি তাদের সাথে খেললেন, তাদের মাথা মুন্ডন করে দিতে বললেন এবং তাদের জন্য দোয়া করলেন। তিনি তাদের মায়ের সাথে কথা বললেন, কারণ তারা য়াতীম হয়ে গিয়েছিল। "তুমি কি মনে করছ আমি দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের অভিভাবক হওয়া সত্ত্বেও তারা গরীব হয়ে যাবে।"[১২]

মুসলমানগণ নিঃসন্দেহে বায়জেন্টাইন বাহিনীর সাথে প্রথম এ লড়াই থেকে অনেক শিখেছে, অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। তাদের এ জ্ঞান ভবিষ্যতে জিহাদী আন্দোলনে অনেক উপকার দেবে। তারা শত্রুদের শক্তি, সংখ্যা, রণকৌশল, রণপরিকল্পনা এবং যুদ্ধক্ষেত্রের প্রস্তুতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

পাদটিকা ঃ

১. ইবনে সা'দ *আল তাবাকাত*, ১/২/১৭; ইবনে হাজার, *আল ইসাবাহ* ১/৫৮৯; ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৭/৫১১।

২. ইবনে ইসহাক, সনদসহ (সীরাহ ইবনে হিশাম, ৩/৪২৭) মুহাম্মদ মুহী আল দীন আবদ আল হামিদ সংস্করণ।

৩. উরওয়া ইবনে আল জুবাইর এর *মুরসাল* ২/৩ (*সীরাহ ইবনে হিশাম*, ৩/৪২৭)। উরওয়ার সমর্থনে ইবনে ইসহাকের সনদ হাসান।

৪. সহীহ আল বুখারী, (ইবনে হাযার, *ফাতহুর বারী*, ৭/৫১০); ইবনে ইসহাক, উরওয়ার *মুরসাল* হতে (*সীরাহ ইবনে হিশাম*, ৩/৪২৭)।

৫. ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৭/৫১৩।

৬. ইবনে ইসহাক, সনদ ছাড়া (সীরাহ ইবনে হিশাম, ৩/৪৩০)।

৭. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ৩/৪৩০-৪৪৭; ইবনে হাজার *যওয়ামী* আল *সীরাহ*, পৃঃ ২০/২২২, ইবনে ইসহাক এ ঘটনায় একটি সনদ দেননি। যাফর ইবনে আবু তালিবের অশ্বের পায়ের শিরা ছিঁড়ে যাওয়া ছাড়া কোন সনদ প্রদত্ত হয়নি। একই ঘটনা ইবনে রাওয়াহার সামনে অগ্রসর হওয়া সম্পর্কেও ঘটেছিল। ইবনে ইসহাক এ দু'টি ঘটনা হাসান সনদসহকারে বর্ণনা করেন। এটির মধ্যে সাহাবীর নাম জানা যায়নি, তবে এর কোন সমস্যা হয়নি।

৮. *সহীহ আল বুখারী* (ইবনে হাযার, *ফাতহুর বারী*, ৭/৫১০)।

৯. প্রাগুক্ত, ৭/৫১৫।

১০. প্রাগুক্ত, ৭/৫১২।

১১. ইবনে ইসহাক, উরওয়ার সাথে হাসান সনদযুক্ত, তবে এটি মুরসাল ও যয়িফ। সীরাহ ইবনে হিশাম, ৩/৪৩৮।

১২. আহসান, *আলমুসনাদ*, হাদীস নং ১৭৫০ (শাকির সংস্করণ) সহীহ সনদ সহকারে।

অধ্যায় ১৩

যাত আল সালাসিল অভিযান

মুতা থেকে মদীনায় মুসলিম বাহিনী ফিরে আসার কিছু দিনের মধ্যেই রাসূল (সা) *যাত আলাসিলের* অভিযানের জন্য আমর ইবনে আস-এর নেতৃত্বে এক বাহিনী গড়ে তোলেন। এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল কাদা গোত্রকে শিক্ষা দেয়া। কাদারা মুতা অভিযানের ঘটনাগুলোকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে। মুতা অভিযানে তারা বায়জেন্টাইন বাহিনীর পক্ষে যোগ দিয়েছিল। তারা এখন মদীনা অভিযানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আমর ইবন আল আস মুহাজির ও আনসারদের ৩০০ জনের এক বাহিনী নিয়ে কাদা'র এলাকায় ঢুকে পড়েন। রাসূল (সা) আমর ইবন আল আসকে নির্দেশ দেন আমর যাতে বালী, উদারাহ ও বালকিনের ন্যায় কাদা'র গোত্রের লোকদেরকে কাদা'র বিরুদ্ধে সাহায্যে এগিয়ে আসার অনুরোধে জানায়। আমর যখন কাদা'র বাহিনীর শক্তির কথা জানতে পারেন তখন তিনি রাসূল (সা) কে মুসলমান বাহিনীর শক্তি বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করেন। রাসূল (সা) আবু ওবায়দা আমর ইবনে আল যারা'র নেতৃত্বে আবুবকর ও উমর সহ ২০০ জনের এক বাহিনী তার সাহায্যে প্রেরণ করেন।

আমর ইবনে আল শাবি (মৃ. ১০৩ হি.) বলেন, রাসূল (সা) মুহাজিরদের নেতৃত্বে আবু ওবায়দাকে এবং বেদুঈনদের নেতৃত্বে আমর ইবনে আল আ'মকে নিযুক্ত করেন আর একে অপরকে সাহায্য করার কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, বানুবকরের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী পাঠানো হচ্ছে। এদিকে কাদা'দের বিরুদ্ধে আমর ইবনে আল আস আক্রমণ পরিচালনা করেন।[১]

মুসলমান বাহিনী কাদা'র বাহিনীর ভেতরে অভিযান পরিচালনা করেন। কাদা'র বাহিনী ছত্রভংগ হয়ে পালিয়ে যায়। অভিযানের ফলে এ অঞ্চলে মুসলমানদের অবস্থান সু-রক্ষিত হয়। মুতা'র অভিযানের পর *মুশরিকদের* বিরুদ্ধে এটাই ছিল আলোড়ন সৃষ্টিকারী অভিযান।[২]

এ অভিযানের পর আমর ইবন আল আস *তায়াম্মুম* করে সালাতে ইমামতি করেন। তিনি অপবিত্র অবস্থায় ছিলেন (*জানাবাহ*)। কিন্তু ঠান্ডা অবস্থায় গোসল করলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন এ ভয়ে গোসল করেন নি। রাসূল (সা) তার ইজতিহাদের এ বিধিগত ধারণাকে অনুমোদন করেন।[৩]

আমর ইবনে আল আসকে আবুবকর ও উমরের ন্যায় মহান ব্যক্তিদের উপর *আমীর* নিযুক্ত করা থেকে এটিই প্রমাণিত হয় যে, মহানদের উপরও কাউকে নেতা নিযুক্ত করা যায় নিযুক্তির শর্তানুযায়ী যদি তার সেসব বৈশিষ্ট্য থেকে থাকে।

হুদায়বিয়া সন্ধির পর মুসলমানগণ উত্তরের দিকে তাদের সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। এর মাধ্যমে দক্ষিণ বা দক্ষিণ পশ্চিমের দিকে আর কোন অভিযান

পরিচালিত হয়নি। সন্ধি চুক্তির আওতায় মক্কা নিরাপদেই থাকে। যদিও এ সম্পর্ক বেশী দিন টিকেনি। কুরাইশরা শান্তি আর নিরাপত্তার আশীর্বাদকে ভালভাবে গ্রহণ করেনি। *মুশরিকরা* সন্ধিচুক্তি ভংগ করতে লেগে যায়। ফলে মুসলমানদেরকে মক্কা ও তার আশপাশের দিকে তাদের সামরিক তৎপরতা আবার শুরু করতে হয়।

পাদটীকা ঃ

১. সহীহ্ সনদসহ ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণনাটি বর্ণিত হয়। আমীর আল শুবীরও তাতে সম্মতি আছে। তিনি আবার *মাগাযির* ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ কারীদের মধ্যে একজন , আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর এটি স্বীকার করেন। *তাহজীব আল তাহজীব*, ৫/৬৭)।

২. ইবনে আল কাইয়্যেম, *জা'দ আল মা'দ* সনদ ছাড়া ইবনে সা'দ হতে বর্ণিত; ইবনে হাযার, *ফাতহুর বারী*, ৮/৭৪-৫।

৩. আবু দাউদ আল দারকুতনী, আল হাদীস ও আল বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত *সহীহ্ হাদীস*, (আল আলবাণী ঃ *সহীহ্ সুনান আবু দাউদ*, নং ৩৬০-৩৬১)। ইমাম আহমাদও এর বর্ণনা করেনঃ আল মুসনাদ, ৪/২০৩, ইবনে লাহিয়ার সনদসহ।

অধ্যায় ১৪

মক্কা বিজয়

কুরাইশরা তাদের মিত্র বানু বকরকে মুসলমানদের মিত্র খুজার বিরুদ্ধে অশ্ব, জনবল ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে মারাত্মক ভুল করে। আল ওয়াতিরের জলাধারের পার্শ্বে সংগঠিত এ যোদ্ধ খুজা বাহিনীর বিরাট ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে। জলাধারটি ছিল খুজা'র ভূ-সীমার মধ্যে। খুজারা মুসলমানদের কাছ থেকে সাহায্য নেয়। এ উদ্দেশে আমর ইবনে সালিম আল খুজাই মদীনায় গিয়ে রাসূল (সা) এর সামনে কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে তার কাছ থেকে সাহায্য কামনা করে। রাসূল (সা) তার আবেদনের জবাবে বলেন। "হে আমর ইবনে সালিম, তোমাকে সাহায্য করা হবে।"[১]

ইবনে হিশামের মতে বানু বকর খুজার উপর জোর প্রয়োগ করে এবং তাকে *হারামে* প্রবেশ করে সেখানে লড়াই করতে বাধ্য করে।[২] আল ওয়াকিদির মতে খুজা পক্ষের ২০ জন এ লড়াইয়ে নিহত হয়।[৩] মূসা ইবনে উকবার মতে খুজার বিরুদ্ধে বানু বকরকে যারা সাহায্য করেছিল তারা ছিল কুরাইশ নেতা সাফওয়া ইবনে উমাইয়্যা। বানু বকরকে অস্ত্রশস্ত্র ও দাসদের দিয়ে সাহায্য করা হয়েছিল।[৪]

কুরাইশরা যে আচরণ করেছিল তা ছিল হুদায়বিয়া সন্ধির লংঘন এবং মুসলমান মিত্রদের বিরুদ্ধে স্পষ্টতই শত্রুতা। কুরাইশরা পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে বুঝতে পারে। কোন কোন রিপোর্টে জানা যায় কুরাইশদের কাছে রাসূল (সা) বার্তা পাঠিয়েছিলেন, তারা খুজার লোকদেরকে হত্যা করার জন্য রক্তমূল্য পরিশোধ করবে, নাকি বানু বকরের সাথে তাদের কৃতচুক্তি ভংগ করবে, নাকি যুদ্ধ করবে। কুরাইশরা যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল। এরপর তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনা করে এবং মদীনায় আবু সুফিয়ানকে চুক্তি নবায়নের জন্য প্রেরণ করে । কিন্তু নবায়নের প্রতিশ্রুতি পেতে সে ব্যর্থ হয়।[৫]

রাসূল (সা) তাঁর সাথীদেরকে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন, তবে তিনি কোন দিকে তাঁর অভিযান পরিচালনা করবেন তা বলেন নি। কুরাইশরা যাতে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে না পারে সে জন্য তিনি গোপনীয়তা অবলম্বন করেন।[৬]

রাসূল (সা) মদীনার আশপাশের গোত্রকে যুদ্ধের আহবান জানান। আসলাম, গিফার, মাজিনা, যুহাইনা, আশযা ও সালিম তাদের মধ্যে অন্যতম। তাদের কেউ কেউ মদীনায় তাঁর সাথে যোগ দেয় আবার কেউ কেউ পথে যোগ দেয়। মুসলমান বাহিনীর সদস্যা সংখ্যা ছিল ১০,০০০।[৭] সকল *মুহাজির* ও *আনসার* রাসূল (সা) এর সাথে ছিলেন; কেউ তাঁর পেছনে ছিলেন না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলিমরা ঐ অবস্থাতে তাদের বাহিনী সংগঠিত করতে সর্বোচ্চ সামর্থ অর্জন করে।[৮] মুসলমান বাহিনীতে মাজিনা গোত্রের ১০০জন, এবং ১১০০ (বা ৭০০) জন সালিম গোত্রের লোক

ছিল।[৯] মুসলমান বাহিনীর এরূপ বিরাট সংখ্যা থেকে বুঝা যায় হুদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের মধ্যেকার সময়ে তারা কত বিরাট আকার ধারণ করেছিল।

বদরযুদ্ধে যোগ দেয়া হাতিব ইবনে আবু বালতাআ কুরাইশ বাহিনীর কাছে মুসলমান বাহিনীর আক্রমণ সংক্রান্ত এক পত্র লিখে। পত্রটি এক মহিলার মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। রাসূল (সা) আলী, আল যুবায়ের ও আল মিকদাদকে তাকে ধরার জন্য পাঠান। তারা মহিলাকে রাওযা থেকে ধরে ফেলেন। রাওযা খাক মদীনা থেকে বার মাইল দূরে। তারা মহিলাকে পত্রটি দিয়ে দেয়ার জন্য ধমকাতে থাকেন। তাকে তল্লাশী করার হুমকি দেয়া হয়। মহিলাটি তাদেরকে পত্রটি দিয়ে দেয়। রাসূল (সা) এ সময়ে বলেন, "হে হাতিব, এটি কি?" হাতিব বলে, "আমাকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করবেন না। আল্লাহর রাসূল (সা) আমি কুরাইশদের লোক নই। তাদের সাথে আমার যোগাযোগ আছে মাত্র। আপনার সাথে যেসব অভিবাসিরা রয়েছে তাদের আত্মীয় স্বজনরা তাদেরকে ও তাদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য মক্কায় রয়েছে। যাদের সাথে আমার রক্ত সম্পর্ক নেই তার ক্ষতি পূরণ করার জন্য তাদের সাথে আমি সুসম্পর্ক বজায় রেখেছি যাতে (মক্কায়) তারা আমার আত্মীয় স্বজনকে রক্ষা করে। আমি অবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে বা আমার ধর্ম ত্যাগ করে এরূপ সম্পর্ক করিনি। রাসূল (সা) তার এ কথা শুনে সাথীদেরকে বললেন, "সে (হাতিব) তোমাদেরকে সত্য কথাটিই বলেছে।" উমর বললেন, "হে রাসূল, আমাকে অনুমতি দিন। আমি মুনাফিকের মাথাটি বিচ্ছিন্ন করে দেই।" রাসূল (সা) বললেন, "বদরযুদ্ধ যারা দেখেছে সে তাদের মধ্যে একজন, তোমরাও সেটা জান। আল্লাহ বদরের যোদ্ধাদেরকে দেখেছেন। এরপর রাসূল (সা) বললেন, আমি তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছি। তোমরা এখন যা ইচ্ছা করতে পার।" এ প্রসঙ্গে কুরআনের নিম্নবর্ণিত আয়াত নাল হয়।

> হে মু'মিনগণ, আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা, তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিস্কৃত করেছে, এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশে বহির্গত হয়ে থাক, তবে কেন তোমরা তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের মধ্যে যে কেউ ইহা করে সে তো বিচ্যুত হয় সরল পথ হতে। (৬০:১)[১০]

আল্লাহ এরূপ ঘোষণার মাধ্যমে বিধান করে দিলেন যে, মুসলিমরা *কাফিরদের* সাথে স্পষ্টভাবে শত্রুতা বজায় রাখবে, কাফিরদেরকে বন্ধু হিসেবে ও রক্ষাকারী হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এ ঘটনা দ্বারা রাসূল (সা) এর ঘোষণা প্রমাণিত হলো। তিনি মহিলাটি সম্পর্কে জানতেন এবং হাতিব যে পত্র দিয়ে মহিলাটিকে পাঠিয়েছেন তাও রাসূল (সা)

জানতেন। এ প্রসঙ্গে কিছুকিছু বিধান প্রকাশিত হয়েছে ঃ গুপ্তচরদের সাথে ব্যবহার এবং গুপ্তচরের গোপনীয়তা জানার অধিকার, হাতিব যে মারাত্মক ভুল করেছিল এর পরও তাকে *কাফির* হিসাবে মনে না করা।

রাসূল (সা) আট হিজরী রমাযানে মদীনা থেকে বের হন। মুসলমানগণ কুরাইশদের ঝরণা পৌঁছা পর্যন্ত রোযা রাখেন। কুবাইদ ছিল মক্কা থেকে ৮৬ কি মি দূরে এবং মদীনা হতে ৩০১ কি মি দূরে। এখানে এসেই মুসলমানগণ রোযা ভাংগেন।[১১]

রাসূল (সা) আবরাহুম কুলসুম ইবনে হুসাইন আল গিফারীকে মদীনার শাসক নিযুক্ত করেন।[১২]

মুসলমান বাহিনী কুরাইশদেরকে তাদের গতিবিধি না জানিয়ে মার আল জাহরানে পৌঁছান। মুসলমান বাহিনী দশই রমাযানে মদীনা থেকে রওয়ানা দিয়ে উনিশে রমযানে মক্কায় পৌঁছেন। *মাগাযির* গ্রন্থে[১৩] এটি সবচেয়ে বিখ্যাত ঘটনা। তবে কোন তারিখে মক্কা বিজয় হয়েছিল সে ব্যাপারে মতভেদ আছে। এ বিজয় তের, ষোল, সতের বা আঠার রমাযানে হতে পারে। তবে এব্যাপারে সবাই একমত যে, হিজরীর অষ্টম বৎসরে মক্কা বিজয় হয়।[১৪]

মক্কার পথে কিছু কিছু *মুশরিক* পথিমধ্যে ইসলাম কবুল করে। আবওয়াতে রাসূল (সা) এর পালিত ভাই আবু সুফিয়ান ইবনে আল হারিস এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়্যা ইবনে আল মূসায়রা ইসলাম গ্রহণ করে। তারা ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিলেন। আবু সুফিয়ান ইবনে আল হারিস মুসলমানদের প্রতি উপহাস করেছিলেন এবং কুড়িবছরধরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। আল্লাহ তার অন্তর সুদৃঢ় করা পর্যন্ত আবু সুফিয়ান মুসলমানদের বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি হুনাইনের যুদ্ধে অন্যান্যের ন্যায় রাসূলের সাথে আঁকড়িয়ে থেকে ছিলেন যখন অন্যরা পালিয়ে গিয়েছিল।[১৫] আবু আবদ আল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়্যাও ছিলেন ইসলামের ঘোর বিরোধী। তিনি ছিলেন রাসূল (সা) এর স্ত্রী উম্মে সালামা'র ভাই। তিনি আল সাকিয়া এবং আল আরয-এর মধ্যবর্তী স্থানে এসে হাযির হন। এ স্থানগুলো হলো মদীনা থেকে মক্কার পথে। তিনি আন্তরিকভাবে ইসলাম কবুল করেন; তিনি মক্কা বিজয় দেখেছিলেন এবং তায়েফ অবরোধের সময় শহীদ হন।[১৬]

বর্তমান সময়ের রাবিগের নিকটে আল যাহফার আল আব্বাস ইবনে আবদ আল মুত্তালিব রাসূল (সা) এর কাছে *মুহাজির* হিসেবে উপস্থিত হলেন।[১৭] খায়বার বিজয়ের পূর্বেই আল আব্বাস ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৮] কোন কোন রিপোর্টে জানা যায় আল আব্বাস বদর যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম কবুল করেছিলেন বা[১৯] মদীনায় *হিজরতের পূর্বে* ইসলাম কবুল করেছিলেন।[২০] এসব দুর্বল বর্ণনাগুলো খণ্ডন করা হয় । রাসূল (সা) এর মতে আব্বাস বদর যুদ্ধের বন্দী হিসাবে নিজেই নিজের মুক্তি পণ পরিশোধ করেছিলেন, এসব সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণের পূর্ব থেকেই ইসলামে বিরাট সেবা দিয়ে আসছিলেন। আল আব্বাস রাসূল (সা) কে কুরাইশদের খবরাখবর দিতেন এবং মক্কার মুসলমানদের রক্ষা করেছিলেন।

মুসলমানগণ মার আল জাহরানে তাঁবু খাটান। কুরাইশরা তাদের গতিবিধি সম্পর্কে অনবহিত ছিল। আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, হাকিম ইবনে হাযাম এবং বুদাইল ইবনে ওয়ারকা আল খুজাই মুসলমানদের খবরাখবর সংগ্রহে বের হয়ে পড়ে। তারা পথিমধ্যে আল আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের দেখা পায়। তিনি তাদের কাছে এক জন বার্তাবাহক প্রেরণ করতে চেয়েছিলেন তারা যেন রাসূল (সা) এর কাছে এসে রাসূল (সা) এর মক্কায় প্রবেশের পূর্বেই তাঁর সাথে শান্তি চুক্তি করে। কোন লড়াই শুরুর পূর্বেই এরূপ চুক্তি সম্পাদনের আহবান জানানো হয়। শত্রুদের মার আল জাহরানে উপস্থিতি সম্পর্কে, তাদের তাবু খাটানো সম্পর্কে তারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে বাকবিতন্ডা করতে থাকে। তাদের একজন বলতে থাকেন যে, শত্রুরা খুজা হতে আসছে; এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, মক্কায় পৌছার ব্যাপারে তাদের খবরাখবর তারা গোপনে রাখতে সমর্থ হয়েছিল, মুসলমানদের এটি সফলতা।

আল আব্বাস তাদেরকে বললেন যে, মুসলমান বাহিনীই মার আল জাহরানে অবস্থান নিয়েছেন। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করলো ঐ মুহূর্তে তারা কি করতে পারে। তিনি আবু সুফিয়ানকে তার সাথে ও তার পাহারায় মুসলমানদের তাবুতে আনতে বলেন। আবু সুফিয়ান রাযী হলো, তারা রাসূল (সা) এর কাছে এলেন। আবু সুফিয়ান তাঁর সাথে বিনয়ী সাথে আচরণ করে। তবে ইসলামে দাখিল হতে চায়নি, রাসূল (সা) আল আব্বাসকে আবু সুফিয়ানকে তাঁর তাবুতে আনতে বলেন। এবং পরের দিন সকালেও তাকে এখানে আনতে বলেন। আল আব্বাস তাই করলেন। পরের দিনই আবু সুফিয়ান ইসলাম কবুল করেন। মুসলিম বাহিনী যখন তার সামনে দিয়ে প্যারেড করে যাচ্ছিল তখন আল আব্বাস আবু সুফিয়ানকে তাদের শক্তি সম্পর্কে ধারণা দেন। আবু সুফিয়ান এবার দেখলেন মুসলমান বাহিনীর শক্তি সামর্থ। কুরাইশদের তাদের মত শক্তি নেই। যখন *মুহাজির* ও *আনসার* বাহিনীর একটি স্কোয়াড্রন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যাদের মধ্যে রাসূল (সা)ও ছিলেন তখন আবু সুফিয়ান বললেন, "আল্লাহর শপথ, তোমার ভাইয়ের পুত্রের রাজত্ব আজ বিশাল আকার ধারণ করেছে।" আল আব্বাস বললেন, "দুঃখ তোমার জন্য, হে আবু সুফিয়ান। এটা তাঁর পয়গাম্বরীর জন্য।" আবু সুফিয়ান বললেন, "তাঁর জন্য এটা সম্ভব। আবু সুফিয়ান মক্কায় গেলেন, কুরাইশদেরকে মুসলমানদের শক্তি সামর্থের কথা বললেন আর তাদেরকে প্রতিরোধ সৃষ্টির জন্য নিষেধ করলেন।[২১]

সা'দ ইবনে উবাদা *আনসার*দের পতাকা বহন করছিলেন যখন তাদের বাহিনী প্যারেড করে যাচ্ছিল। যখন তিনি আবু সুফিয়ানকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন তখন সা'দ ইবনে উবাদা বললেন, "আজকে যুদ্ধের দিন, তুমি আজ কাবায় আশ্রয় চাইতে পার না।" আবু সুফিয়ান রাসূল (সা) এর কাছে সা'দ এর বিরুদ্ধে তার এরূপ বলার জন্য অভিযোগ করলো। রাসূল (সা) তাঁর কথা শুনে বললেন, "সা'দ ভুল করেছে, তবে আজকে কাবাকে একটি গিলাফ দিয়ে আবৃত করা হবে।"[২২] রাসূল (সা) তখন সা'দ ইবনে উবাদার কাছ থেকে পতাকাটি নিয়ে তার পুত্র কায়েস'র কাছে দিয়ে দিলেন। সা'দ

রাসূল (সা) কে তার পুত্রের কাছ থেকে নিয়ে নেয়ার জন্য বললেন। কারণ সেও ভুল করে ফেলতে পারে। রাসূল (সা) তার কাছ থেকে পতাকাটি নিয়ে নিলেন।[২৩]

মার আল জাহরানে রাসূল (সা) মক্কার দিকে অভিযান শুরু করলেন। তিনি নেতা নিযুক্ত করলেন। তিনি তাঁর বাহিনীকে ডান আর বাম এভাবে ভাগ করলেন এবং কেন্দ্রেও একটি বাহিনী রাখলেন। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ছিলেন দক্ষিণ অংশের দায়িত্বে, আল যুবায়ের ইবন আল আওয়াম ছিলেন বাম অংশের দায়িত্বে, আবু ওবায়দা ছিলেন পদাতিক বাহিনীর দায়িত্বে। রাসূল (সা)এর পতাকা ছিল কালো আর তাঁর দণ্ডস্থিত পতাকা ছিল সাদা।[২৪]

আল ওয়াকিদি পতাকা বিতরণ ও পতাকা বহনের ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা দেন। তার মতে সৈন্য সংখ্যা ছিলঃ *মুহাজিরদের* মধ্য থেকে ৭০০, *আনসারদের* মধ্য থেকে ৪,০০০ সালিম গোত্রের ৪০০, যুহাইনা থেকে ৮০০, বানু কা'ব ইবনে আমর থেকে ৫০০ এভাবে সর্বমোট সংখ্যা ছিল ৭,৪০০। এসব যোদ্ধার অশ্বের সংখ্যা ছিল ৯০০।[২৫] আল ওয়াকিদি এবং *সহীহ* রিপোর্টে বর্ণিত সৈন্য সংখ্যার মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। আল ওয়াকিদির বর্ণনাকে *মাতরুক* (বাতিল) করা হয় এবং এর উপর নির্ভর করা যাবে না। বিশেষ করে তার সাথে অন্যদের বর্ণনা মিলে না।

কুরাইশরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উদ্দেশে বিভিন্ন গোত্র ও তাদের অনুসারীদের মধ্য থেকে সৈন্য সমাবেশ করিয়েছিল। তারা সৈন্য সমাবেশ করিয়ে নিজেদেরকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। তারা জিতলে এ গোত্রগুলোকে তারা সাহায্য করত, অন্যথায় তারা মুসলমানদের সাথে শান্তি স্থাপন করতে বাধ্য ছিল। রাসূল (সা) মুসলমানদেরকে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নির্দেশ দিলেন। তাঁর বাহিনী মক্কায় ঢুকে আল সাফা পর্যন্ত পৌছে গেল। যেই তাদের বিরুদ্ধে লড়তে চেয়েছে তাকেই হত্যা করা হয়েছে। রাসূল (সা) নগরীর সম্মুখভাগ দিয়ে কিদার দিক হতে মক্কা প্রবেশ করলেন।[২৬] খালিদ ইবনে আল ওয়ালিদ নগরীর নিম্নাঞ্চল দিয়ে মক্কায় ঢুকলেন।[২৭] কুরাইশ প্রতিবেশী বেশীক্ষণ টিকলো না। ইবনে ইসহাকের মতে খালিদ যখন *মুশরিকদের* সাথে লড়াই করেন তখন মাত্র তিনজন মুসলমান *শাহাদাত* বরণ করেন। অপর পক্ষে ১২ জন মুশরিক নিহত হয়।[২৮] মূসা ইবনে উকবার মতে প্রায় ২৪ জন *মুশরিক* নিহত হয়,[২৯] আলওয়াকিদি বলেছেন ২৮ জন।[৩০] তাবারানীর একটি দুর্বল বর্ণনাও এ প্রসঙ্গে আছে। তার মতে সত্তর জন *মুশরিক* নিহত হয়েছিল।[৩১]

ইবনে ইসহাক ও মূসা ইবনে উকবা'র বর্ণনাই সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য। এ অভিযোগ সম্পর্কে তারাই ছিলেন সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য লেখক। এক্ষেত্রে ইবনে উকবার *মাগাযি* ইবনে ইসহাকের সীরা'র চেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য। আবু সুফিয়ান কুরাইশদের বেশী সংখ্যায় নিহত হওয়ার কথা বলেছেন যা মূসা ইবনে উকবার রিপোর্টেও উল্লেখ আছে। আবু সুফিয়ান রাসূল (সা) এর কাছে বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, কুরাইশদের রক্ত খুবই সস্তা হয়ে গিয়েছে। আজ থেকে আর কোন কুরাইশ থাকবে না।" এর থেকে বুঝা যায় অনেক কুরাইশ নিহত হয়েছিল। রাসূল (সা) বলেন,

"আবু সুফিয়ানের গৃহে যেই প্রবেশ করবে সে নিরাপদে থাকবে।" লোকজন আবু সুফিয়ানের বাড়ীতে আসতে থাকলো, অন্যরা তাদের পেছনের দরজা বন্ধ করে দিল।

আনসারদের ভয় হলো যে, রাসূল (সা) কুরাইশদেরকে রক্ষার যে নিশ্চয়তা দিয়েছেন সেটা তাঁর নিজের লোকদের প্রতি ছিল অনুকম্পা আর মক্কায় তার অবস্থানের ইচ্ছা বিশেষ। আনসারদের অন্তরে তিনি শান্তির বার্তা পৌছায়ে দেন এভাবে, "আমি তোমাদের সাথেই থাকবো আর তোমাদের সাথেই মৃত্যুবরণ করবো।"[৩২]

রাসূল (সা) তার বাহিনীকে তাদের সাথেই যুদ্ধ করতে বলেন যারা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। রাসূল (সা) সকল মানুষের প্রতি তাঁর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিলেন। তবে তাদের মধ্যে চারজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা ছাড়া। তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই হত্যা করা হবে। এমনকি যদি তারা কাবার পর্দার নীচেও অবস্থান করে। এলোকগুলো হলোঃ ইকরিমাহ ইবনে আবু জহল, আবদ আল্লাহ ইবনে খাতাল, মিকইয়াস ইবনে মুবাবাহ এবং আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে আবু সারাহ। কাবার পর্দার আড়ালে থাকা অবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে খাতালকে হত্যা করা হয়।[৩৩] মিকইয়াস ইবনে সুবাবাহকে মক্কার বাজারে হত্যা করা হয়। ইকরিমাহ ইবনে আবু জাহল ও আবদ আল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে আবু সারাহ কোন রকমে রাসূল (সা) এর কাছে পৌছেন এবং তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। এভাবে তাদের জীবন বাঁচানো হয়।[৩৪]

আল হাফিয ইবনে হাজার বিভিন্ন বর্ণনা থেকে এমন কতগুলো নাম সংগ্রহ করেন যাদেরকে রাসূল (সা) কোন রকম কারণ না দেখিয়ে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ছিল নয় পুরুষ এবং আট মহিলা।[৩৫] যাদেরকে হত্যার নির্দেশ দেয়া হয় তারা মুসলমানদের অনেককেই হত্যা করেছিল। তাদের হত্যার বিষয়টি ছিল তাদের জন্য একটি শিক্ষা, যারা মনে করতো অত্যাচার আর নির্যাতন চালিয়ে ইসলামের দয়ার কারণে আর তার অনুসারীদের মহানুভবতার কারণে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে ন।

রাসূল (সা) বানু বকরের উপর খুজাকে মক্কা বিজয়ের প্রথম দিনে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত প্রতিশোধ গ্রহণের হুকুম দিলেন। মক্কা বিজয়ের পূর্বে খুজার প্রতি বানু বকর যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তার জন্যই তাকে শাস্তি দেয়ার বিষয়টি অনুমোদিত হয়। হুদায়বিয়ার সন্ধি সত্ত্বেও বানু বকর যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তার জন্য তার এরূপ শাস্তি হয়।

আসরের নামাযের সময় হয়ে এলে রাসূল (সা) মক্কায় সকল ধরনের যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দিলেন এবং বললেন মক্কা হলো পবিত্র স্থান। খুজা যখন জনৈক ব্যক্তিকে প্রতিশোধ হিসাবে হত্যা করলো রাসূল (সা) তার রক্তমূল্য দিয়েছিলেন এবং বললেন কাউকে যদি হত্যা করা হয় তার পরিবারকে প্রতিদান এবং ক্ষতিপূরণ (*দীয়্যাত*) দেয়া হবে।[৩৬]

মক্কার লোকরা বিভিন্নভাবে রাসূল (সা) এর এবং তাঁর মিশনের ক্ষতি করলেও তিনি অনেককেই মাফ করে দিলেন। মুসলমান বাহিনী ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়নি। সব মানুষ যখন কাবার কাছে জামায়েত হয়েছিল এবং সবাই যখন রাসূল

(সা) এর রায়ের জন্য অপেক্ষা করছিল তখনই তাদেরকে মাফ করে দেয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। তিনি ঘোষণা করলেন, "তোমরা ভাবছ আমি তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করি?" তারা উত্তরে বললো," উত্তম, আপনি মহান একজন ভাই, মহান ভাইয়ের সন্তান।" তখন তিনি বললেন, "আজকে তোমাদের উপর কোন প্রতিশোধ নেয়া হবে না। আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করে দেবেন।"[৩৭] (*ইউসুফ* ১২:৯২)। এর পর কুরআনের নিম্নবর্ণিত আয়াত তেলাওয়াত করা হয় ঃ

> যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর তবে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে; তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য তাহাই উত্তম। (১৬:১২৬)

রাসূল (সা) তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, তারা তাঁর প্রতি যাই করুক তাদের প্রতি রাসূল (সা) সহিষ্ণুতা দেখালেন। তাঁর মহানুভবতার কারণে তাদেরকে কোনরূপ শাস্তি দেয়া থেকে বিরত থাকলেন। এ সময় আল্লাহর উদ্দেশে রাসূল বললেন, "আমরা তাদেরকে সহিষ্ণুতা দেখাবো; তাদরকে শাস্তি দেব না।"[৩৮]

রাসূল (সা) এর এরূপ সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার ফলে মানুষ বন্দীত্ব থেকে রক্ষা পেয়েছে। স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি তাদের মালিকদেরই রয়ে গেল। তাদের উপর কোন করের ভার চাপানো হয়নি। মক্কাকে অন্যান্য বিজিত অঞ্চলের চেয়ে অন্যভাবে দেখা হলো -এর পবিত্রতা ও শুদ্ধতার জন্য, মুসলমানদের এখানে হাজ্জ পালন করার জন্য, সব মানুষের ইবাদতের স্থান হওয়ার জন্য। আল্লাহর কাছে পবিত্র হওয়ার জন্য এ স্থানকে অন্যদৃষ্টিতে দেখা হয়। এ কারণে বর্তমান ও পূর্বের *ফিকাহবিদদের* সবার মতে মক্কার ভূমি বিক্রি জায়েয নয় বা এর বাড়ী ঘরও ভাড়া দেয়া জায়েয নয়।[৩৯] এখানে যারা প্রথম এসেছে এটি তাদেরই আবাস ভূমি। তাদের যা প্রয়োজন তাই তারা অধিকার করবে। এরপর যে পরিমাণ জায়গা থাকবে তাতে হাজিদের জন্য ও *ওমরা* পালনকারীদের জন্য সাময়িক বসবাসের ব্যবস্থা করবে। তারা এ স্থানে ইবাদত বন্দেগী করবে। কোন কোন *ফিকহবিদের* মতে মক্কার জায়গা বিক্রি করা যাবে এবং এর উপর নির্মিত বাড়ী ঘরও ভাড়া দেয়া যাবে। এ মতবাদ পোষণকারীদের প্রমাণ জোরালো এবং এর বাইরে যারা বলেন তাদের প্রমাণ *মুরসাল* এবং *মওকুফ*।[৪০]

রাসূল (সা) মক্কায় তাঁর বাড়ীতে থাকেন নি। এর পরিবর্তে আল হুযুন-এ তাঁর জন্য একটি তাঁবু খাটানো হয়। আল হুযুন হলো যেখানে কুরাইশরা বানু হাশিম ও মুসলমানদেরকে বয়কট করতে রাযী হয়েছিল। উসামা ইবনে যাইদ যখন রাসূল (সা) কে জিজ্ঞাসা করলেন, "আকিল কি আমাদের জন্য ভূমি বা বাড়ী রেখে গিয়েছে?" এর দ্বারা তিনি এটাই বুঝায়েছেন যে, কোন মুসলমান মুশরিকের উত্তরাধিকারী হতে পারে না।[৪১] আকিল ছিলেন আবু তালিবের উত্তরাধিকারী। সে এবং তার ভাই তালিব সব বাড়ীঘর বিক্রি করে দেন। আলী ও যাফর তাদের পিতার কাছ থেকে কোন সম্পত্তি পাননি। কারণ তারা মুসলমান ছিলেন। আবু তালিব *কাফির* হিসাবে মৃত্যুবরণ করেন।[৪২]

রাসূল (সা) একজন বিজেতার ন্যায় উদ্ধত মনোভাব নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন নি। আল্লাহর কাছে তিনি ছিলেন বিনীত, তিনি আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। উটে উঠার সময় তিনি মর্ম স্পর্শী ভাষায় সূরা *ফাতিহা পাঠ* করলেন।[৪৩]

রাসূল (সা) যখন কাবার চারদিকে *তাওয়াফ* করছিলেন তিনি তাঁর লাঠি দিয়ে কাবার কোণে (ইয়ামিনি) নির্দেশ করলেন। এর কারণ যারা কাবা *তওয়াফ* করছিল তাদেরকে তিনি ধাক্কা দিতে চান নি। তিনি এর দ্বারা *উম্মাকেও* শিক্ষা দিতে চেয়েছেন।[৪৪]

রাসূল ঘোষণা করলেন যে, মক্কা একটি পবিত্র স্থান। মক্কা বিজয়ের পর কেউ এটিকে আক্রমণ করবে না।[৪৫] তিনি কুরাইশদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন এবং ঘোষণা করেন, মক্কা বিজয়ের দিন থেকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত কেউ কুরাইশদের বন্দী করবে না এবং কেউ তাদেরকে হত্যা করবে না।[৪৬]

রাসূল (সা) নির্দেশ দিলেন যে, সব মূর্তি ধ্বংস করে ফেলতে হবে, কাবাকে পবিত্র করতে হবে। রাসূল (সা) নিজেও একাজে শরীক হন। তিনি তাঁর ধনুকের আঘাতে মূর্তিগুলোকে ফেলে দিলেন আর তেলাওয়াত করলেন :

> এবং বল সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যাতো বিলুপ্ত হবারই। (১৭:৮১)।[৪৭]

কাবাগৃহে ছিল ৩৬০টি মূর্তি।[৪৮] রাসূল (সা) নিজে ইবরাহিম, ইসমাইল ও ইসহাকের ছবি যাফরান দিয়ে ঢেকে দেন। কাবা অভ্যন্তরে এদের ছবি ভাগ্যের দেবতা হিসাবে টানানো ছিল। রাসূল (সা) বলেন, "আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিন। (অর্থ্যাৎ কাফিরদের) ইব্রাহিম কখনে পার্থিব তীর দিয়ে লটারী করতেন না।[৪৯] কাবার ভিতরে মরিয়ামের ছবি ছিল বলেও জানা যায়।[৫০]

এ সব ছবি ধ্বংস না করা পর্যন্ত রাসূল (সা) কাবা গৃহে প্রবেশ করেননি।[৫১] এর পর তিনি কাবা গৃহে প্রবেশ করে দু'রাকাত সালাত আদায় করেন। সালাতে সময় তার সামনে ছিল খিলার। ছয় খিলানের উপর কাবা নির্মিত। তিনি কাবার দরজাকে পেছনে রেখে এমনভাবে দাঁড়ান যে, তাঁর বাঁয়ে ছিল দু'খিলান, ডানে ছিল এক খিলান, পেছনে ছিল তিন খিলান।[৫২] এর পর তিনি কাবা গৃহ থেকে বের হয়ে উসমান ইবনে তালহাকে ডেকে তার হাতে কাবার চাবি তুলে দেন। জাহিলিয়াতের সময়ে বানুশায়বা ছিল কাবাগৃহের তত্ত্বাবধায়ক, এটি তাদের নিয়ন্ত্রণেই ছিল।[৫৩]

রাসূল (সা) কৃষ্ণ পাথরটি স্পর্শ করে কাবা গৃহ *তাওয়াফ* করলেন আর বললেন, "*লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ*" এবং "*আল-াহু আকবর*"। তিনি এসময় আল্লাহকে স্মরণ করেন ও তাঁর প্রশংসা করেন। তিনি তখন *ইহরাম* বাঁধা অবস্থায় ছিলেন না। তিনি শিরস্ত্রাণ পরেন এবং মাথায় একটি পাগড়ি পরেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কেউ *হজ্ব* বা *উমরাহ* না করলেও *ইহরাম* বিহীন অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করতে পারে।[৫৪]

সকল ধরনের মূর্তি আর *জাহিলিয়াতের* লজ্জাকর চিহ্ন থেকে কাবা গৃহকে পবিত্র করা হলো। আল্লাহর ইচ্ছায় কাবা তার পূর্বঅবস্থাতে ফিরে এলো। ইবরাহিম আর ইসমাইল যে উদ্দেশে কাবা নির্মাণ করেছিলেন আল্লাহর ইবাদতের স্থান হিসাবে কাবা তার পূর্ব মর্যাদায় ফিরে এলো। মূর্তি থেকে কাবাকে পরিষ্কার করা আরব উপদ্বীপে মূর্তি পূজার প্রতি সবচেয়ে চরম আঘাত হিসাবে পরিগণিত হলো। এর কারণ কাবা ছিল মূর্তি পূজার সবচেয়ে বড় কেন্দ্রস্থল।

মক্কা বিজয়ের পর এবং কাবা গৃহের সব মূর্তি পরিষ্কার করার পর রাসূল (সা) খালিদ ইবনে আল ওয়ালিদকে আল উজ্জা মূর্তি ধ্বংসের জন্য নাখলায় প্রেরণ করেন। এ মূর্তিকে মুযারের সব গোত্র সম্মান করতো। খালিদ এটিকে ধ্বংস করে দিল।[৫৫] আমর ইবনুল আসকে হুদাহলের মূর্তি সুয়া ধ্বংসের জন্য প্রেরণ কর হলো। আমর এটি ধ্বংস করলেন।[৫৬] সা'দ ইবনে যায়েদ আল আশালিকে মুশাল্লাল মূর্তি ধ্বংসের জন্য (এ স্থানটি মক্কা থেকে মদীনার পথে কাদিদের কাছের একটি জায়গা) প্রেরণ করা হয়। তিনি মুশাল্লাল মূর্তি ধ্বংস করেন।[৫৭] এভাবে মূর্তির সবচেয়ে বড় কেন্দ্রই ধ্বংস করে দেয়া হলো। আল্লাহ কুরআনে বলেন ঃ

> তোমরা কি ভেবে দেখেছ লা'ত ও উয্যা সম্বন্ধে এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত' সম্বন্ধে? (৫৩:১৯-২০)

সূরা নাসর-এ মক্কা বিজয় সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

> যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্র দীনে প্রবেশ করতে দেখবে। তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো, তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করো, তিনি তো তওবা কবুলকারী। (১১০ঃ১৩)[৫৮]

কুরাইশ আর মুসলমানদের মধ্যেকার বিবাদের সমাপ্তির জন্য আরবরা অপেক্ষা করছিল। যখন মক্কা বিজয় হয় তখন তারা দলে দলে ইসলাম কবুলের জন্য আসে।[৫৯] এ প্রসঙ্গে আমর ইবনে সালামাহ আল যুরামি বলেন, "আরবরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে কে যুদ্ধে জয়ী হয়। তারা বলছিল, 'অপেক্ষা কর যদি সে তাদেরকে পরাজিত করে, তখনই বুঝা যাবে সে সত্য বলছে আর তখনই বুঝা যাবে যে সে নবী।' যখন আমাদের জয় হলো তখন সকল গোত্রই ইসলাম গ্রহণে দৌড়ে এলো"[৬০]

এ বিজয়ের উপর ইবনে ইসহাক মন্তব্য করেন," আরবরা পিছনে মার খাচ্ছিল, তারা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। কুরাইশ আর আল্লাহর রাসূলের মধ্যকার লড়াই শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা কোন সিদ্ধান্তই নিতে পারছিল না। কুরাইশদেরকে এভাবে মূল্যায়নের কারণ হলো তারা ছিল জনগণের নেতা , কাবার লোক, ইবরাহিম (আ) এর বংশধরের উত্তরসূরী। সব আরবই কুরাইশদেরকে গ্রহণ করেছিল। কুরাইশরাই আল্লাহর রাসূলের (সা) বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিল। যখন মক্কা জয় করা হলো, কুরাইশরা তার পদানত হলো, তারা ইসলাম গ্রহণ করলো। আরবরা তখন বুঝতে পারলো আল্লাহর

রাসূল (সা) এর বিরুদ্ধে তাদের লড়াইয়ের কোন শক্তি নেই। তাঁর বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতাপূর্ণ কাজের কোন অর্থ নেই। সুতরাং তারা আল্লাহর পথে দাখিল হলো, মহান আল্লাহর ইসলাম কবুল করলো। তারা "দলে দলে" "সব দিক থেকে" এসে তাঁর কাছে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো।[৬১]

রাসূল (সা) মক্কায় অনেকগুলো নির্দেশ জারী করলেন। প্রথম নির্দেশটি আসলো কাবা গৃহ থেকে। এ নির্দেশে ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হত্যা করা হলে তার রক্তপণ সম্পর্ক বলা হয়েছে। তিনি *জাহিলিয়্যাদের* সকল ঐতিহ্য বিলুপ্ত করেন। মানুষের উপর থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের নীতি বিলুপ্ত করেন। তবে এ ক্ষেত্রে দু'টি বিষয়কে বাদ দেয়া হলো ঃ হাজীদের মধ্যে পানি বিতরণ এবং কাবার দায়িত্ব কুরাইশদের উপর ন্যস্ত থাকা; তিনি এ দু'টো ঐতিহ্যকে পরিবর্তন করলেন না।[৬২]

দ্বিতীয় নির্দেশে বলা হয়েছে, *জাহিলিয়া* জামানায় কৃত সকল মৈত্রি চুক্তি বাতিল করা হলো। এক্ষেত্রে যে চুক্তিগুলো মানুষের কল্যাণে, সত্য প্রতিষ্ঠার স্বার্থে বা আত্মীয়-স্বজনদের কল্যাণে করা হয়েছিল সেগুলো পরিবর্তন করা হলো না।[৬৩]

তৃতীয় নির্দেশে বলা হয়েছে, মক্কাকে পবিত্র স্থান হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে কোন প্রকার শিকার কার্য চলবে না, কোন বনবৃক্ষ এখান থেকে সংগ্রহ করা যাবে না। কোন বৃক্ষ কাটা যাবে না। কোন জিনিস এখান থেকে কুড়িয়ে নেয়া যাবে না বা খোয়া যাওয়া কোন জিনিস মক্কার ভিতরে রাখা যাবে না। মক্কায় যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হলো। তাঁর দ্বারা মক্কায় লড়াইয়ের ব্যাপারে তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন। আল্লাহ তাঁকে স্বল্প সময়ের জন্য মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছিলেন।[৬৪] মক্কা বিজয়ের পর কোন হিজরত হবে না, শুধুমাত্র *জিহাদ* ও *জিহাদের নিয়ম* থাকবে।[৬৫] মদীনায় হিজরত করা এখন আর বাধ্যতামূলক নয়। তবে কোন *কাফির* দেশ থেকে কোন ইসলামী দেশে *হিজরত* করা শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত জারী থাকবে।[৬৬] মদীনায় *হিজরত* জারী করা হয়েছিল মুসলিমরা যাতে দেশ ত্যাগ করে মদীনায় নিরাপদে আল্লাহর ইবাদত করতে পারে। শত্রুদের বিরুদ্ধে মদীনা রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার জন্য, মদীনা রাষ্ট্রকে রক্ষার জন্য এবং *জিহাদের* মাধ্যমে মদীনা রাষ্ট্রের সীমা প্রসারিত করার জন্য। মক্কা বিজয়ের পর *হিজরতের* আর কোন প্রয়োজন রইল না। কারণ ইসলাম এখন যথেষ্ট শক্তিশালী। মুসলিমরা নিজেদের বাড়ীতে থেকেই নিরাপদে আল্লাহর ইবাদত করতে পারে এবং চারিদিকে ইসলামের নির্দেশনা পৌঁছিয়ে দিতে পারে। শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত *জিহাদ কায়েম* থাকলো। এজন্য রাসূল (সা) মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের পরিবর্তে ঈমান ও *জিহাদের* জন্য মুসলমানদেরকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে বললেন।[৬৭] ইবনে উমর বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করেন, "মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (সা) এর জন্য *হিজরত* স্থগিত করা হলো কিন্তু *কুফর* থাকা পর্যন্ত *হিজরত* বন্ধ হবে না।" সে জন্য পৃথিবীতে যতদিন *কাফির* ভূ-খন্ড থাকবে, ইসলাম গ্রহণকারীদের জন্য *হিজরত* বাধ্যতামূলক হবে আর যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের নিজ দীন থেকে অন্য ধর্মে প্রলুব্ধ করা হবে।[৬৮]

চতুর্থ নির্দেশে বলা হয়েছে, কোন পরিবারের কাউকে বিনা কারণে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হলে সেজন্য সে রক্তমূল্য পাবে বা হত্যাকারীকে প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্তে হত্যা করবে।[৬৯]

মক্কা বিজয়ের সময় *শরীয়ার* কতগুলো বিধান স্পষ্ট করা হলো। রমাযানে মুসাফির রোযা রাখতে পারে আবার না-ও রাখতে পারে-এ বিধান জারী হলো। এর জন্য কোন অপরাধ বা গুনাহ্ হবে না। রাসূল (সা) মদীনা থেকে কাদিদে তাঁর অভিযান পরিচালনার সময়ে রোযা রেখেছিলেন, তিনি পথিমধ্যে রোযা ভেঙ্গেছিলেন।[৭০]

রাসূল (সা) আট রাকাতের যু'হা (*সালাত আয যুহা*) আদায় করেন।[৭১] এ সালাত *সুন্নাতে মুয়াক্কাদা*।

যার বেশী কুরআন মুখস্থ আছে সেই ইমামতি করার যোগ্য।[৭২]

সবচেয়ে বেশী পরিমাণ যে সময় *মুসাফির* তার সালাত কসর করতে পারে ঃ রাসূল (সা) উনিশদিন মক্কায় অবস্থান করেন, এ সময়ে তিনি সালাত কসর করেন।[৭৩]

মহিলাদের দেয়া নিরাপত্তা ঃ উম্মে হানী দু'জন পুরুষকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন, দু'জন ছিলেন জ্ঞাতিভাই। রাসূল (সা) উম্মে হানীর নিরাপত্তার বিধান করেছিলেন।[৭৪] পন্ডিতদের মতে মহিলাদের দেয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা জায়েয।[৭৫]

মু'তার ঐক্য ঃ এ ধরনের ঐক্যকে মাত্র তিনদিনের জন্য জায়েয আর সবসময়ের জন্য *হারাম* করা হলো।[৭৬] *মু'তাকে* দু'বার নিষিদ্ধ ও জায়েয করা হয়েছিল। খায়বারের পূর্বে এটিকে জায়েয আবার খায়বারের দিনেই এটি নিষিদ্ধ করা হয়। এরপর মক্কা বিজয়ের দিনে জায়েয করা হয়, কিন্তু তিনদিন পরই আবার এটিকে নাজায়েয ঘোষণা করা হয়। এ নিষেধাজ্ঞা শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত জারী থাকবে।[৭৭]

বিধিটির ব্যাখ্যা ঃ "শিশুটি বিছানার মালিকের আর ব্যভিচারকারীর জন্য পাথর।" জনৈক দাস-কন্যা জামা'র সন্তানের মাধ্যমে এ কাহিনীর সূত্রপাত। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস এবং আবদ ইবনে জামা'র মধ্যে একটি শিশু সন্তান নিয়ে ঝগড়া চলছিল। বিচারক আবদ ইবনে জামা'র পক্ষে রায় দেন। এর কারণ শিশুটির জন্ম হয়েছিল আবদ ইবনে জামা'র পিতার বিছানায়।[৭৮]

মুশরিকের বিবাহ ঃ জনৈক মুশরিক জনৈক মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মহিলা বিবাহের পূর্বেই ইসলাম কবুল করেছিলেন। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যাও ইকরিমাহ ইবনে আবু জাহল'র মধ্যে এরূপ ঘটনা ঘটেছিল। এ অবস্থায় তাদের মধ্যে ও তাদের স্ত্রীদের *ইদ্দত* শেষ হওয়ার পূর্বেই তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[৭৯]

ওসিয়াত সম্পর্কে বিধানঃ এক তৃতীয়াংশের বেশী কোন মুসলমান *ওসিয়াত* করতে পারবে না। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের ঘটনার মাধ্যমে এটির সূত্রপাত। সা'দ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে রাসূল (সা) এক তৃতীয়াংশের বেশী *ওসিয়ত* করতে নিষেধ করেন।[৮০]

স্ত্রীকে তার প্রয়োজন মিটানোর জন্য এবং তার সন্তান সন্ততির জন্য স্বামীর কাছ থেকে যৌক্তিক পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। তার স্বামী তাকে যদি এরূপ প্রয়োজনীয় অর্থ না দিয়ে থাকে তখনই এটি প্রযোজ্য হবে। এরূপ একটি ঘটনা আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবা'র বেলায় ঘটেছিল। হিন্দ এ ব্যাপারে রাসূল (সা) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।[৮১] মদ, পচা মাংস এবং পুতুল বিক্রি নিষিদ্ধ করা হলো।[৮২]

মেহেদী বা *সুফরাহ* দিয়ে চুল রং করা জায়েয করা হলো। এরূপ একটি ঘটনা সাহাবী আবু কুহাফার ক্ষেত্রে ঘটেছিল, আবু কুহাফাকে রাসূল (সা) তার পাকা চুল রং করতে বলেছিলেন।[৮৩]

আল্লাহর নির্দেশে কোন নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য অঙ্গচ্ছেদ করা। যখন কোন নেতার বিষয় জানা হলো তখন আল্লাহর নির্দেশিত অঙ্গচ্ছেদ নিষিদ্ধ করা হলো। এ ঘটনা ঘটে জনৈক মাখজুমি মহিলার ক্ষেত্রে। মাখজুমি মহিলা চুরি করলো আর তার হাত কেটে দেয়া হলো। সে ছিল গরিব মহিলা। রাসূল (সা) এ কথা শুনে উসামা ইবনে যায়েদের উপর রাগান্বিত হলেন কারণ সে মহিলার অঙ্গচ্ছেদ করেছিল। এ প্রসংগে রাসূল (সা) বলেন ঃ

হে জনগণ, যারা তোমাদের পূর্বে চলে গিয়েছে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। কারণ তাদের মধ্যে উঁচু পর্যায়ের কেউ চুরি করলে তার কোন বিচার করা হতো না, তাকে বাঁচিয়ে দেয়া হতো; আর নীচু পর্যায়ের কেউ চুরি করলে তার উপর নির্ধারিত শাস্তি অর্পণ করা হতো। তাঁর শপথ, যার হাতে মুহাম্মদের জীবন, মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করতো আমি তার হাত কেটে দিতাম।[৮৪]

এ হাদিসে *শরীয়তের* দৃষ্টিতে সব মানুষ সমান এর নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। নেতাদেরকে দুর্বলদের উপর *হদ* কায়েম করার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে আর শক্তিশালীদের উপর *হদ* কায়েম কেন করা হবে না এ ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে, যারা প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপের কারণে বা চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাপ্য শাস্তি এড়িয়ে চলে। কোন রাষ্ট্র বা সমাজের স্থায়িত্ব নির্ভর করে প্রধানতঃ সে সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। কোন রাষ্ট্র যদি নিজেই নির্যাতনকারী হয়ে থাকে, তার শত্রুরা ঐ রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার পথ পেয়ে যায়। রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের কারণে নির্যাতিত ব্যক্তি শত্রুর কাছাকাছি এসে যায় এবং রাষ্ট্রের পতনে তারা নিজেদেরকে পর্যন্ত উৎসর্গ করে।

মক্কা বিজয়ের ফলে *শিরক'র* কেন্দ্র কুরাইশদের কাছ থেকে হাওয়াজিন ও সাকিফদের কাছে চলে যায়। তারা এ শূন্যতা পূরণে দ্রুতই এগিয়ে আসে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে *মুশরিকদেরকে* সাহায্যের জন্য। এর ফলে হুনাইনের যুদ্ধ ও তায়েফ অবরোধ সংগঠিত হয়।

পাদটীকা ঃ

১. ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৪/২৭৮

সনদসহ ইবনে ইসহাক হতে যা *হাসান লি* জাতিহি, ইবনে ইসহাক স্পষ্টভাবে তাহদীস ঘোষণা করেছেন । আলতাবারানিতে বর্ণনাটির একটি দুর্বল *শহীদ* রয়েছে; আল মুযাম আল সগীর, ২/৭৩, ইয়াহিয়া ইবনে সুলায়মান আল খুজাই এর দুর্বলতার জন্য; আরেক *শহীদ, মুসনাদ আবু ইয়ালা আল মওসিলি*। ৪/৪০০। এর সনদে রয়েছে হাজাম ইবনে হিশাম আল খুজাই, জনৈক শায়খ যার অবস্থান *সাদুক*, এবং যার পিতা তাবিঈ, তার যোগ্যতা জানা নেই। ইবনে হিব্বান তাদের উভয়কে *সিকাহ* বলেছেন (আল হায়সামি, *মাযমা আল জাওয়াইদ*, ৬/১৬২)।

২. ইবনে হিশাম, *আল সীরাহ আল নবুওয়্যা*, ২/৩৮৯, সনদ ছাড়া।

৩. আল ওয়াকিদি, *আল মাগাযী* ২/৭৮৬, খুব দুর্বল সনদসহ।

৪. ইবনে কাসির, *আল বিদ্যায়্যা ওয়া আল নিহায়া*, ৪/২৮১, মূসা ইবনে উকবার বর্ণনা হতে, সনদ ছাড়া।

৫. ইবনে হাযার, *আল মাতালিব আল আলিয়্যা*, ৪২৪৩, *মুরসাল* ইবনে ইবাদ ইবন যাফর এর *মুরসাল* হতে সহীহ সনদপত্র সহ তার সাথে সংশ্লিষ্ট। ইবনে হাযার, *ফাতহুর বারী* , ৬/৮, মুহাম্মদ ইবনে আইদ আল দিমাসকি হতে, ইবনে উমরের হাদীস হতে। দেখুন, ইবনে কাসির, *আল বিদ্যায়্যা ওয়া আল নিহায়া*, ৪/২৮৩ম এবং আল ওয়াকিদি , *আল মাগাযি*, ২/২৮৬।

৬. ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহয়্যা*, ৪/২৮৩, সহীহ সনদ সহকারে ইবনে ইসহাকের বর্ণনা হতে।

৭. ইবনে সা'দ, *আল তাবাকাত*, ২/৩৯৭, সনদ ছাড়া।

৮. ইবনে ইসহাক সনদসহ যা *হাসান লি জাতিহি, (সীরাত ইবনে হিশাম*, ২/৩৯৯)।

৯. প্রাগুক্ত।

১০. *সহীহ আল বুখারী*, ৪/৭২, ৭৯; ৫/৯৯; ৯/২৩; সহীহ মুসলিম, ৭/১৭০

১১. *সহীহ আল বুখারী*, ৫/১৮৫; ইবনে হাজার *ফাতহুর বারী*, ৪/১৮০, ১৮১; আল নওয়ারী, আল মিনহাজ *শারহ সহীহ মুসলিম ইবনে আল হাজ্জায*, ৩/১৭৩; তিনি দূরত্বটিকে মারাহিল ও মাইলে হিসাব করেন।

১২. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ২/৩৯৯, সনদসহ ইবনে ইসহাকের একটি বর্ণনা হতে যা *হাসান লি জাতিহি*। আল হাফিয ইবনে হাজার এটিকে *সহীহ* বলেছেন। (*আল মাতালিব আলআলিয়্যা বি জাওয়াইদ আল মাসাযিদ আল সামানিয়্যাহ, ৪/২৪৮*), আল হাকিম এটিকে *সহীহ* বলেছেন এবং মুসলিম শর্তানুসারে এটি *সহীহ*, যদিও তারা এটি বর্ণনা করেননি; আল যাহাবী তার সাথে একমত (আল মুসতাদরাক, ৩/৪৪)। কিন্তু ইবনে ইসহাক আল বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুসরণ করেননি, মুসলিম শুধুমাত্র *আল মুতাবাতে* এটির বর্ণনা করেছেন।

১৩. আল নওয়াবী, *শারহ মুসলিম*, ৩/১৭৬।

১৪. সহীহ মুসলিম, ১/৪৫২, ৪৫৩; ইবনে সা'দ, *আল তাবাকাত*, ২/১৩৮।

১৫. আল হাকিম, *আল মুসতাদরাক*, ৩/৪৩-৫, *হাসান সনদ সহ*। আল হাকিমের মতে মুসলিমের শর্তানুসারে *হাদীসটি সহীহ*, যদিও তারা এটির বর্ণনা করেননি। আল যাহাবি তার সাথে একমত। আরও দেখুন, *সীরাত ইবনে হিশাম*, ২/৪০০। আল তাবারী, *তারিখ*, ৩/৫০ তাঁর ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন তার *কাসিদ*, *সহীহ মুসলিম*, ২/৩৯৫।

১৬. ইবনে আবদ আল বার, *আল ইসতিয়াব* (আল ইসবা'র পাদটীকা), ২/২৬৩।

১৭. ইবনে হিশাম, আল সারাহ আল নবাবিয়াহ, ২/৪০০, আল যুহরী হতে প্রেরিত, সনদছাড়া।

১৮. আবদ আল রায্যাক, *আল মুসান্নাফ*, ৫/৪৬৬; আহমাদ, *আল মুসনাদ*, ২১/১২২। আর ফসাবী, *আল মা'রিফাহ ওয়া আল তারিখ*, ১/৫০৭, ৫০৮, ৫০৯। ইবনে কাসির বলেন, "দু'শায়খের শর্তনাসারে এ সনদ সহীহ (আল বুখারী ও মুসলিম) তবে ছয়গ্রন্থের কোন প্রণেতাই এটির বর্ণনা করেননি। আল নাসা এর ব্যতিক্রম" (*আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৪/২১৭)।

১৯. ইবনে সা'দ *আল তাবাকাত*, ৪/১০। এর সনদে রয়েছে হুসাইন ইবনে আবদ আল্লাহ আল হাশিমি যাকে *যঈফ* মনে করা হয় এবং ৪/১১, এর সনদে রয়েছে আল ওয়াকিদি, এটি *মাতরূক*। ইবনে আবু সারবাকে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

২০. *ইবনে সা'দ*, আল তাবাকাত, ৪/৩১। এর সনদে রয়েছে আল ওয়াকিদি যাকে মাতরূক বলা হয়। ইবনে আব হাবিবাহকে *যয়িফ* বলা হয় এবং *সনদটি* হলো *মুনকাতি*।

২১. ইবনে হাজার, *আল মাতালিব আল আলিয়্যা*, ৪/২৪৪, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ'র বর্ণনা হতে। ইবনে হাযার বলেন, "এটি সহীহ হাদীস।" আল তাহাবী (শারহ্ মা'নি আল আথার, ৩/৩২২) বলেন, " আল বুখারীর মতে এটি সহীহ (৫/১৮৬) তবে বিস্তারিত বিবরণসহ।

২২. *সহীহ আল বুখারী*, ৫/১৮৬। *কাযহাবা* (মিথ্যা বলা হয়েছে) ব্যবহৃত হয়েছে আহ্কতা (ভুল করা হয়েছে) এর মর্মঅনুসারে।

২৩. ইবনে হাজার, *মুসতাসার জাওয়াইদ আল বায্যার* ২৪৮, তিনি বলেন এটি *সহীহ*।

২৪. ইবনে মাজাহ, *সুনান*, ২/৯৪১, সহজ সহকারে যা *হাসান লি জাতিহি।*

২৫. আর ওয়া কিকি, *আল মাগাযি*, ২/৭৯৯, ৮০১।

২৬. *সহীহ আল বুখারী*, ৫/১৮৯।

২৭. ইবনে হাযার *ফাতহুর বারি*, ৮/১০

২৮. *আল সীরাহ আল নবাবিয়াহ*, ২/৪০৭ ও ইবনে ইসহাকের বর্ণনা হতে। *মুরসাল*, তার দু'জন সীকাত শায়খ হতে। আল হাকিম, *আল মুসতাদরাক*, ৩/২৪১। আল বুখারী মাত্র দু'জন শহীদের উল্লেখ করেছেন।

২৯. আল বায়হাকী, *আল সুনান আল কুবরা*, ৯/১২০, সনদসহকারে এবং যার জীবন বৃত্তান্ত আমি দেখিনি ইহা মূসা ইবনে উকবাহ'র *মারাসিল* হতে।

৩০. আল ওয়াহিদি, *আল মাগাযি*, ২/৪২৭-৯, সনদ ছাড়া।

৩১. ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৪/২৯৭। এসব *সনদে* রয়েছে শুয়াইব ইবনে সাফওয়ান আল সাকাফি, তিনি মকবুল, সুতরাং বর্ণনাটি *যয়িফ*।

৩২. সহীহ মুসলিম, ২/৯৫; ৬/২৯৬-৭।

৩৩. ইবনে খাতাল ইসলাম গ্রহণ করেন। এর পর তিনি এক মুসলমান হত্যা করেন এবং স্বধর্ম ত্যাগ করেন। আসল ঘটনা হলো কাবার পর্দার সাথে লেগে থাকার কারণে তাকে হত্যা করা হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যার উপর শরীয়তের বিধান অনুযায়ী শাস্তি প্রযোজ্য তাকে কা'বা কোন আশ্রয় প্রদান করে না। *সীরাত ইবনে হিশাম*, ২/৪১০, *সনদ* ছাড়া ইবনে ইসহাক হতে।

৩৪. আল নাসাঈ, সুনান। আল সুয়ুতি, জুহ্‌র আলরুবা, ৭/১০৫) এর সনদে কিছু দুর্বলতা রয়েছে। হাদীসটির দু'টো *সাক্ষ্য রয়েছে*। উভয়টি আল বায়হাকি কর্তৃক বর্ণিত। একটি হলো ইবনে কাসির, *আল বদায়্যা ওয়া আল নিহায়া*, ৪/২৯৯, সনদ হিসাবে আবদুল্লাহ ইবনে খাতালের পরিবর্তে আল হাসান ইবনে আবদ আল উয্‌যা ইবনে খাতাল সংযুক্ত। এখানে তার নামের ব্যাপারে কিছু পার্থক্য দেখা যায় এবং ইকরিমার বদলে উম্মে সারাহ ব্যবহৃত হয়েছে। অন্য শহীদগণ *আল সুনান আল কুবরা*, ৯/১২০, আমর ইবনে উসমান আল মাখজুমি সহ, তাকে মকবুল বলা হয়। তিনি ইকরিমার বদলে আল হুয়াইরিস ইবনে নাকিদের নাম ব্যবহা করেছেন। এ বর্ণনাগুলো *যঈফ* হলেও এগুলো একটি আরেকটিকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বর্ণনায় সমর্থন দিয়ে থাকে। কাবার পর্দার সাথে লেগে থাকার পরও ইবনে খাতালের হত্যার বর্ণনা দু'টো সহীহ বর্ণনাই আছে (*সহীহ আল বুখারী*, ৫/১৮৮, *সহীহ মুসলিম*, ১/৫৭০)।

৩৫. ইবনে হাযার, *ফাতহুর বারি*, ৮/১১, ১২

৩৬. আল মাসনাদে আহসান কর্তৃক বর্ণিত (*আল ফাতহ আল বাব্বানী*, ২১/১৫৯) সনদ সহকারে যা হাসান লিজাতিহি। আরো দেখুন, আল মুসনাদের পরিপূরক একটি বর্ণনা, ৪/৩২, হাসান সনদ সহ, যেখানে ইবনে ইসহাক স্পষ্টভাবে তাহদিস বর্ণনা করেছেন। *আল মুসনাদে* দেখুন আরেকটি, ৪/৩১; এর সাথে যুক্ত মুসলিম ইবনে ইয়াযিদ আল সা'দ যাকে *মকবুল* বলা হয়, তবে কিছু কিছু মুতাকা'ত পাওয়া গিয়েছে, সুতরাং বর্ণনাটি *হাসান লি গায়রিহি* পর্যায়ে শক্তিশালী।

৩৭. আবু ওবায়েদ, *আল আসওয়াল*, ১৪৩, এটি হাসান কিন্তু *মুরসাল সনদসহ*। দেখুন আরও, ইবনে হিশাম, সীরাহ ২/৪১২, সনদসহ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা হতে, যার মধ্যে কিছু মাজহুল বর্ণনাকারী রয়েছে।

৩৮. আহমাদ, মুসনাদ, ৩/১৩৫; আল তিরমিযী, *সুনান*, ৪/৩৬১, ৩৬২। হাসান পর্যায় দু'টো সনদই একটি অপরটিকে সমর্থন করে। আহমাদের সনদে হাদিয়া আল মারুজিযুক্ত, তাকে *সাদুক* বলা হয় তবে এতে কখনো কখনো বিভ্রান্ত হতে হয়। এবং ঈসা ইবনে উবায়েদ আল কিন্দি, তাকে *সাদুক* বলা হয়। আল হাকিম বলেন, সনদটি সহীহ, যদিও তারা এর বর্ণনা করেন নি।" আল যাহাবি এর সাথে একমত *আল মুসতাদরাক*, ২/৩৫৯)।

৩৯. ইবনে কাইয়্যিম, *জাদ আল মা'দ*, ২/১৯৪। এটি মক্কার আতা ও মুজাহিদের *মাযহাব*। মদীনার লোকদের মধ্যে মালিক; ইরাকের লোকদের মধ্যে আবু হানিফা; এবং সুফিয়ান আল সওরী এবং ইমাম আহমাদ ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াই।

৪০. প্রাগুক্ত।

৪১. *সহীহ আল বুখারী*, ৫/১৮৭; সহীহ মুসলিম, ১/৫৬৭।

৪২. ইবনে হাযার, *ফাতহুর বারি*, ৮/১৫।

৪৩. *সহীহ আল বুখারী*, ৫/১৮৭।

৪৪. আবু দাউদ, সুনান, ১/৪৩৪, সনদসহ যা *হাসান লি জাতিহি; আল হায়সামী*, মাজমা আল *জাওয়াইদ*, ৩/২৪৪, তাবারানি হতে, বর্ণনাকারীগণ *সহীহ* এমন সনদ সহ।

৪৫. আল তিরমিযী সুনান ৩/৮৩। তিনি বলেন। "এটি *হাসান সহীহ*। আহমাদ *আল মুসনাদ*, ৪/৪১২; *সনদসহ যা হাসান লি জাতিহি*।

৪৬. সহীহ মুসলিম, ২/৯৭, আহমাদ, *আল মুসনাদ*, ৩/৪১২, সহীহ সনদ সহ।

৪৭. মুসলিম, সহীহ, ২/৯৫, ৯৬, ২৯৬, ২৯৭।

৪৮. সহীহ আল বুখারী, ৫/১৮৮; মুসলিম, সহীহ, ২/৯৭,

৪৯. *সহীহ আল বুখারী* ৫/৮৮; আহমাদ, *আল মুসনাদ*, ১/৩৬৫, *সহীহ* সনদসহ। আল বুসাইতরি, *ইফ আল খাইরাহ আল মাহারাহ*, খন্ড°, শাইবাহ, *হাসান সনদসহ*।

৫০. *সহীহ আল বুখারী*, ৪/১৬৯।

৫১. প্রাগুক্ত, ৫/১৮৮।

৫২. প্রাগুক্ত, ৫/২২; ১/১০৯-১১০; মুসলিম, সহীহ, ১/৫৫৬

৫৩. এ ব্যাপারে বেশ কিছু সংখ্যক মুরসাল ও মুনকাতি বর্ণনা বর্ণিত হয়। ঐগুলো একসাথ হয়ে জোরালো হয়। (দেখুন, আবদ আল রায্যাক, আল মূসান্নাফ, ৫/৮৩-৫; এবং ইবনে হাযার, ফাতহুর বারি, ৮/১৯)

৫৪. *সহীহ আল বুখারী*, ৩/২১; *মুসলিম, সহীহ*, ১/৫৭০, আল নওয়াবী, *শারহ আলা মুসলিম, সহীহ*, ৩/৫০৮।

৫৫. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ২/৪৩৬; ইবনে সা'দ *আল তাবাকাত*, ২/১৪৫। এর ধ্বংস সম্পর্কে কোন বর্ণনা সহীহ প্রমাণিত নয়।

৫৬. ইবনে সা'দ, *আল তাবাকাত*, ২/১৪৬।

৫৭. প্রাগুক্ত, ২/১৪৬।

৫৮. *সহীহ আল বুখারী*, ৫/১৮৯।

৫৯. প্রাগুক্ত, ৫/১৯১।

৬০. ইবনে সা'দ *আল তাবাকাত*, ১/২ পৃ. ৭০

৬১. সীরাত আল হিশাম, ২/৫৬০।

৬২. আহমাদ, *মুসনাদ*, ৩/৪১০, সনদ সহকারে যা *হাসান লি জাতিহি*; আবু দাউদ, সুনান, ২/৪৯২, সহীহ সনদ সহকারে।

৬৩. *মুসলিম, সহীহ*, ২/৪০৯, আহমাদ, *আল মুসনাদ*, ২/২১৫। তার সনদে রয়েছে আবদুর রাহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আইয়াশ, তিনি ছিলেন সাদুক এবং কখনো কখনো বিভ্রান্তিকর।

৬৪. *সহীহ আল বুখারী*, ৩/১৭; মুসলিম, সহীহ, ২/৫৬৮।

৬৫. *সহীহ আল বুখারী*। ৩/১৮।

৬৬. ইবনে হাজার, *ফাতহুল বারি*, ৪/৪৯, ৪/২৭০।

৬৭. *সহীহ আল বুখারী*, ৫/৭২, ১৯৩; মুসলিম, সহীহ, ২/২৬।

৬৮. ইবনে হাজার, *ফাতহুল বারি*, ৭/২৭০।

৬৯. *সহীহ আল বুখারী*, ১/৩৮; মুসলিম, সহীহ, ১/৫৬৯

৭০. *সহীহ মুসলিম* ১/৪৫১।

৭১. *সহীহ আল বুখারী*, ৫/১৮৯; *সহীহ মুসলিম*, ১/২৮৯।

৭২. সহীহ আল বুখারী, ৫/১৯১

৭৩. প্রাগুক্ত, ৫/১৯০।

৭৪. প্রাগুক্ত, ৪/১২২।

৭৫. আল খাত্তাবি এ পরামর্শ দেন (আওন আল মাবুদ, ৭/৪৪)।

৭৬. *মুসলিম, সহীহ*, ১/৫৮৬-৭।

৭৭. আল নবাবী, *শারহ সহীহ মুসলিম* ৩/৫৫৩।

৭৮. সহীহ *আল বুখারী* ৯/১৯১।

৭৯. মালিক ইবনে আনাস, *আল মুয়াত্তা*, (আল জারকানি, *শারহ আল মুয়াত্তা*, ৩/১৫৬-৭); ইবনে হিশাম, *সীরাহ* ২/৪১৭।

৮০. আল তিরমিযী, *সুনান*, ৩/২৯১। তিনি বলেন,এটি একটি *হাসান সহীহ হাদীস*। আরও দেখুন, ইবনে হাযার *ফাতহুল* বারী, ৫/৩৬৯।

৮১. *সহীহ মুসলিম*, ২/৬০।

৮২. *সহীহ আল বুখারী*, ৩/১১০; *সহীহ মুসলিম*, ১/৬৮৯-৯০।

৮৩. *সহীহ মুসলিম*, ২/২৪৪।

৮৪. *সহীহ আল বুখারী*, ৫/১৯২; *সহীহ মুসলিম*, ২/৪৭।

অধ্যায় ১৫

হুনাইনের যুদ্ধ

হাওয়াজিন ছিল উত্তর আরবের একটি বিখ্যাত গোত্র, এটি আরবের মুদার আদনানের শাখা। সাকিফের ন্যায় হাওয়াজিনের অনেকগুলো শাখা প্রশাখা ছিল। তায়েফের ভেতরে ও বাইরে সাকিফরা বসবাস করতো। এদিকে হাওয়াজিনের অন্য বংশগুলো লোহিত সাগরের কোল ঘেষে তিহামায় ছড়িয়ে পড়েছিল। তিহামা ছিল সিরিয়ার দক্ষিণ ও ইয়েমেনের উত্তরের সীমান্ত এলাকার একটি জায়গা।[১] হাওয়াজিনের লোকজন এখানে বসবাস করছিল।

জাহিলিয়াতের সময় সাকিফের এলাকাগুলোতে আরবদের মার্কেট বসতো। নাখলা ও তাইফের মাঝামাঝি স্থানে একটি বিখ্যাত বাজার ছিল উকাজ বাজার। এখানে ব্যবসায়ীরা তাদের দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করা ছাড়াও সাহিত্য সংস্কৃতি ও কবিতা উৎসব হতো। তায়েফের দিকে যেতে আরাফা হতে *ফারসাখ* (কয়েক মাইল) দূরত্বে আরাফার সন্নিকটে যুল মাযাযে এরূপ আরেকটি বাজার,[২] মক্কার কাছে তায়েফ থেকে দূরে মার আল জাহরানে মাযান্নাতে আরেকটি বাজার।

এসব বাজার থেকে সাকিফের লোকেরা বেশ উপকৃত হয়েছিল। এখানে তারা নিজস্ব জিনিসপত্র বেচাকেনা করা ছাড়াও তাদের বিভিন্ন কৃষিপণ্য বেচাকেনা করতো। তারা আঙুর, ডালিম শাক-সব্জির চাষ করতো, সাকিফের বাজারে এসব কৃষি সামগ্রীও বেচা-কেনা হতো। এভাবে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বাজারে বিভিন্ন লোকজনের সাথে মেলা মেশার ফলে তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নতি হয়েছিল। তাদের সাহিত্য সংস্কৃতির উন্নতি হয়েছিল। তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের পরিধি অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তাছাড়া সাকিফের লোকেরা সিরিয়া ও ইয়েমেনের বহির্বাণিজ্যে দালালির ব্যবসাও করতো।

হাওয়াজিন ও সাকিফের স্বার্থ আর কুরাইশদের স্বার্থ অংগাগীভাবে জড়িত ছিল। কারণ তারা সবাই খুব কাছাকাছি এলাকায় বসবাস করতো; এখানে ফলের বাগান ও ঘরবাড়িও ছিল। তায়েফ "কুরাইশদের বাগান হিসেবে পরিচিত ছিল"[৩] আদিকালের আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে কুরাইশ ও হাওয়াজিনদের মধ্যেকার সম্পর্ক আরো জোরদার হয়। তাদের মধ্যে বিবাহ শাদীর কারণে কুরাইশ ও হাওয়াজিনদের মধ্যেকার এ সম্পর্ক হয়। উভয় গোত্রই এসেছিল হাওয়াজিনদের ষষ্ঠ পিতামহ মুদার আর কুরাইশদের সপ্তম বা পঞ্চম পিতামহের গোত্র থেকে।[৪] গোষ্ঠি সূত্রের এ হিসাব সামান্য এদিক সেদিক হতে পারে। *সাহাবীদের* জীবনীমূলক গ্রন্থ সমূহ হতে কুরাইশ ও হাওয়াজীনদের মধ্যেকার জটিল সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে উঠে। দু'গোত্রের মধ্যে বৈবাহিক সূত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন সম্পর্ক গড়ে উঠে।[৫] এসব সম্পর্কগুলোর নিশ্চয়তার অংশ হিসাবে

আমারা উরওয়া ইবনে মাসুদ আল সাকাফীকে কুরাইশদের দূত হিসাবে হুদায়বিয়ার যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাজ করতে দেখি।[৬]

কুরাইশ ও হাওয়াজিনদের মধ্যে গভীর সম্পর্কের কারণে হাওয়াজিনরা বিভিন্ন যুদ্ধ সংগ্রামে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদেরকে সাহায্য করেছিল। মুসলমানগণ মক্কায় থাকার সময়ে হাওয়াজিনরা এভাবে কুরাইশদেরকে সাহায্য করেছিল। সেজন্য মক্কার মুক্তির পর ইসলামের বিরোধিতাকারীদের পতাকা হাওয়াজিনদের হাতে তুলে দেয়া হয়। কুরাইশরা যখন আরব উপদ্বীপে *শিরকের* নেতা থাকলো না তখনই মুসলমানদের বিরুদ্ধে হাওয়াজিনদের হাতে এ পতাকা তুলে দেয়া হয়।

রাসূল (সা) (*হিজরতের* পূর্বে) তায়েফে গিয়েছিলেন তাদেরকে (সাকিফ) ইসলামের পথে আহবানের জন্য। সাকিফরা যখন তাঁর কথা শুনলো না তখন রাসূল (সা) তাদের কাছে সরাসরি এসেছিলেন- একথাটি তাদেরকে গোপন রাখতে বলেন। কিন্তু মুসলমানদের সাথে তাদের যে শত্রুতা ছিল এ বিষয়টি গোপন রাখা ছাড়া আর কোন বিষয় গোপন রাখতে তারা রাযী হলো না। তারা তাদের ছেলেমেয়েদেরকে তাঁর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করতে নির্দেশ করলো। কুরাইশ ও হাওয়াজিনদের স্বার্থ ছিল অভিন্ন। কেউ কুরাইশদের ধর্ম ও স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলে সেটা হাওয়াজিনদের স্বার্থ ও ধর্মের বিরুদ্ধেই যাওয়া হতো।

সামরিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের কারণে সাকিফদের ইসলাম গ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল (সা) ভালভাবেই অভিহত ছিলেন। সামরিক ও অর্থনৈতিক কারণে তাদের সাথে কুরাইশদের সুদৃঢ় সম্পর্কের ব্যাপারে রাসূল (সা) অভিহত ছিলেন। সাকিফে তাঁর সফর ব্যর্থ হলেও তিনি হাওয়াজিন নেতাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান জানান। রাসূল (সা) যখন তাদের নেতাদের কাছে নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন তখন তিনি আকাবার ইবনে আব্দ ইয়ালিল ইবনে আব্দ কালালের সাথে দেখা করেন। ইবনে আব্দ ইযালিল ইবনে আবদ কালাল ইসলাম কবুল করেনি। রাসূল (সা) এতে এত বেশী ভেংগে পড়েন যে, তিনি মক্কা থেকে অনেক দূরে চলে যান, তিনি সেখান থেকে ফিরে আসার পথ খুঁজে পাননি।[৭] *হিজরী* সনের পরে মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যে যে সংঘর্ষ বেধে গিয়েছিল তা থেকে হাওয়াজিনরা নিজদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে। তারা হয়ত মনে করেছিল কুরাইশরা একাই এ সংকট মোকাবেলা করতে পারবে। হাওয়াজিনরা এভাবে বদর, ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ দেখেছিল। এসব যুদ্ধে তারা কিছুই করেনি। বানু জাহরার মিত্র আল আখনাস ইবনে শুরাইক আল সাকাফি হাওয়াজিনদেরকে বদর প্রান্তর থেকে যুদ্ধ না করেই ফিরে আসতে প্ররোচিত করে। যেহেতু হাওয়াজিনদের ব্যবসা বাণিজ্য ঠিকঠাকমত চলছিল সেজন্য তারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি।[৮]

উরওয়া ইবনে মাসুদ আল সাকাফী রাসূল (সা) এর পরামর্শ গ্রহণে কুরাইশদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন।[৯] তবে এসব বিচ্ছিন্ন মনোভাব সাকিফের গুটিকয়েক মানুষের

মনোভাবকেই প্রকাশ করেছিল। এসব মনোভাবে মুসলমানদের প্রতি সাকিফ ও হাওয়াজিনদের কোন শান্তিপূর্ণ অবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বিভিন্ন ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, কুরাইশদের উপর নির্ভরশীলতার কারণে মক্কার মুক্তির পূর্বে সাকিফরা কোন কিছুতেই শরীক হয়নি। মুসলমানদের শক্তির ব্যাপারে তাদের জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহে তারা নির্বিকার থাকে। তবে মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলমানদের শক্তি সামর্থ সম্পর্কে হাওয়াজিনরা যে একেবারেই অভিহত ছিল তা নয়। তবে কুরাইশরা মুসলমানদের সাথে লড়াইয়ে তাদের নিজেদের দুর্বলতা সম্পর্কে অভিহত ছিল। মুসলমানদের শক্তি সামর্থ সম্পর্কে অভিহত থাকার কারণে কুরাইশরা হুদায়বিয়ার সন্ধি করে। কুরাইশরা এর পর ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে আর ইসলামের প্রভাব শক্তিশালী হতে থাকে। তাদের সাকাফি প্রতিবেশীরাও বিষয়গুলো জানতো। তাদের কেউ কেউ বিভিন্ন ঘটনার সাথে ঘনিষ্টভাবে জড়িতও ছিল।

মুসলিমগণ তাদের গতিবিধি গোপন রাখতে পারার কারণে কুরাইশদের সাহায্যে হাওয়াজিন ও সাফিকরা এগিয়ে আসেনি। মুসলমানগণ অগ্রসর হতে থাকলে হাওয়াজিনরা তাদের বাড়ীঘর নিয়ে ভীত হয়ে পড়ে। এসব কারণে হাওয়াজিনরা মক্কা রক্ষায় এগিয়ে আসেনি।

আল ওয়াকিদের মতে কুরাইশ ও হাওয়াজিনদেরকে মুসলিমগণ খোঁজাখুজি করছে কিনা তা দেখার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করে।

মুসলমানগণ মদীনা থেকে বের হয়েছে এ খবর জানতে পেরে তাদের মোকাবেলা করার জন্য হাওয়াজিনরা তাদের বাহিনী প্রস্তুত করতে থাকে।[১০] মুসলমানদের ব্যাপারে অনিশ্চিত ভাবনা থেকেই হাওয়াজিনদের এরূপ ধারণা আরো শক্তিশালী হয়।

মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশ নেতৃত্বের পতন ঘটে। হাওয়াজিনরা এসময় *শিরক* এর পতাকা বহন করে। তারা দ্রুত পরিস্থিতির মোকাবেলায় এগিয়ে আসে। মক্কা বিজয়ের পরও রাসূল (সা) যখন তাঁর বাহিনীর কর্মতৎপরতা বন্ধ করেনি তখন হাওয়াজিনরা পরিস্থিতির মোকাবেলা করার চিন্তা করতে থাকে। রাসূল (সা) উজ্জাকে[১১] নির্মূল করার জন্য খালিদ ইবনে ওয়ালিদের নেতৃত্বে নাখলায় ৩০ অশ্বারোহীর এক বাহিনী প্রেরণ করেন। উজ্জা আরবদের কাছে ছিল পবিত্র স্থান, এটি ছিল সাকিফের ভেতরের একটি জায়গা।[১২] রমাযান শেষ হওয়ার পাঁচ রাত পূর্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। রমাযানের ছয় রাত পূর্বে রাসূল (সা) ২০ অশ্বারোহী সহ মূসাল্লালের মানাত ধ্বংসে সা'দ ইবনে জায়েদ আল আশালীকে প্রেরণ করেন। মূসাল্লাল বর্তমানে কাদিজিয়া নামে পরিচিত। মানাত ছিল একটি মূর্তি। মানাতকে আরবের লোকরা বিশেষ করে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে *আনসাররা* পূজা করতো। সা'দ আল আশালি এটি ধ্বংস করে মক্কায় ফিরে আসেন।[১৩] আলী মানাত ধ্বংস করেন। এ কথাও চালু আছে। যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে রাসূল (সা) পথিমধ্যে তাকে মানাত ধ্বংসের জন্য পাঠান।[১৪] হাদীসের প্রেক্ষাপটে এ দু'টো বর্ণনা শক্তিশালী নয়। ইবনে সা'দ কোন সনদ ছাড়া এটি বর্ণনা করেন। তিনি এটি তাঁর শিক্ষক

আল ওয়াকিদি হতে বর্ণনা করেন। আল ওয়াকিদির সূত্র *যঈফ*, ইবন আল কালবিও *যঈফ*। আবু সুফিয়ান ইবনে হারব মানাত ধ্বংস করেন বলে জানা যায়।[১৫] তবে অন্য দু'টো সূত্রের চেয়ে এটি জোরালো নয়। তবে মানাত যে ধ্বংস হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। এ সত্য ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে প্রতিষ্ঠিত। প্রমাণের ক্ষেত্রে হাদীস ইতিহাসের মত নয়।

অষ্টম হিজরীর শওয়াল মাসে খালিদ ইবনে ওয়ালিদের নেতৃত্বে মক্কার ৮০ কি মি দক্ষিণে ইয়ালামলামের বানু যাজিমার বিরুদ্ধে রাসূল (সা) ৩৫০ জনের এক বাহিনী প্রেরণ করেন। বানু যাজিমাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানানো হয়। *আসলামনা* (আমরা ইসলাম কবুল করলাম) বলে তারা ঠিকমত নিজদেরকে প্রচার করতে পারছিল না। সে জন্য তারা বলছিল, "*সাবানা সাবানা*" (আমরা আমাদের ধর্ম পরিবর্তন করলাম)। খালিদ তাদের অনেককে হত্যা করলেন, বাকীদের বন্দী করলেন। কিছু সময় পর তিনি বললেন যে, বন্দীদেরকেও মেরে ফেলতে হবে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ সহ কোন কোন *সাহাবী* বন্দী হত্যা করা থেকে বিরত থাকলেন। তাঁরা রাসূল (সা) এর কাছে এসে সব বয়ান করলেন। রাসূল (সা) তাঁর দু'হাত তুলে বললেন এবং দু'বার বললেন, "হে আল্লাহ খালিদ যা করেছে তা থেকে আমি কোন পাপ করিনি।"[১৬]

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ বন্দীদের "*সাবানা*" শব্দটি বুঝতে পারেননি। তিনি মনে করেছিলেন তারা ইসলাম কবুল না করার কথাই বলছে বা তারা ইসলামের অপমান করছে। সে জন্য তিনি তাদেরকে মাফ করেননি।[১৭] আব্দুর রহমান ইবনে আউফ ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর বুঝতে পেরেছিলেন যে তারা তাদের জানা কথা দিয়েই তাদের ইসলাম কবুলের কথা বলছিল। ঐ সময়ে *শরীয়ার* সব কিছু আরবদের কাছে স্পষ্ট ছিল না। যেজন্য খালিদ ঝোঁকের মাথায় যা করেছিলেন তার দায়িত্ব রাসূল (সা) নেন নি। তিনি তাকে শাস্তি দেন নি বা তাকে তার নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেন নি। এর কারণ খালিদ ঐ মুহূর্তে ইজতিহাদ করে মারাত্মক ভুল করেছিলেন।

এ বর্ণনাকে কোন হিসাবে নেয়া যাবে না, কেননা এটি *মুনকাতি* পর্যায়ের বর্ণনা। এর মাধ্যমে জানা যায় রাসূল (সা) মৃত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন, তিনি বঞ্চিত পরিবার পরিজনকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য কিছু বেশী পরিমাণ ক্ষতিপূরণই দিয়েছিলেন। এর দ্বারা তিনি এটিই বুঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি এরূপ হত্যা সমর্থন করেন না।[১৮] বর্তমান হত্যাও তিনি সমর্থন করেন না। ইসলামে ভুলক্রমে কাউকে হত্যা করা হলে এরূপ বিধান আছে। আমরা এ *মুনকাতি* বর্ণনা গ্রহণ করলে এর পুরোটাই গ্রহণ করতে হবে। এ রিপোর্টে দেখা যায় খালিদ ইবনে ওয়ালিদ যখন বানু যাজিমার কাছে যান তখন তাদের সাথে অস্ত্র ছিল। তিনি তাদেরকে অস্ত্র ফেলে দিতে বলেন এবং তাদের সবাইকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলেন। তারা তাদের অস্ত্র ফেলে দিলে খালিদ তাদেরকে বেঁধে ফেলেন। তাদের অনেককে হত্যা করেন। ইবনে ইসহাকের এসব বর্ণনা থেকে জানা যায় খালিদ তার চাচার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে এ হত্যাকান্ড ঘটান। তার চাচা আল

ফকিহ ইবনে আল মুগিরাকে *জাহিলিয়্যার* সময়ে বানু যাজিমরা হত্যা করে। ইবনে কাসির ইবনে ইসহাকের এ রিপোর্টের ব্যাপারে বলেন, "এ বর্ণনাগুলো মুরসাল ও মুনকাতি বর্ণনা।" এগুলো প্রমাণ হিসাবে নেয়া যাবে না।[১৯]

নিজের নামটি স্পষ্ট করার জন্য খালিদ একান্তই ইজতিহাদের চিন্তা থেকে এ হত্যাকান্ড ঘটিয়েছেন এবং ভুলটি করেছেন। সেজন্য রাসূল (সা) তাকে কোন শাস্তি দেননি।

মক্কা বিজয়ের পর হাওয়াজিন ও সাকিফের এলাকায় দুটো অভিযান পরিচালিত হয়। বেশী দিন হাওয়াজিনদের কাছে এ অভিযানের কথা গোপন থাকেনি। মক্কা বিজয়ের মাত্র আধামাসের মধ্যেই হাওয়াজিনরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের বাহিনী সংগঠিত করতে থাকে।[২০] মুসলমানদের আক্রমণের আগেই হাওয়াজিনরা আক্রমণের পরিকল্পনা করে। একটা চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতির অংশ হিসাবে তারা তাদের সম্পদ, নারী-পুরুষ ও শিশুদের জড়ো করে যাতে কেউ পালিয়ে যেতে না পারে এবং তাদের সম্পদ ও পরিবার ছেড়ে চলে যেতে না পারে। তারা মালিক ইবনে আওফ আল নাসরি'র নেতৃত্বে তাদের বাহিনীর সমাবেশ ঘটায়। গাতাফান ও অন্যান্য[২১] গোত্রের লোকজন তাদের সাথে যোগ দেয়। তবে কাব ও হাওয়াজিনের কাব পেছনে ফিরে যায়।[২২]

মালিক ইবনে আউফ তার বাহিনীকে সুশৃংখল ভাবে দাঁড় করায়। প্রথমে অশ্বারোহী তার পরে পদাতিক তারপরে নারী, তারপর মেষ ও তারপর উট বাহিনীকে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করায়।[২৩] মালিক আল নাসরীর বয়স ৩০, সে তার সাহসিকতা ও বীরত্বের জন্য বিখ্যাত ছিল।[২৪] তবে যুদ্ধের বাহিনী গঠনের ব্যাপারে দুরাইদ ইবনে আল সিম্মাহ দ্বিমত পোষণ করেন। তার মতে মালিক আল নাসরি তার বাহিনীতে নারী, শিশু বা সহায়-সম্পদ জমায়েত করেনি। তার মতে এর কারণ তখন কেউ যদি দল ছেড়ে চলে যেতে চাইত এবং পালিয়ে যেতে চাইত, তা তারা করতে পারতো। মালিক আল নাসরির করার কিছুই ছিল না। তবে মালিক নাসরি তার এ মতামতে কোন কর্ণপাত করেনি।[২৫] একমাত্র আল ওয়াকিদিই হাওয়াজিনদের বাহিনী সম্পর্কে সঠিক বর্ণনা দিয়েছেন। তাদের বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল কুড়ি হাজার।[২৬] আল হাফিয ইবনে হাজার ওয়াকিদি এব্যাপারে একমত হন। তার মতে মুসলমানদের চেয়ে হাওয়াজিনদের সংখ্যা ছিল দ্বিগুণ।[২৭]

রাসূল (সা) আবদুল্লাহ ইবনে আবু হাযরাজ আল আসলামী কে হাওয়াজিনদের খবরা খবর সংগ্রহে পাঠালেন। হাওয়াজিনদের মাঝে তিনি একদিন বা দু'দিন অবস্থানের পর তথ্য নিয়ে মুসলমানদের কাছে ফিরে এলেন।[২৮] মুসলমানগণ এর পর তাদের মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

রাসূল (সা) মুশরিক সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যার[২৯] কাছ থেকে ১০০টি মেল কোট (Mail coat) ধার হিসাবে নেন। সাফওয়ান রাসূল (সা) কে এগুলো ধার হিসাবে না জোর করে নিচ্ছেন সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন। রাসূল (সা) এগুলো ধার হিসাবে নিচ্ছেন এবং হুনাইনের যুদ্ধের পর ফেরৎ দেবেন বলে জানান। এর জন্য রাসূল (সা)

সাফওয়ানকে ধন্যবাদ জানান।[৩০] ইবনে আবদ আল বার *সনদ* ছাড়াই কিছু কিছু বর্ণনা বর্ণনা করেন। এসব বর্ণনা থেকে জানা যায় রাসূল (সা) হুয়াইতিব ইবনে আবদুল উজ্জার কাছ থেকে ৪০,০০০ দিরহাম ধার নেন, নওফল ইবনে আল হালিম ইবনে আবদ আল মুত্তালিবের কাছ থেকে ৩,০০০টি বর্শা[৩১] নিয়ে ছিলেন। এটি নিঃসন্দেহ যে, রাসূল (সা) উভয়ের কাছ থেকেই সাহায্য নিয়েছিলেন। ইসলামের সুদৃঢ় অবস্থানে থাকার কারণে অন্যের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করলে যুদ্ধের ইসলামী চরিত্রের কোন ক্ষতি হবে না। সাহায্য গ্রহণের ব্যাপারে মুসলমানদের উপর কোন শর্তারোপ করা না হলে সাহায্য গ্রহণে কোন অসুবিধা নেই।

মুসলমানগণ মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি গ্রহণে বেশী সময় নেননি। মক্কা বিজয়ের পর তারা আল খান্দামায় দু'একটা খন্ডযুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছিল। তারা হাওয়াজিনদের মোকাবেলায় প্রস্তুত ছিল। ৫ শওয়াল মুসলিম বাহিনী হুনাইনের দিকে যাত্রা করেন। ১৯ রমাযানের বিজয় অভিযানের পর তারা মাত্র ১৫দিন মক্কায় অবস্থান করেন। তারা ১০ শওয়ালে হুনাইনে পৌছেন।[৩২] তারা যতই হুনাইনের কাছাকাছি পৌছছিলেন ততই তারা সাবধানে ও ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলেন। কারণ তখন তাদের কাছ থেকে হুনাইন ছিল মক্কার ২৬ কি মি পূর্বে। এ জায়গাটি এখন শারাহ[৩৩] নামে খ্যাত। মুসলিম বাহিনী মক্কা থেকে বের হওয়ার পর খুব দ্রুত অগ্রসর হতে থাকেন।[৩৪] রাসূল (সা) তার অনুপস্থিতিতে আত্তাব ইবনে উসাইদকে মক্কার *আমীর* নিয়োগ করেন।[৩৫] মুসলমানদের আগের সব অভিযানের চেয়ে এ অভিযানের সৈন্য সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। মক্কা বিজয়ে যে ১০, ০০০ জন[৩৬] সৈন্য অংশ গ্রহণ করেছিল তার মানে মক্কার আরও ২,০০০ লোক যোগ দেন। তাদেরকে *তুলাকা* (মুক্ত) বলা হতো। বিভিন্ন বর্ণনায় এর সত্যতা পাওয়া যায়। এ বর্ণনাগুলো *সহীহ* না হলেও হাদীসের প্রেক্ষাপটে তুলাকার যে সংখ্যার কথা বলা হয়েছে এবং তারা যে যুদ্ধে শরীক হয়েছিল তা ঐতিহাসিক ভাবে সত্য।[৩৭] এসব কারণে হুনাইনের যুদ্ধকে রাসূল (সা) এর জীবদ্দশায় সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে মারাত্মক যুদ্ধ হিসাবে অভিহিত করা হয়।

রাসূল (সা) তার বাহিনীর পাহারার ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন। *ঈশার* সালাতের সময় তারা যখন শত্রুবাহিনীর কাছাকাছি চলে এলেন তখন জনৈক সাহাবীকে ওয়াদি হুনাইনের বিপরীতের একটি পাহাড়ে শত্রুর গতিবিধি দেখার কাজে নিযুক্ত করেন। সাহাবী হাওয়াজিনদের ও তাদের অস্ত্র শস্ত্রের অবস্থান সম্পর্কে রাসূল (সা) কে অভিহত করলে রাসূল (সা) আল্লাহর উপর ভরসা করেন ও এ বলে আল্লাহর সাহায্য চান; "আল্লাহর ইচ্ছায় আগামীকাল তারা মুসলমানদের যুদ্ধ লব্ধ সম্পদে পরিণত হবে।" আনাস ইবনে আবু মারতাদ আল গানাবি ঘুমের সময় মুসলমান বাহিনীকে পাহারার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। *ফজর* পর্যন্ত পাহারা দেয়ার জন্য রাসূল (সা) তার উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। আনাস তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুভাবে সম্পন্ন করেন। রাসূল (সা) তাকে জান্নাতের ওয়াদা করেন।[৩৮]

মুসলমান বাহিনীর উপর *তুলাকার* নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এর কারণ তুলাকারা ছিল ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে নতুন। তাদের মন ও মগজে জাহিলিয়্যার প্রভাব গভীরভাবে প্রোথিত ছিল। তারা তখনও *জাহিলিয়্যার* প্রভাব হতে মুক্ত হতে পারেনি। হুনাইনের পথে যাত আনাত নামের একটি গাছ পাওয়া যায়। এ গাছে *মুশরিকরা* তাদের অস্ত্রশস্ত্র লটকায়ে রাখে। এ গাছটি দেখে তুলাকারা রাসূল (সা) কে বলল, "হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের জন্য আপনি কি একটা যাত আনাতের গাছ বানিয়ে দেবেন। মুশরিকদের এ গাছটির মত যেন হয়?" রাসূল (সা) আরো বললেন, "আলহামদুলিল্লাহ, তোমরা তো মূসার লোকদের মতই বলছ, তারাও মূসার কাছে এভাবেই বলেছিল। আমাদেরকে একটি দেবতা বানিয়ে দাও যদিও তাদের দেবতা ছিল। যার হাতে আমার জীবন তার শপথ, তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তোমরা তাদের নিয়ম কানুনই অনুসরণ করবে।"[৩৯]

তাদের কথাবার্তা আর অনুরোধের মাধ্যমে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাওহীদে তাদের স্পষ্ট ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে তারা ইসলাম কবুল করেছিল। রাসূল (সা) তাদেরকে তাদের কথার যে বহুঈশ্বেরবাদী বিষয় রয়েছে তা বুঝায়ে দেন আর এর বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার করে দেন।

রাসূল (সা) তাদের এসব আচার আচরণের জন্য তাদেরকে কোন শাস্তি দেননি বা তাদেরকে র্ভৎসনাও করেন নি। কেননা তারা ঈমান কবুল কারীদের মধ্যে নতুন ছিল।

মুসলমানদের আরেকটি নেতিবাচক দিক ছিল তারা তাদের সংখ্যার কথা মনে করে অহমিকার মধ্যে ছিল।[৪০] তাদের কেউ সংখ্যার বিবেচনায় জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে বলে, "সংখ্যার বিবেচনায় তারা কম হলেও তাদেরকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না।" অন্যদের মধ্যে আর কেউ কেউ এ ধারণা পোষণ করতে থাকে। কুরআনে তাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে আর আল্লাহর উপর ছাড়া অন্য কারো উপর নির্ভর করতে না করা হয়েছে। এর অন্যথা হলে আল্লাহ তাকে তার নিজের উপরই ছেড়ে দেবেন ঃ

> আল্লাহ তোমাদেরকে তো সাহায্য করেছেন বহু ক্ষেত্রে এবং হুনাইনের যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল তোমাদের সংখ্যাধিক্য কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল ও পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে (৯:২৫)

রাসূল (সা) বিষয়টি অভিহত ছিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে আরাধনার মাধ্যমে তাদেরকে দীক্ষা দিতে চেয়েছেন। তিনি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলেন আর আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। রাসূল (সা) বললেন, "হে আল্লাহ্ আমি তোমারই সাহায্য চাই। তোমার সাহায্য নিয়েই কর্ম সম্পাদন করি। আর তোমার সাহায্য নিয়েই আমি লড়াই করি।" তিনি এ নওমুসলিমদেরকে জনৈক নবীর কাহিনী শুনান যিনি তাঁর উম্মাহর সংখ্যার কারণে গর্ববোধ করতেন। আল্লাহ সে *উম্মাহকে* ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।[৪১] রাসূল (সা) সেজন্য সব সময় মুসলমানদের উপর নজর রাখতেন যাতে তারা চিন্তা ও

আচরণে বিপথে পতিত না হয়। সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধের দিনগুলোতেও রাসূল (সা) এটি বজায় রেখেছিলেন। সবচেয়ে শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় রাসূল (সা) এটি অনুসরণ করেছিলেন। কারণ জয় নিম্নবর্ণিত কারণগুলোর উপর নির্ভর করেছিল।"

> ...হে মুমিনগণ যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন। (৪৭:৭)

এত বড় বিশাল সংখ্যাকে কি বিষয়গুলো শেখানো যাবে তারা যে *জাহিলিয়ায়* বসবাস করেছিল? তাকি রাতারাতি দূর করা যাবে? তাদের সংখ্যার চিন্তাটাই যুদ্ধের শুরুতে তাদেরকে পালাতে অনুপ্রাণিত করেছিল। তবে তাদের ভাগ্য ও যুদ্ধে তাদের ভয়ংকর অবস্থা তাদের সম্বিত ফিরিয়ে দেয় আর তাদেরকে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল করে দেয়। তারা চূড়ান্তভাবে দ্বিতীয় দফার লড়াইয়ে জয়লাভ করে। তবে অবিশ্বাসীরা জয়ী হতে পারে নি।

মুসলমান বাহিনীতে *তুলাকা* ও কোন কোন বেদুঈন থাকার কারণে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। বেদুঈন আর *তুলাকার* অধিকাংশই যুদ্ধে গিয়েছিল যুদ্ধলব্ধ মালামাল দখলের জন্য আর যুদ্ধে কে পরাজিত হয় তা দেখার জন্য। তারা কোন নীতি বা কোন কারণে যুদ্ধ করছে এমন কোন ধারণা তাদের মধ্যে কাজ করেনি। তারা ছিল ইসলামে নতুন, তারা আল্লাহর পথে *জিহাদের* কোন পদ গ্রহণ করেনি। তাছাড়া তাদের কেউ কেউ তখনও অবিশ্বাসীই ছিল।[৪২] তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল ভাল মুসলমান, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা যুদ্ধে প্রাপ্ত মালামাল দখলের জন্যই যুদ্ধে গিয়েছিল। যুদ্ধের প্রথম দিকে তারা এরূপ করেছিল এবং অন্যদেরকেও এরূপ করতে প্ররোচিত করেছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ যুদ্ধের প্রথম দিকে আনন্দ প্রকাশ করে। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা আল জুহামী'র ভাই কিলদা ইবনে উমাইয়্যা বলেছিল, "আজকের দিনে জাদু ব্যর্থ হয়েছে।" যুদ্ধে যোগদানকারী সাফওয়ান ছিল *মুশরিক*। সে বলল, "আল্লাহ তোমার মুখ ধ্বংস করে দেবেন। আল্লাহর কসম, একজন হাওয়াজিনের চেয়ে আমি একজন কুরাইশের শাসনকে বেশী পছন্দ করি।"[৪৩]

মূসা ইবনে উকবার মতে, আবু সুফিয়ান, সাফওয়ান, হাকিম ইবনে হাজাম-এর কুরাইশ নেতারা যুদ্ধেক্ষেত্রে পেছনের সারিতে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা দেখছিল যুদ্ধে কে জয়লাভ করে। উরওয়াহ ইবনে আল যুবাইর বলেন, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া তার জনৈক গোলামকে যুদ্ধের খবরাখবর নিয়ে আসার জন্য পাঠায়। ইবনে ইসহাকের মতে আবু সুফিয়ান যখন যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালাচ্ছিল সে তখন বলছিল, "সাগরে পতিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের গতি বন্ধ হবে না।" তার সাথে আছে তূণীর ভিতরে স্বর্গীয় তীর।[৪৪] মূসা ইবনে উকবাহ, উরওয়াহ, ইবনে ইসহাকের বর্ণনাগুলো হাদীসের নিয়মে *সহীহ* নয়, এগুলো *মুরসাল*। তবে তিনজন পন্ডিত তাদের একজনের বর্ণনাকে আরেকজন সমর্থন করেছেন আর মক্কার নেতাদের ঐতিহাসিক চরিত্র তারা তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে সাফওয়ান ছিল *মুশরিক* আর আবু সুফিয়ান ছিলেন তখন নওমুসলিম

"যার অন্তর সম্প্রতি (সত্যে) পরিবর্তিত হয়েছে।" (৯:৬০)

যুদ্ধ

মুসলমানদের আগেই হাওয়াজিন ওয়াদি হুনাইনে পৌছল। তারা সেখানে পৌছেই তাদের অবস্থা ঠিক করে নিল। তারা গিরিসঙ্কটে, মোড়ে মোড়ে, গাছে গাছে তাদের ব্যাটালিয়ান ছড়ায়ে ছিটিয়ে দাঁড় করিয়ে নিল। তাদের পরিকল্পনা ছিল সুসংগঠিত। মুসলমানগণ যাতে বিস্মিত হয় এমনভাবে তারা তাদের অবস্থান নিল। মুসলমানগণ হুনাইনের খাড়া ওপত্যকায় উঠার সময়ে হাওয়াজিনরা তাদের লক্ষ্য করে তীর মারছিল।[৪৫] হাওয়াজিনদের মনোবল ছিল উঁচু। কারণ তাদের নেতা মালিক আল নাসির তাদের কাছে মুসলমানদের ব্যাপারে বলেছিল যে, মুসলিমরা এর পূর্বে তাদের মত এত বিরাট বাহিনীর সাথে আর কখনো যুদ্ধ করেনি। তাদের মত মুসলমানদের এত বেশী যুদ্ধ বিষয়ক দক্ষতা ছিল না। মুসলমানদের এত সাহস নেই। আর তারা সংখ্যার দিক দিয়েও মুসলমানদের চেয়ে অনেক বেশী।[৪৬] মুসলমানগণ ভোর হওয়ার আগেই উপত্যকার পথ ধরে অগ্রসর হতে থাকে। খালিদ ইবনে ওয়ালিদের নেতৃত্বে প্রথমে অশ্বারোহী বাহিনী যাত্রা করে। বানু সালিম বাহিনী সামনে ছিল। তাদের পেছনে পেছনে সারিবদ্ধভাবে অন্যরা অনুসরণ করল।[৪৭]

যুদ্ধের শুরুতেই হাওয়াজিনদের সবচেয়ে আগের বাহিনীটিই মুসলমানদের অগ্রসর হওয়ার আগেই পেছনে পড়ে গেল। হাওয়াজিনরা পেছনে পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে কিছু মালপত্রও তারা পেছনে ফেলে গেল। মুসলমান সৈনিকরা সেগুলো সংগ্রহ করে নিল।[৪৮] মনে হচ্চিল হাওয়াজিনরা পুরোপুরি পর্যদুস্ত হয়ে গিয়েছে। তবে এ সময়ে হাওয়াজিনরা চারদিক থেকে প্রবলভাবে তীর নিক্ষেপ করে তাদেরকে বিস্মিত করে দিল। ওয়াদির চারদিক থেকে তাদের উপর তীর বর্ষণ করা হচ্ছিল। কোন কোন মুসলমান এ সময়ে যুদ্ধের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত না হয়েই ছুটে আসলেন। তাদের কারো কারো মাথায় কিছুই ছিল না। কারো সাথে কোন অস্ত্রই ছিলনা।[৪৯] তারা বিষয়টিকে তেমন গুরুত্বই দেয়নি। এরূপ হঠাৎ আক্রমণে তারা হতবিহ্বল হয়ে পড়লো। হাওয়াজিনরা এত সই করে তীর মারছিল যে, মুসলিমরা বিস্মিত হলো। "একটি তীরে একজন করে মানুষ বিদ্ধ হচ্ছিল। তীর নিক্ষেপে তাদের কোন ভুল ছিল না।"[৫০] প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবী আল বারা ইবনে আযীবের বর্ণনা থেকে এটি জানা যায়। মুসলমানদের অশ্বারোহী বাহিনী ও তাদের পদাতিক বাহিনী তাদের সরাসরি আক্রমণের মুখে পড়লো। *তুলাকা* ও বেদুঈনরা অন্য বাহিনীর লোকজনের সাথে পালিয়ে গেল। মাত্র ছোট একটি বাহিনীকে নিয়ে রাসূল (সা) দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করে যাচ্ছিলেন।

প্রথম দিকে শুরুকৃত যুদ্ধ *ফজর থেকে ঈশা* পর্যন্ত স্থায়ী হলো। এ যুদ্ধ রাত পর্যন্ত চললো। সব মুসলমান যুদ্ধ ক্ষেত্রে আক্রমণের বস্তু হলো। তারা যুদ্ধ থেকে পালিয়ে গেল। দিনের বেলায় তাপ ছিল ভয়াবহ। যুদ্ধ শুরুর আগে মুসলমানগণ দিনের বেলায় গাছের ছায়ায় অবস্থান নিলেন। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হলে তাদেরকে সরাসরি উত্তপ্ত রোদের মধ্যে থেকে যুদ্ধ করতে হলো। যমীন ছিল ধুলোতে পূর্ণ, ধুলাবালিতে তাদের মুখমন্ডল ভরে গেল। এমন ধূলাবালি যে যোদ্ধারা সামনের জিনিস দেখতে পাচ্ছিল না। এসময়

তাদের কেউ বলছিলেন, "আমাদের মুখমন্ডলের সামনে আমাদের হাতই দেখা যাচ্ছিল না।"[৫১] হাওয়াজিনরা ঠিকই তাদের বাহিনীকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে যাচ্ছিল। তাদের বাহিনী গিরি সঙ্কটের ভেতরে উপত্যকার মোড়ে মোড়ে থেকে মুসলমানদের ভালই জবাব দিয়ে যাচ্ছিল।

রাসূল (সা) ঘোড়ায় না চড়ে তার দুলদুল খচ্চরে চড়ে চললেন।[৫২] এ ঘটনা দ্বারা রাসূল (সা) মুসলমানদের মনে সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। এর কারণ খচ্চরকে ঘোড়ার মত আক্রমণ করা যায় না আর খচ্চর ঘোড়ার মত পালিয়েও যেতে পারে না।

রাসূল (সা) পলায়নপর মুসলমানদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন আর তাদেরকে দ্রুত দাঁড়াতে বললেন আর তাঁর খচ্চরটিকে সামনের দিকে অগ্রসর হতে দাবড়াচ্ছিলেন আর বলছিলেন, "আমি নিঃসন্দেহে রাসূল, আমি আব্দুল মোত্তালিবের পুত্র।" তার চাচা আব্বাস ও আবু সুফিয়ান ইবনে আল হারিস খচ্চরের জীন ধরে তাকে যেন শত্রুদের মাঝে বহন করে না নেয়া হয়, সে চেষ্টা করছিল।[৫৩] মাত্র অল্প কয়েকজন মুসলমান কিছুটা পিছনে হটে এলো।[৫৪] বেশীর ভাগই যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল। মাত্র দশ কি বারো জন মুসলমান রাসূল (সা) এর সাথে দৃঢ় অবস্থানে রয়ে গেলেন, তারা রাসূল (সা) কে ঘেরাও করে রইলেন। তারা হলেন আল আব্বাস, আবু সুফিয়ান ইবনে আল হারিস, আবু বকর, উমর ও আলী।[৫৫] রাসূল (সা) তাঁর চাচা আল আব্বাসকে লোকজনকে জোরে ডেকে আনতে বললেন। লোকজনকে ফিরায়ে আনতে বললেন। এরপর রাসূল (সা) বৃক্ষের *(আশাব আল সাজারা)* তলায় শপথকারী *আনসারদেরকে* ডাকলেন। এরপর ডাকলেন বানু আল হারিস ইবনে খাজরাযকে। তারা ৮০ থেকে ১০০ জনের দল নিয়ে ফিরে এলেন আর হাওয়াজিনদের সাথে লড়াই করলেন।[৫৬]

নব উদ্যমে তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। বিপুল উৎসাহ, নিষ্ঠা, ঈমান, প্রতিজ্ঞা, দৃঢ়তা নিয়ে আল্লাহর উপর ঈমান এনে তারা লড়াই শুরু করলেন। রাসূল (সা) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন, আল্লাহর কাছে জয় চাইলেন আর বললেন। "তুমি চাইলে আমাদেরকে ধ্বংসও করে দিতে পার। আজকের পর আমরা তোমার আর কোন ইবাদত করবো না।"[৫৭]

শত্রু যখন তার উপর পতিত হলো তিনি খচ্চর থেকে নেমে পায়ে হেঁটে রওয়ানা দিলেন।[৫৮] যুদ্ধের তীব্রতা বেড়ে গেলে তাঁর সাথীগণ তাঁর সাহস ও ধৈর্যের মাধ্যমে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।[৫৯] পলায়নপর মুসলমানগণ এটা দেখল এবং আল আব্বাসকে তাদের ডাকতে শুনলেন, তারা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে তার সাথে যোগ দিলেন, আর "*লাব্বায়েক লাব্বায়েক* (আমি এখানে)" বলে আওয়াজ করলেন। যারা তাদের উটগুলোকে ফিরায়ে আনতে পারেনি, তারা ফিরে গিয়ে তাদের অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে আসে আর উটগুলোকে তাদের পেছনে ফেলে রেখে আসে।[৬০] যুদ্ধ তীব্র বেগে শুরু হলো। রাসূল (সা) বললেন, এসময়ে যুদ্ধের তীব্রতা বেড়ে গেল।[৬১] কিছু ধুলা নিয়ে

মুশরিকদের মুখের উপর মারলেন আর বললেন, "মুখগুলো বিকৃত হয়ে যাক"। মুহাম্মাদের প্রভুর কারণে শত্রুদের পরাজয় হলো।[৬২]

> অত:পর আল্লাহ তাঁর নিকট হতে তাঁর রাসূল ও মুমিনদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যা তোমরা দেখতে পাও নি এবং তিনি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। ইহাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের কর্মফল (৯:২৬)[৬৩]

যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে হাওয়াজিন ও সাকিফ দীর্ঘক্ষণ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। তারা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল। মুসলমানগণ তাদেরকে হুনায়েন থেকে অনেক দূরে দাবড়ায়ে নিলেন। তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে অনেক মৃতদেহ ও সহায় সম্বল রেখে পালিয়ে যায়।

তারা আর নিজেদেরকে পুনর্গঠিত করতে পারেনি। সেজন্যে তারা তাদের বাহিনীর অনেকগুলো ব্যান্ড ফেলে রেখে যায়। মুসলমানগণ তীরসহ সেগুলো উদ্ধার করে।[৬৪] যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির চেয়ে তাদের সৈন্যদের ক্ষয়-ক্ষতি ছিল বিশাল। রাসূল (সা) মুসলমানদেরকে তাদের পিছু ধাওয়া করতে নির্দেশ দেন আর তাদেরকে দুর্বল করার লক্ষ্যে হত্যা করতে বলেন যাতে তারা আর সংগঠিত হতে না পারে ও মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে না পারে।[৬৫] যারাই একজন মুশরিক হত্যা করতে পেরেছে তাকেই তার পাওনা নিয়ে নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।[৬৬] রাসূল (সা) জনৈক মহিলাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়ে সাথীদেরকে মহিলাদের হত্যা করতে নিষেধ করেন। রাসূল (সা) বলেন, "এটি তোমাদের সাথে লড়াই করতে পারবে না," শিশুদেরকে মারার কথা শুনার পর রাসূল (সা) শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেন।[৬৭] যখন তারা বললেন যে, "এগুলো *মুশরিকদের* ছেলে মেয়ে নয়?" তিনি বললেন, "*মুশরিকদের* সন্তানরাও কি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়?" যার হাতে মুহাম্মদের জীবন তার শপথ, প্রত্যেক ব্যক্তিই নির্দোষ ও নিষ্পাপ অবস্থায়, *ফিতরাত* অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে যে পর্যন্ত সে কথা বলতে শেখে।[৬৮]

যারা পালিয়ে গিয়েছিল রাসূল (সা) তাদের কাউকে ভর্ৎসনা করেননি। উম্মে সুলাইমান আল আনসারিয়্যা বললেন যে, "তিনি *তুলাকাদের* হত্যা করেছিলেন কারণ তারা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেন, "আল্লাহ আমাকে রক্ষা করতে পারেন।" উম্মে সুলাইমান যুদ্ধের সময় তার নিজের জীবন রক্ষার্থে একটি ছুরি বহন করেছিলেন।[৬৯]

ইবনে ইসহাকের এক বর্ণনা অনুসারে সাকিফের বানু মালিকের এক গোত্র থেকেই হাওয়াজিনদের ৭২ জন নিহত হয়।[৭০] সাকিফের *আহলাফের* মাত্র দু'সদস্য নিহত হয়। এর কারণ তারা যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগে তাড়াহুড়ো করেছিল।[৭১] শত্রুবাহিনী ছত্রভংগ হয়ে যাওয়ার সময় আল যুবায়ের ইবনে আল আওয়ামের নেতৃত্বে মুসলিমরা আওতাসে বানু মালিকের ৩০০ জনকে হত্যা করেন।[৭২] আওতাসে আরো অনেকেই ধবংস হয়ে যায়।[৭৩] আবু তালহা একাই তাদের ২০ জনকে হত্যা করেন এবং সম্পদ দখল

করেন।[৭৪] বানু নসর ইবনে মুয়াবিয়া'র অনেকে নিহত হয়। হাওয়াজিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা বানু রিয়াবও বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হয়।[৭৫]

হাওয়াজিন ও সাকিফের ক্ষয়-ক্ষতি ছিল ব্যাপক। তাদের অনেকেই আহত হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পড়ে থাকে। সা'দ ইবনে আল মূসাইয়াবের[৭৬] বর্ণনা অনুযায়ী দেখা যায় ৬,০০০ বন্দীর মধ্যে নারী শিশু ছিল।[৭৭] ইবনে ইসহাকও একই মত পোষণ করেন।[৭৮] আল যুহরী এ বিশাল সংখ্যক বন্দীর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, "মক্কার নিকুঞ্জ বন্দীদের দিয়ে ভরে গেয়েছিল।[৭৯] এযুদ্ধে ৪০০ উকিয়া রৌপ্য পাওয়া গেল।[৮০] এছাড়া ছিল ২৪,০০০ উট,[৮১] ৪০,০০০ এর চেয়েও বেশী মেষ।[৮২] এত কিছুর পরও ছিল ঘোড়া, গরু, ছাগল, গাধা। তবে মুসলমানগণ এত কিছু থেকে কি পরিমাণ গণিমত হিসাবে গ্রহণ করেন তার বিষয় জানা যায় না। রাসূল (সা) নির্দেশ দিলেন যে, তায়েফ থেকে তার ফিরে না আসা পর্যন্ত এ গণিমতগুলোকে আল যারানায় সংরক্ষিত রাখতে হবে।

মুসলমানগণ হুনাইনের যুদ্ধে যে কুরবানী স্বীকার করেছিলেন তার মধ্যে প্রতি চারজনে একজন শহীদ হন। ইবনে ইসহাকের[৮৩] মতে তাদের অনেকেই এ যুদ্ধে আহত হন। আহতদের মধ্যে আবুবকর, উমর, উসমান, আলী, আবদুর রহমান ইবনে আবু আওফা এবং খালিদ ইবনে আল ওয়ালিদও ছিলেন।[৮৪]

প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধে মুসলমানগণের জীবনহানি হয়েছিল তার কারণ তারা তীরের আঘাতে জীবন হারিয়েছিলেন। এ সময়ে তারা অনেকেই যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ের আক্রমণ ছিল আরও ভয়াবহ। এ সময়ে হাওয়াজিন ও সাকিফরা বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়। মুসলমানগণ অনেকেই এ পর্যায়ে আহত হন। তবে তারা তাদের আহত অবস্থা কাটিয়ে উঠেন।

মুসলিম বাহিনীর লোকজনের ক্ষতি কম হওয়ার কারণ তারা পরাজিত বাহিনীকে হুনাইন থেকেও আরো দূরে বিতাড়িত করে দেয়। এর পরপরই তারা তায়েফ অবরোধ করেন। হুনাইনের যুদ্ধের পর মুশরিকদেরকে বিশ্রামের কোন সুযোগ না দিয়ে দ্রুত গতিতে তায়েফ অভিযান পরিচালনা করা হয়। হুনাইনের যুদ্ধ ছিল বদর যুদ্ধের ন্যায় একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী যুদ্ধের ন্যায় ভয়াবহ যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ তাদের জানমাল সবই ঢেলে দিয়েছিলেন, যেমন মুশরিকরা (হাওয়াজিনরা) এ যুদ্ধে তাদের সর্বোচ্চ ক্ষতি স্বীকার করেছিল। আরব আর বেদুঈনরা শুধু অপেক্ষা করছিল যুদ্ধে কি ঘটে তা দেখার জন্য, এরপরই তারা ইসলামের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। হাওয়াজিনরা পরাজিত হলে আরব আর বেদুঈনরা তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করে।

নাখলা ও আওতার দিকে পলায়নপর শত্রু বাহিনীর খেয়াল

হাওয়াজিনরা ছত্রভংগ হয়ে পাহাড়, পর্বত ও উপত্যকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। মালিক ইবনে আওফ আল নাসরি তায়েফে পরিখার ভিতরে ঢুকে পড়ল, অন্যরা তায়েফ ও হুনাইনের মধ্যকার উপত্যকায় তাবুতে ঢুকে পড়ল। সাকিফের বানু গিরা নাখলায়

তাবুতে ঢুকে থাকল। নাখলা হলো সিবাওয়া ও আল সারাই (হুনাইন) এর মাঝের একটি জায়গা।[৮৫]

মুসলমান বাহিনী নাখলার মধ্যদিয়ে হাওয়াজিন বাহিনীকে ধাওয়া করেন। রাসূল (সা) আবু আমির আল আশারিকে আওতায় পাঠান। এখানে আবু আমির তাদের সাথে লড়াই করে যুরাইজ ইবনে আল সিম্মাকে হত্যা করেন।[৮৬] এখানে তিনি তীরের আঘাতে আহত হন। আবু আমির শহীদ হন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি আবু মূসা আল আশারিকে তাঁর উত্তরসূরি মনোনীত করে যান আর তাঁর *সালাম* রাসূল (সা) কে পৌঁছায়ে দেয়ার অনুরোধ রেখে যান এবং রাসূল (সা) তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। রাসূল (সা) তাঁকে দোয়া করেন। আবু মূসার কাছ থেকে জানার পর রাসূল (সা) তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।[৮৭]

অন্যান্যদের সাথে রাসূল (সা) এর বৈমাত্রেয় বোন আল সায়মাকেও বন্দী করা হয়। ইবনে ইসহাকের *মুরসাল* বর্ণনা এবং অন্যান্যদের রিপোর্টে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এসব রিপোর্টের ঐতিহাসিক সত্যতাও রয়েছে। রাসূল (সা) তার সাথে বিনয় সাথে ব্যবহার করলেন যখন তিনি বুঝতে পারলেন ছোট অবস্থায় কোন এক সময় তার বোন যা বলেছিলেন তা সত্য হয়েছে। তারা যখন ছোট ছিলেন তখন তার বোনকে একটি কামড়ের ঘটনায় তাদের মা বানু সা'দে যে স্নেহ দিয়েছিলেন তার কথা রাসূল (সা) মনে করলেন।[৮৮] কোন কোন বর্ণনা যথেষ্ট জোরালো না হলেও একটি বর্ণনা যখন আরেকটি রিপোর্টের অনুসঙ্গী হয়, একটি আরেকটি কে সমর্থন করে তখন ঐতিহাসিক মূল্য হিসাবে সেগুলোকে গ্রহণ করতে হয়। তাঁর ধাত্রী মা হালিমা আল সাদিয়াও রাসূল (সা) এর কাছে এসেছিলেন। রাসূল (সা) তাঁর সাথে বিনয়ের সাথে ব্যবহার করেন এবং তাঁর চাদর ভাঁজ করে তাঁকে বসতে দেন।[৮৯]

পাদটিকা ঃ

১. ইয়াকুত, *মু'জাম আল বুলদান*, ২/১৩৭, ৩/২০৪, ৪/২১৬-৭, ৫/৫৫, ২১৬-২৬২; আল হারবি, *কিতাব আল মানসিক*, পৃ. ৫৩২-৪; আল বালাদি, *নাসাব হারব*, পৃ.৩৪৯-৫০।

২. প্রাগুক্ত।

৩. উতবা ও শাইবা'র বাগান, রাবিয়ার দু'কুরাইশ পুত্র সীরাহ্য় সুপরিচিত, আমর ইবনে আল আস দু'আল হারাম এর বাগান আল ওয়াহাত হলো আবু সুফিয়ানের সম্পদ। ইয়াকুত, *মু'যাম আল বুলদান*, ৫/৩৮৬; আল ওয়াকিদি, আল *মাগাযি*, ৩/৯৭১; *সীরাত আল হিশাম*, ১/৭০; আল আজরাকী, *আখবার মক্কা*, পৃ. ৮০; আল বালাদুরি, ফুতুহ, পৃ. ৫৬।

৪. ইবনে হিশাম, *আলসীরাহ*, ১/১, ৯৩; ইবনে সা'দ, *আল তাবাকাত*, ১/৫৫; ইবনে কুতাইবা, আল মারিফ, পৃ. ৩১, ৫১; আল তাবারি তারিখ, ২/২৬২; আল নয়ায়রি, *নিহায়াত আল ইরব ফি মা'রিফাত আনসাব আল আরব* পৃ.৩৯৭।

৫. *সহীহ* ও গোষ্ঠিতত্ত্বের জানার বই, মায়ূনা বিনতে আল হারিস, লুবাবা আল সুগরা বিনতে আল হারিস, সাফিয়া বিনতে হাজান, উম্মে জামিল বিনতে মুযালিদ আল হিলালিয়্যাহ, জয়নব বিনতে আবু সুফিয়ান এবং উম্মে আল হাকাম বিনতে আবু সুফিয়ান।

৬. *সহীহ আল বুখারী*, ৩/১৭০।

৭. *সহীহ আল বুখারী*, ৪/৯১, ৯/৯৫; *মুসলিম*, *সহীহ*, ৩/১৪২০।

৮. ইবনে হাজার, আল ইসাবাহ, ১/২৫।

৯. *সহীহ আল বুখারী*, ৩/১৭০।

১০. *আল তাবারি*, ৩/৭০।

১১. ইবনে হিশাম, আল সীরাহ, ২/৪৩৬; ইবনে সা'দ, *আল তাবাকাত*, ২/১৪৫; আল তাকরি, *তারিখ*, ৩/৬৫; আল মাজি। *তুহফাত আল আশরাফ*, ৪/২৩৫, হাদীস নং ৫০৫৪, আল নাসছি হতে বর্ণিত, আল সুনান আল কুবরা, এর মধ্যে আল ওয়ালিদ ইবনে যামিসহ, তিনি *সাদুক*, তবে এতে বিভ্রান্তি রয়েছে। আল উজ্জা ধ্বংসের ব্যাপারে কোন সহীহ বর্ণনা প্রমাণিত নয়।

১২. আল বালাদি, *নাসব হারব*, পৃ. ৩৮৮।

১৩. ইবনে সা'দ *আল তাবাকাত*, ২/১৪৬-৭; আল ওয়াকিদি, *আল মাগাযি*, ২/৮৬৯-৭০।

১৪. ইবনে আল কানবি, *আল আসনাস*, পৃ.১৫।

১৫. ইবনে হিশাম। *আল সীরাহ*। ১/৮৬; ইবনে হাযার, *আল ইসাবাহ* ২/১৭, ইবনে হিশাম কর্তৃক বর্ণিত।

১৬. *সহীহ আল বুখারী*, ৫/১৩১; ইবনে কাসির; *আল তাফসীর*, ৪/৩০৪। ইবনে আওফ ও খালিদের মধ্যে পারস্পরিক ঘটিত অপমানের বিষয়, দেখুন, *মুসলিম*, *সহীহ*, ৮/১৯৬৭।

১৭. ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারি*, ৮/৫৭। কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণের পরে যে কাউকে বলতো (*আসলামনা*) সে তার ধর্ম পরিবর্তন করেছে (সাবা')। শব্দটি অপমানের সুরে বলা হতো। খালিদের এটাই ছিল ওযর, তিনি শুধু শব্দের আবরণটিই জানতেন এবং এটি এভাবেই ব্যবহৃত হয়। এ শব্দের ছায়া বা আবরণগত অর্থ সম্পর্কে এবং মুসলমানদের উপর এর প্রভাব সম্পর্কে বানু যাজিমা অভিহত ছিলেন না।

১৮. ইবনে আলী, *আল ইসাবাহ*, ২/৪৩০। এটি আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী আল বাকির এর মুরসাল হতে, এটি মুনকাতি, এর কারণ ৪০ ও ৫৬ হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে আল বাকির জন্ম গ্রহণ করেন, এটি ইবনে হাজারের মতানুসারে বর্ণিত, *তাহজিব আল তাহজিব*, ৯/৩৫১।

১৯. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ২/৪৩১; আল তাবারি, *তারিখ*, ৩/৬৬; ইবনে কাসির। *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৪/৩১৩-৪।

২০. আল তাবারি, *তারিখ আল রুসুল ওয়া আল মুলুক* ৩/৭০

২১. *সহীহ আল বুখারী*, ৫/১৮০-১; *মুসলিম*, *সহীহ*, ২/৭৩৫,

২২. *সীরাত ইবনে হিশাম*, ২/৪৩৭।

২৩. *মুসলিম*, *সহীহ*, ২/৭৩৬; আহসাদ, *আল মুসনাদ*, ৩/১৫৭।

২৪. ইবনে হাজার, *আল ইসাবাহ*, ৩/১৮২, ৩৫২।

২৫. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ২/৪৩৭।

২৬. আল ওয়াকিদি, *আল মাগাযি*, ৩/৮৯৩।

২৭. ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারি*, ৪/২৯।

২৮. আল হাকিম, *আম মুসতাদরাক*, ৩/৪৮-৯। তিনি বলেন *সনদটি সহীহ*। আল যাহাবি তার সাথে একমত। হাদীসটির শাহিদ রয়েছে, সব সনদ বিবেচনায় নেয়ার কারণে শায়খ আল আলবানির সূত্র *সহীহ* (ইরওয়া আল গালিল, ৫/৩৪৪-৬)।

২৯. প্রাগুক্ত।

৩০. ইবনে মাযাহ, আল সুনান, ২/৮০৯, আল নাসাঈ, *আল মুজতাবা*, ৭/২৭৬। ইবরাহিম ইবনে আবদ আল্লাহ ইবনে আবু রাবিয়াহ'র মতে এটি *মুনকাতি*। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এটি বর্ণিত। একটি প্রতিশ্রুতি পুরণার্থে ধারে গৃহীত জিনিস ফেরৎ দেয়ার বিষয়ে ইসলামী *আহকাম*-এর সাথে একমত।

৩১. ইবনে আব্দ আল বারর, *আল ইসতিয়াব ফি মা'রিফাত আল আসাব*, ১/৩৮৫; ৩/৫৩৭।

৩২. ইবনে হিশাম, *আল সীরাহ*, ২/৪৩৭; আল বায়হাকি, *আল সুনান আল কুবরা*, ৩/১৫১; ইবনে আল তারকমানি, *আল যওহার আল নাকিবি হাশিয়াত মুনান আল বায়হাকি*। আল নামাঈ, আল সুনান, ৩/১০০; ইবনে হাজার , *ফাতহুর বারি*, ২/৫৬২; ৮/২৭।

৩৩. হামাদ আল আসির, তালিকাত, পৃ/ ৪৭১, আল হারবি কর্তৃক *কিতাব আল মানাসিক* এর উপর, *কালব আল যাজিরাত আল আরব*, পৃ. ২৬৮।

৩৪. আবু দাউদ, *আল সুনান*, ১/২১০; ২/৯; আল হাকিম, আল মুসতাদরাক, ১/২৩৭; ২/৮৩-৪। তিনি এটিকে *সহীহ* বলেছেন এবং আল যাহাবি তাঁর সাথে একমত।

৩৫. ইবনে হিশাম, *আল সীরাহ*, ২/৪৪০; খলিফা, *তারিখ*, পৃ. ৮৮; আল তাবারি, *তারিখ*, ৩/৭৩; আল হাকিম, *আল মুসতাদরাক*, ৩/২৭০। হাদীসের প্রেক্ষাপটে এ বর্ণনাগুলো দুর্বল হলেও এগুলোকে ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যায়। তারা *আমির* নিযুক্তির ব্যাপারে ইসলামি নিয়মের সাথে একমত পোষণ করেন।

৩৬. *সহীহ আল বুখারী*, ৫/২০; খলিফা ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ২/৩৯৯-৪০০।

৩৭. ইবনে হিশাম, *আল সীরাহ*, ২/৪৪০; খলিফা খাইয়াত, *তারিখ*, পৃ. ৮৮; ইবনে সা'দ, *তাবাকাত*, ২/১৫৪-৫; আল তাবারি, তারিখ, ৩/৭৩; আল হাসিম, আল *মুসতাদরাক*, ২/১২১। আল হাকিম এটি সহীহ বলেছেন, এবং আল যাহাবী তার সাথে একমত হন। তবে আল হায়মানি এর মধ্যে কিছু ত্রুটির কথা বলেছেন (ইল-াহ); আবদ আল্লাহ ইবনে আয়্যাদ যাকে কেউ *সিকাহ* হিসাবে পাননি। *মাযমা আল জাওয়ায়েদ*, ৬/১৮৬।

৩৮. আবু দাউদ, *আল সুনান*, ১/২১০, ২/৯, সনদ অনুযায়ী এ *হাদীস সহীহ*।

৩৯. আল তিরমিযী, *সুনান*, ৩/৩২১২-২। তিনি বলেন, "এটি *হাসান সহীহ*," নাসাঈ, *আল সুনান আল কুবরা*, *তুহফাত আল আশরাফের* মধ্যে, ১১/১১২, হাদীস নং ১৫৫১৬। আহমাদ, আল মুসনাদ, ৫/২১৭।

৪০. কিছু কিছু বর্ণনা সংজ্ঞা বর্ণনায় দুর্বল। (আল ওয়াকিদি, *আল মাগাযি*, ৩/৮৯০; আল হায়সামি, *কাশফ আল আসতার আল জাওয়ায়েদ আল বাজ্জার*, ২/৩৪৬-৭; ইবনে হিশাম, ২/৪৪৪)।

৪১. আল দারিমি, *সুনান*, ৫/১৩৫; আহমাদ, *আল মুসনাদ*, ৪/৩৩৩, ৬/১৬।

৪২. মক্কার ৮০ জন লোক বাইরে যান, তারা তখনও ছিল *কাফির*। (আল কাসতালানি, *আল মাওয়া হিব আল লাদুনিয়্যা*, ১/১৬২; আল যারকানি, শারহ *আল মাওয়াহিব*, ৩/৫)।

৪৩. আল হায়সামি, *মাজমা আল জাওয়ায়িদ*, ৬/১৭৯-১৮০। তিনি বলেন, আহমাদ ও আবু ইয়ালা এটি বর্ণনা করেন। আহমাদের লোকজন ছিলেন *সহীহ*, ইবনে ইসহাক স্পষ্টই আবু ইয়ালার রিপোর্টে সামা'র বর্ণনা করেন।

৪৪. ইবনে হিশাম, *আল সীরাহ,* ২/৪৪৩-৪; আল বায়হাকি, দালায়েল আল নবুয়্যা, ২/৪৫। এর সনদে রয়েছে আবু আলাথা মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে খালিদ, তিনিও মাযুম। ইবনে কাসির, *আল বিদ্যায়্যা ওয়া আল নিহায়া,* ৪/২৩০।

৪৫. ইবনে হিশাম, আল সীরাহ, ২/৪৪২। সাহাবী জাবির ইবনে আবদ আল্লাহ আল আনসারি'র *হাদীস* সহীহ সনদ সহকারে যার মধ্যে ইবনে ইসহাক স্পষ্টই সাম্মা'র বর্ণনা করেছেন। আহমাদও এটিকে *আল মুসনাদ* ৩/৩৭৬ এ বর্ণনা করেছেন। আবু ইয়ালা *আল মুসনাদ,* ২/২০০, নং ৩০২; ইবনে হিব্বান, *মাওয়ারিদ আল যামান* ২.৪১৭।

৪৬. ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া,* ৪/৩৩০; আল ওয়াকিদি, *আল মাগাযি,* ৩/৮৯৩।

৪৭. আল ওয়াকিদি। *আল মাগাযি,* ৩/৮৯৫-৭। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি বিস্তারিতভাবে আরব গোত্র ও তাদের জীবন সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। আনাস ইবনে মালিকের হাদীসে খালিদ ইবনে ওয়ালিদের অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। আনাস এ যুদ্ধ স্বচক্ষে দেখেছেন। (সহীহ *আল বুখারী,* ৫/১৩০-১; *মুসলিম, সহীহ,* ২/৭৩৫)।

৪৮. *সহীহ আল বুখারী,* ৪/২৫; মুসলিম, ৩/২৬১।

৪৯. *সহীহ আল বুখারী,* ৪/৩৫; *মুসলিম, সহীহ,* ৩/২৬০-২৬১, আল বারা ইবনে আযিবের *হাদীস* হতে বর্ণিত যিনি যুদ্ধটি দেখেছেন।

৫০. *সহীহ আল বুখারী,* ৪/৩৫; *মুসলিম, সহীহ,* ৩/২৬০-২৬১।

৫১. আহমাদ *আল মুসনাদ* ৫/২৮৬; আবু দাউদ, ২/৬৭৯; আল বায্যার, *মুসনাদ* (*কাসফ আল আসতার,* ২/৩৫০); ইবনে সা'দ *আল তাবাকত,* ২/১৫৬, যার উদ্ধৃতি আবু হাম্মাম আবদ আল্লাহ ইবনে ইয়াসসার-এর উপর ভিত্তি করে বর্ণিত, তিনি *মাজহুল;* ইবনে হিব্বান ছাড়া তাকে কেউ সিকাহ বলেননি। তবে আবু দাউদ উদ্ধৃতিটিকে *নাবিল* হাদীস বলে বর্ণনা করেন। আল হায়সামি এর সনদকে সিকাহ ধারণা করেছেন। *মাজমা আল জাওয়াইদ,* ৬/১৮২; ইবনে হাযার *মুখতাছার জাওয়াইদ মুসনাদ আল বায্যার,*পৃ. ২৫১, নং ৮১৬।

৫২. আরো দেখুন, আল কাসতালানির মন্তব্য (*আল মাওয়া হিব আল লাদু নিয়াহ,* ১/১৬৩)। একমাত্র আলওয়াকিদিই বলেন যে, রাসূল (সা) দুটো বর্ম এবং একটি শিরস্ত্রান ব্যবহার করতেন । (*আল মাগাযি,* ৩/৮৯৫-৮৯৭।

৫৩. *সহীহ* মুসলিম ৩/১৩৯৮-২৬০। আল হাকিম, *আল মুসতাদ রাক;* ৩/২৫৫। তিনি বলেন, "দু'শাইখের মতানুসারে এটি *সহীহ,* যদিও তারা এটি বর্ণনা করেন নি।" আল যাহাবি এ ব্যাপারে কিছুই বলেননি। আবু ইয়ালা, *আল মুসনাদ,* ৩/ ৩৩৮ বি, নং ৩০৩। ইমরান ইবনে দাবির ছাড়া এর বর্ণনাকারীগণ *সহীহ;* আমরা তার সম্পর্কে নিশ্চিত নই। ইবনে ইসহাক (সীরাত *ইবনে হিশাম,* ২/৪৪২), *সহীহ সনদসহ।*

৫৪. আল যারকানি, *শার আল মাওয়াহিব আল লাদুনিয়্যাহ* ৩/১৯-২০। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৮০ বা ১০০, তারা কিছুটা পিছনে হটে গিয়েছিল তবে পালিয়ে যায় নি।

৫৫. ইবনে ইসহাক (*সিরাত ইবনে হিশাম,* ২/৪৪২), জাবির ইবনে আবদ আল্লাহ'র *সহীহ সনদসহ,* তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধটি দেখেছেন।

৫৬. *মুসলিম, সহীহ,* ৩/১৩৯৮; ইবনে হিশাম, *আল সীরাহ,* ২/৪৪৪-৫; আবদ আল রায্যাক, *আল মুসান্নাফ,* ৫/৩৮০-১; ইবনে সা'দ, *আল তাবাকাত* ৪/১৮।

৫৭. আহমাদ, আল মুসনাদ, ৩/১২১। উদ্ধৃতি হলো *মুসনাদের সুলাসিয়াতের* মধ্যে একটি। ইবনে কাসির ও আল সাফারিনি দু'*শায়েখের* শর্তানুসারে এটির বর্ণনা করেননি (ইবনে কাসির, *আল বিদ্যায়া ওয়া আল নিহায়া,* ৪/৩৪৮; আল সাফারিনি, *শারহ সুলাসিয়াত মুসনাদ আহমাদ,* ২/২৮৬)।

৫৮. *সহীহ আল বুখারী*, ৪৩৫, ৫৩; *মুসলিম*, *সহীহ*, ৩/২৬০-১।

৫৯. *মুসলিম*, *সহীহ*, ৩/১৪০০-১; আল নবাবি, *শারহ মুসলিম*, *সহীহ*, ৪/৪০১-২।

৬০. *মুসলিম*, *সহীহ*, ৩/১৩৯৮, ২৬০; ইবনে ইসহাক *সীরাত ইবনে হিশাম*, ২/৪৪৪-৫।

৬১. *মুসলিম*. *সহীহ*, ৩/১৩৯৮, ২৬০।

৬২. *মুসলিম*, *সহীহ*, ৩/১৩৯৮, ২৬০, ২৬২।

৬৩. আল শওকানি বলেন, "যারা যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন তাদের সূত্রই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে, যারা দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছে আর যারা যায়নি উভয় পক্ষই এর অন্তর্ভুক্ত। যারা যায়নি তারা ফিরে দাঁড়ায় আর দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করে এবং যুদ্ধে জয়ী হয়। (*ফাতহ আল কাদির*, ১২/৩৪৮)।

৬৪. আল হায়সামি, *কাশফ আল আসতার*, ২/৩৪৬।

৬৫. আল হায়সামি, *মাজমা আল জাওয়াইদ*, ৬/১৮১; আল হায়সামি, কাশফ আল আসতার, ২/৩৪৯। *সনদ* সহকারে যাদের সবাই ছিলেন *সিকাহ*।

৬৬. আবু দাউদ, *সুনান*, ২/৬৫। তিনি বলেন, "এটি একটি *হাসান হাদীস*। আল হাকিম, *আল মুসতাদরাক* ২/১৩০, তিনি বলেন, "মুসলিমের শর্তানুসারে এটি *সহীহ*, তবে তিনি বা আল বুখারি কেউই এটির বর্ণনা করেন নি।" আল লাহাবি এ ব্যাপারে কিছুই বলেন নি।

৬৭. আবু দাউদ, *সুনান*, ২/৪৯-৫০।

৬৮. আহমাদ, *মুসনাদ*, ৩/৪৩৫, দু'টি সনদ হতে। আল হাসান ও আল আসওয়াদ ইবনে সারি যারা যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন তাদের মাধ্যমে। আল হাসান এটি আল আসওয়াদ থেকে শুনেন নি। প্রথম সনদটি কাতাদার *আনানাহ'র* সাথে সংশ্লিষ্ট। তিনি আবার মুদাল্লিস। দ্বিতীয় সনদটি কাতার সাথে সংশ্লিষ্ট। এটি আল হাসান ও আল আসওয়াদের মতে *মুনকাতি*।

৬৯. *মুসলিম*, *সহীহ*, ৩/১৪৪২।

৭০. ইবনে হিশাম, *আল সীরাহ*, ২/৪৫০, সনদ ছাড়া। আল তাবারি একই সনদসহ-এর বর্ণনা করেন। এটি *সুদাল*। এর কারণ হলো ইয়াকুব এবনে উতবাহ হলেন অল্প সংখ্যক *তাবিউনদের* একজন। আল তাবারি, *তারিখ আল রাসূল* ওয়া আল মুলুক, ৩/৭৮।

৭১. ইবনে হিশাম, *আল সীরাহ*, ২/৪৫০।

৭২. আল হায়সামি, *কাশফ আল আসতার*, ২/৩৪৬। এর সনদের মধ্যে আলি ইবনে আসিম অন্তর্ভুক্ত যাকে কেউ কেউ সিকাহ বলেন, অন্যরা এটিকে *যয়িফ* বলেন। আল হাফিয ইবনে হাজার বলেন, "এ *হাদীসটি* ছিল হাসান (*ফতহুর বারি*, ১৮/৪২)। আল বুখারীর রিপোর্টে বলা হয় যে, জুরাইয ইবনে আল সিম্মাহ শহীদ হন আওতাসে, আল যুবায়ের তাকে হত্যা করে। (*সহীহ*, ৫/১২৮)

৭৩. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ২/৪৫৭, সনদ ছাড়া।

৭৪. আবু দাউদ, *আল সুনান*, ২/৬৫; তিনি বলেন, "এটি একটি হাসান হাদীস;" আল হাকিম, *আল মুসতাদরাক*, ২/১৩০, তিনি বলেন, "এটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী *সহীহ*, তবে তিনি বা আল বুখারী কেউ এটি বর্ণনা করেন নি। আল যাহাবি এ ব্যাপারে কিছুই বলেন নি।

৭৫. ইবনে হিশাম, *আল সীরাহ*, ২/ ৪৫৫; ইবনে সা'দ *আল তাবাকাত*, ২/১৫২; আল ওয়াকিদি, *আল মাগাযি*, ৩/৯১৬।

৭৬. আবদ আল রায্যাক, *আল মুসান্নাফ*, ৫/৩৮; ইবনে সা'দ *আল তাবাকাত*, ২/১৫৫; আল তাবারি, *তারিখ*, ১০/১০২।

৭৭. আল তাবারি, *তারিখ*, ৩/৮২। এর *সনদ হাসান*, উরওয়ার বর্ণনা অনুযায়ী।

৭৮. ইবনে হিশাম, *আল সীরাহ*, ২/৪৮৮, সনদ ছাড়া, ইবনে ইসহাক হতে সংগৃহীত আল তাবারির কথা অনুসারে যুদ্ধে ছিল ৬০০০ উট, অনেক নারী শিশুও ছিল। *তারিখ*, ৩/৮৬।

৭৯. ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৪/৩৪৭। (ইবনে আল আসির, *আল নিহায়া*, ৩/২০৭-৮)

৮০. ইবনে সা'দ *আল তাবাকাত*, ২/১৫২, সনদ ছাড়া।

৮১. প্রাগুক্ত।

৮২. প্রাগুক্ত।

৮৩. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ২/৪৫৯, সনদ ছাড়া।

৮৪. *সহীহ আল বুখারী*, ৫/১২৬: আল হামিদি, মুসনাদ, ২/৩৯৮, সহীহ সনদ সহকারে। আল বাজ্জার, (*কাসফ আল আসতার* লি আল হায়সামি, ২/৩৪৬), ইবনে হাযার এর *সনদকে হাসান* বলেছেন। *ফাতহুর বারী*, ৮/৪২, তবে তিনি বলেন যে, এর *মতন মুনকার* ছিল। (*মুখতাসার জাওয়াইদ মুসনাদ আল বায্যার* পৃ. ২৪৯-২৫০, নং ৮১৬)। এ সূত্রগুলো হতে আমি আহতদের নাম সংগ্রহ করেছি। কোন সূত্রই সবগুলো নাম দিতে পারেনি।

৮৫. ইবনে ইসহাক, (*সীরাত ইবনে হিশাম*, ২/৪৫৩-৪, সনদ ছাড়া)। অবস্থানের সংজ্ঞার জন্য দেখুন, আল হারবি, *কিতাব আল মানাসিক*, হামিদ আল যাসিরের পাদটীকা, পৃ. ৩৪৬, ৩৫৩, ৪৭১ ও ৬৫৪।

৮৬. আমি ইতোমধ্যে বলেছি যে, আল জুবাইর ইবনে আল আওয়াম হুনাইন যুদ্ধের পরে দুরাইদ ইবনে আর মিসাকে হত্যা করে। আল বুখারীর রিপোর্টের সাথে এটি একমত ; এর কারণ তখন আল জুবাইর আওতাস বাহিনীতে ছিল।

৮৭. *সহীহ আল বুখারী*, ৫/১২৮, ৪/২৮, ৮/৬৯; *মুসলিম*, *সহীহ*, ৪/১৯৪৩; ইবনে ইসহাক, সনদ ছাড়া (সীরাত ইবনে হিশাম, ২/৪৫৪); আলওয়াকিদি, *মাগাযি*, ৩/৯১৫।

৮৮. ইবনে ইসহাক (সীরাত ইবনে হিশাম, ২/৪৫৮), এর কিছুটা বানু সা'দ হতে। আরও দেখুন, আল বায়হাকি, *দালাইল আল নবুয়্যা*, ৩/৫৬, কাতাদা'র *মারাসিল* হতে; এর সনদও দুর্বল বর্ণনাকারী।

৮৯. আল তারাবী, *যামি আল বায়্যান*, ১০/১০১, হাসান সনদসহকারে কাতাদার মারাসিল হতে, ইবনে আবদ আল বারর, *আল ইসতিয়াব*, ৪৪০; আবু দাউদ, *আল সুনান*, ২/৬৩০, আবু আল তুফায়েল-এর হাদীস হতে, তবে এর সনদ কিছু সংখ্যক মাযুল বর্ণনাকারীর কথাও বলে থাকে। আল হাকিম, *আল মুসতাদরাক*, ৩/৬১৮; ৪/১৬৪, তিনি বলেন, "এর *সনদ সহীহ*," ইবনে কাসির, আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া, ৪/৩৬৪। তিনি বলেন, এটি ছিল তার বোন আল শায়মা, হালিমা নয়। এর কারণ তখন তার বয়স চলছিল নব্বই এর দশক। আবু দাউদ, *আল মারাসিল*, *মুদাল সনদসহ*, ইবনে কাসির, প্রাগুক্ত।

অধ্যায় ১৬

তায়েফ অভিযান

মুসলিম বাহিনী হাওয়াজিনদেরকে ছত্রভংগ করে নাখলা ও আওতাস পর্যন্ত ধাওয়া করে তায়েফ নগরীর দিকে রওয়ানা হলো। এখানে সাকিফ ও মালিক ইবনে আওফ আল্ নাসরি নিজেদেরকে সুরক্ষিত করে রাখে। তায়েফের অবস্থান ছিল পর্বতবেষ্টিত, মজবুত দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত। সাকিফরা সারা বৎসরের রশদ ভান্ডার গড়ে তোলার পর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র জমা করার পর চারিদিকের সব গেইট বন্ধ করে দিল। বিশে শাওয়ালে মুসলমানগণ তায়েফ পৌছলেন। হুনাইনের লড়াইয়ের পর মুসলিম বাহিনী বেশী দিন বিশ্রাম নেয়নি। দশ শওয়ালে তারা নাখলা ও আওতায় প্রবেশ করেন। তারা এখানে এক সপ্তাহের অধিক সময় অবস্থান করেন।

উরওয়া ইবনে আল জুবাইর ও মূসা ইবনে উকবা'র[১] বর্ণনা অনুযায়ী মুসলিমরা ১০ দিনের বেশী সময় তায়েফ অবরোধ করে রাখে। উরওয়ার আরেক বর্ণনায় দেখা যায় তারা সেখানে অর্ধমাস অবস্থান করে।[২] সবগুলো বর্ণনা *মুরসাল* হওয়ার কারণে এগুলোকে প্রমাণ হিসেবে নেয়া যাবে না। উরওয়া ও মূসা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য লেখক। তাদের বর্ণনার ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। অন্যান্য বর্ণনায় দেখা যায় এ অবরোধ পঁচিশ দিন।[৩] এক মাস[৪] বা চল্লিশ দিন[৫] পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। তবে অবস্থানের এ সব হিসাব ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে টিকতে পারে না আমরা যদি অবরোধের সময়কে চল্লিশ দিন মেনে নিই। রাসূল (সা) যিলকদ[৬] মাস শেষ হওয়ার ছয় দিন পূর্বে মদীনা পৌছেন, আল যারানায় দশ রাত অবস্থানের পর তিনি *উমরাহ* পালন করেন। তায়েফ অবরোধ প্রত্যাহারের আঠারো দিন পর *উমরাহ* করা হতে পারে।

মুসলমানগণ তায়েফগামী পুরনো রাস্তা দিয়ে তায়েফ প্রবেশ করে। দক্ষিণ দিক থেকে রাস্তাটি তায়েফ প্রবেশ করেছে। নাখলা আল ইয়ামানিয়া ও কার্ণ আল মানানিল এর মধ্যে দিয়ে মুসলমান বাহিনী অগ্রসর হলো। এ দু'টো স্থানের দূরত্ব ৮০ কি মি এবং তায়েফ ছিল ৫৩ কি মি। এর পর তারা আল মুলাইয়ের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়, আল মুলাই তায়েফের[৭] একটি উপত্যকা। তায়েফের দক্ষিণে বুহরাত আল রুগা ১৫ কি মি । ৯০ কি মি দীর্ঘ মক্কা ও তায়েফে অভিযান পরিচালনা সহজ ছিল না। তায়েফের জটিল তরঙ্গায়িত ভূমি আর ভূমির অবস্থান একে প্রাকৃতিক একটি রক্ষাব্যবস্থা দিয়েছিল। রাসূল (সা) হাওয়াজিন বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ছিলেন। তায়েফে প্রবেশের পূর্ব ও দক্ষিণে পরিখা খনন করা হলো।[৮] মুসলিমরা তায়েফ দুর্গের কাছাকাছি তাঁবু গাড়েন। এগুলো সাকিফের তীরের সীমানার মধ্যে ছিল। তাবুর কোন কোনটি তীরে আঘাত প্রাপ্ত হলে তারা পার্শ্বে নির্মিত মসজিদের কাছে তাঁবু সরায়ে নেন। বর্তমানে মসজিদটি আবদ্ আল্লাহ্ ইবনে আব্বাস মসজিদ নামে খ্যাত। আগে তায়েফের অবস্থান ছিল মসজিদের দক্ষিণ পশ্চিমে।[৯]

মুসলিম বাহিনী তায়েফ দুর্গের কাছাকাছি তাঁবু খাটালেন। মুসলমান বাহিনী এ অভিযানে একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। তারা মোটা কাঠের টুকরা চামড়া দিয়ে মুড়িয়ে চাকার উপর বেঁধে দেন, দেয়াল অবদি পৌঁছা পর্যন্ত তীরের আক্রমণ থেকে সেগুলোকে লুকিয়ে রাখা হয়। সাকিফ *দাব্বাবাতে* লোহার গরম টুকরা নিক্ষেপ করতে থাকে। (*দাব্বাবাহ* শব্দটি এখন ট্যাঙ্ক ও কৌশলের জন্য ব্যবহৃত হয়). এর থেকে আগুন লেগে যায়। যোদ্ধারা এর নিচে থেকে বেরিয়ে এলে তীরবিদ্ধ হতে থাকে।[১০] মুসলমানদের এটি প্রথম যুদ্ধ যে যুদ্ধে তারা দুর্গে আঘাত হানার জন্য এরূপ কৌশল প্রয়োগ করতে থাকে। যারশ্ আল ইয়ামানিয়া, যার ধ্বংসাবশেষ এখনো ওয়াদি বিশাতে[১১] যে দাঁড়িয়ে আছে। যারশ "ট্যাংক" গুলতি ও *দাবুর* (যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র) উৎপাদনে বিখ্যাত ছিল।[১২] দু'জন সাকিফ নেতা যারশ-এ যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম তৈরীর কৌশল শিখছিল ইবনে ইসহাক তার বর্ণনা দেন। তায়েফের প্রতিরক্ষার জন্য যুদ্ধের এসব অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করা হচ্ছিল।[১৩]

গুলতির[১৪] অস্ত্র দিয়ে দুর্গের দেয়ালে আঘাত করার মুসলমানদের কৌশল আয়ত্ব করার বিষয়টি বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, খালিদ ইবনে সাইদ ইবনে আল আস যারশ্ এর কাছ থেকে দু'টো ট্যাঙ্ক ও দু'টো গুলতি নিয়েছিলেন। আরেকজনের বর্ণনা থেকে জানা যায় সালমান ফারসি গুলতি প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেন।[১৫] তবে এটা স্পষ্ট যে, মুসলমানদের এসব প্রযুক্তি যথেষ্ট পরিমাণে ছিল না :

তায়েফের উপর চাপ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে রাসূল (সা) নির্দেশ দিলেন যে, তায়েফের সব আংগুর ও খেজুর গাছ জ্বালিয়ে দিতে হবে। তায়েফবাসীরা রাসূল (সা)কে এরূপ না করার জন্য আবেদন করলো। রাসূল তাদের অনুরোধে খেজুর ও আংগুর গাছ পোড়ালেন না। তায়েফবাসীরা মানসিকভাবে ভেংগে পড়লো।[১৬]

রাসূল (সা) প্রথামাফিক তায়েফের দাসদের উদ্দেশে বললেন যে, তায়েফের দুর্গ থেকে যারাই বের হয়ে আসবে তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া হবে। রাসূল (সা)-এর আহবান শুনে তেইশজন দাস বেরিয়ে এলো, তারা ইসলাম কবুল করলো। রাসূল (সা) তাদেরকে পুনরায় তাদের পূর্বতন প্রভুদের কাছে না পাঠিয়ে মুক্ত করে দিলেন।[১৭] এমনকি পূর্বতন প্রভুরা ইসলাম কবুল করলেও তাদের কাছে দাসদের আর ফেরৎ পাঠানো হলো না।[১৮]

সাকিফদের উপর বৃষ্টির ন্যায় তীরের প্রবল আক্রমণ সত্ত্বেও রাসূল (সা) প্রতিশ্রুত বেহেশতের আশায় সাকিফের লোকজন প্রবল আক্রমণের মুখে অবরোধের সময় গর্ব ও দৃঢ়তা নিয়ে প্রতিরোধ করে চললো।[১৯]

মুসলিমরা অনেকে আহত হলেন,[২০] বারজন শহীদ হলেন।[২১] মাত্র তিনজন *মুশরিক* নিহত হলো। *মুশরিকরা* দুর্গের দেয়ালের ভেতরে নিরাপদে ছিল।[২২]

সহীহ বর্ণনা[২৩] থেকে জানা যায় রাসূল (সা) তায়েফ দখল করতে চান নি। তিনি বরং সাকিফদের দুর্বল করে দিতে চেয়েছেন আর বুঝাতে চেয়েছেন যে, তাদের দেশ

মুসলমানদের নাগালের মধ্যে রয়েছে, মুসলমানদেরকে কষ্টের মধ্যে ফেলতে চান নি বা এমন অবস্থাতেও ফেলতে চান নি যে, অনেক লোক শহীদ হয়ে যেতে পারে। রাসূল (সা) চারদিকে ইসলাম পরিবেস্টিত একটি দেশকে জয় করতে চেয়েছিলেন। ইসলাম কবুল করতে হবে, দেরিতে বা সকাল যখনই হোক এরূপ একটি দেশকে আত্মসমর্পণ করতেই হবে। রাসূল (সা) কুরাইশদের জন্য যেমন উদ্বিগ্ন ছিলেন তেমনি সাকিফদের জন্যও উদ্বিগ্ন ছিলেন। সাকিফরা ছিল বুদ্ধিমান জাতি। তারা ইসলাম গ্রহণ করলে ইসলামের বিরাট উপকার হতে পারে। তারা মুসলমান হোক রাসূল (সা) তাই চাইতেন। মুসলমানদের মক্কায় থাকা অবস্থাতেই তাদের মধ্যে ইসলাম প্রসারের চেষ্টা করেছিলেন। তারা তাঁর আহবান উপেক্ষা করলে তিনি তাদের সৎ পথে পরিচালনার জন্য দোয়া করলেন। তাঁর আহবান উপেক্ষা করা ছাড়াও তারা রাসূল (সা) কে আঘাতও করেছিল। তায়েফ অবরোধের সময় কোন কোন সাহাবী সাকিফদেরকে বদদোয়া করতে বলেন। তিনি (সা) বললেন, "হে আল্লাহ সাকিফদেরকে সৎপথে পরিচালিত কর।"[২৪]

আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই এরপরও রাসূল (সা) সাহাবীদেরকে তায়েফের উপর থেকে অবরোধ উঠিয়ে নেয়ার জন্য বললেন। প্রথম দিকে তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, মুসলিমরা লড়াই করতে চায়, তখন রাসূল তাদেরকে দু'একটা খন্ডযুদ্ধ করার অনুমতি দিলেন। এরূপ যুদ্ধ তাদের কাছে নিরর্থক মনে হলো। রাসূল (সা) যখন আবার অবরোধ উঠায়ে নিতে পরামর্শ দিলেন, তারা এবার রাসূল (সা)-এর বিজ্ঞ সিদ্ধান্ত মেনে নেন।[২৫] মুসলিমরা ৫ যিলকদে আল যারানায় ফিরে আসেন।

হুনাইন যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত বিপুল পরিমাণের গণিমত যারানায় মজুদ রাখা হয়। কিছু রৌপ্য ছাড়া তায়েফ থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত রাসূল এগুলোর বিতরণ স্থগিত রাখলেন।[২৬] রাসূল দশদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন।[২৭] তিনি এ সময়ে মনে করেছিলেন হাওয়াজিনরা ইসলাম গ্রহণ করবে। কিন্তু তারা না করে রাসূল (সা) কে শুধুই অপেক্ষায় রাখলো। এর পর রাসূল (সা) গণিমতের মালপত্রগুলো বিতরণ করে দিলেন। গণিমতের মাল বিতরণের নিয়ম হলো এক পঞ্চমাংশ মাত্র নিজেদের জন্য রাখা যাবে। রাসূল (সা) কে কুরবানির নিয়ম অনুযায়ী বিতরণ করতে হবে।

> আরও জেনে রাখবে যে, যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রাসূলের, স্বজনদের, ইয়াতিমদের, দরিদ্রদের এবং পথচারীদের। যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহতে এবং তাতে মিমাংসার দিন, যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছিলাম যখন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। (৮:৪১)

চার পঞ্চমাংশ যারা প্রকৃত অর্থেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। এ পরিমাণ অংশ তাদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দিতে হবে। সৈনিকের জন্য এক ভাগ অশ্বারোহীর জন্য তিন ভাগ, এক ভাগ তার নিজের জন্য, দু'ভাগ তার ঘোড়ার জন্য -এভাবে সমানভাবে ভাগ করা হলো। স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে যুদ্ধলব্ধ মালের জন্য ভাগের এটাই নিয়ম। অস্থাবর সম্পত্তির বেলায় ইমামের (রাষ্ট্র

প্রধান) নিজের পছন্দমত বিতরণের ক্ষমতা আছে, তিনি এটা রেখেও দিতে পারেন। রাষ্ট্রের জন্য তিনি রেখে দিতে পারেন।

মুসলিমরা যুদ্ধ করে যে সম্পদ লাভ করেছে তাকে *গণিমাত* বলে। *শরীয়াতের* বিধান অনুযায়ী এটি ভাগ করে দেয়া হয়। যুদ্ধ ছাড়া যে সম্পদ লাভ করা হয় তাকে *ফায়* বলা হয়। শাসক এটিকে নিজের ইচ্ছেমত সাধারণের সুবিধার্থে বিতরণ করতে পারেন। শাসক যারা যুদ্ধে ভাল করেছে তাদেরকে নিজের ক্ষমতা বলে পুরস্কার হিসাবে দান করতে পারেন। এ জাতীয় দান গণিমত থেকে *খুমুস* (পঞ্চমাংশ) নেয়ার পর যারা যুদ্ধে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে তাদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়। যোদ্ধাদেরকে তাদের হাতে নিহত *মুশরিকদের* সম্পত্তিও দখল করার বৈধতা দেয়া হয়।

গণিমত এমনভাবে বন্টন করা হতো, প্রথম দিকে সাহাবীগণ তা বুঝতে পারেন নি। এ গণিমত *তুলাকা* ও বেদুঈনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। তারা নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে বিধায় তাদের অন্তরে ইসলামের ভালবাসা সৃষ্টির জন্য তাদেরকে গণিমতের মাল বিতরণ করা হয়, তাদের ঈমান তখনও শক্ত হয়নি। নিম্নবর্ণিতদের মধ্যে একশত করে উট বিতরণ করা হয়। গাতফানের নেতা উয়াইনা ইবনে হিস্ন, তামিম নেতা আল আকরা ইবনে হারিস; আল কামাহ ইবনে আলাথা, আল আব্বাস ইবনে মারদাস, মুহাইল ইবনে আমীর, হাকিম ইবনে হাজাম, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব্ এবং সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া এবং কুরাইশ নেতৃবৃন্দ।[২৮] ইবনে হিশামের তালিকা অনুযায়ী যাদেরকে ১০০টি করে উট দেয়া হয় তাদের সংখ্যা ১২। তিনি আরও পাঁচ জনের নাম বলেন যারা ১০০ টির কম উট নিয়েছিলেন।[২৯] ইবনে হিশাম ২৯ জনের নাম করেন যাদের অন্তরে ইসলামের জন্য ভালবাসা জাগিয়ে তুলতে হবে, সত্যের জন্য ভালবাসা জাগিয়ে তুলতে হবে।[৩০] অন্যরা তেইশ জনের নাম বলেন। এভাবে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় বায়ান্ন জনে।

দানগুলো নেতা ও তাদের অনুসারীদের অন্তর জয় করে। এ সব দান গ্রহণে তারা তাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করলো, তারা মুসলমান হওয়ার জন্য বেশী বেশী আগ্রহ প্রকাশ করলো। তারা সবাই উত্তম মুসলমান হয়ে গেল, ইসলামের জন্য বেশী বেশী চেষ্টা করতে লাগলো। জানমাল দিয়ে তারা ইসলামের খেদমতে এগিয়ে এলো। এর মধ্যে অল্প কিছু সংখ্যকই বাদ থাকলো। যেমন, ইবনে হাযমের মতে উয়াইনা ইবনে হিসন আল ফাযারি তখনও ঈমানের দিক দিয়ে দুর্বল রয়ে গেল।[৩১]

আযিম ইবনে মালিকের মতে, " মানুষ পার্থিব জিনিসের জন্য ইসলাম কবুল করতো, কিন্তু যখন ইসলাম গ্রহণ করে ফেলত তখন পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে এটি তাদের কাছে বেশী প্রিয় বস্তুতে পরিণত হতো।"[৩২]

"যাদের অন্তরে ইসলামের ভালবাসা তৈরী হতো যাদের অন্তরে সত্যের আবেদন সৃষ্টি হতো তারা এর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতো। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া বললেন, "যখন আল্লাহর রাসূল আমাকে যে বিষয়টি দেয়ার তা দিয়েছেন, আমি তাকে সবচেয়ে

বেশী ঘৃণা করতাম, কিন্তু এরপরও তিনি আমাকে দান করেই যাচ্ছিলেন। আমি মানুষটিকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসা দেয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকলো।"[৩৩]

সাফওয়ান ইবনে ইমাইয়্যা এমনই একজন যার অন্তরে ইসলামের জন্য ভালবাসা তৈরী হয়েছিল। তিনি রাসূল (সা) এর কাছ থেকে দান গ্রহণ করতেন। তিনি যতবারই দান গ্রহণ করতেন ততবারই আরও বেশী করে চাইতেন। রাসূল (সা) তার কাছে সম্পদের প্রতি মোহ সম্পর্কে বললেন আর তাকে সাবধান করলেন। এর পর থেকে[৩৪] সাফওয়ান বায়তুল মা'ল থেকে তার প্রাপ্য বার্ষিক ভাতাও গ্রহণ করতেন না। এর দ্বারা যারা সত্যের শিক্ষা গ্রহণ করেছিল তাদের অন্তরে যে পরিবর্তন এসেছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। যতই দিন যাচ্ছিল ততই তাদের অন্তর ইসলামের শিক্ষায় ভরপুর হয়ে উঠতে লাগলো।

প্রথম দিকে কিছু কিছু মুসলিম হতাশ হয়েছিলেন। তারা ভেবেছিলেন যাদেরকে দান করা হয় তাদেরকে তাদের অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি। রাসূল (সা) তাদের কাছে এর পেছনে যে হিকমত রয়েছে তা ব্যাখ্যা না করে পারলেন না। তিনি বললেন, "আল্লাহর শপথ কাউকে কাউকে বাদ দিয়ে আমি দান করে থাকি, আমি যাকে দান দিই না তাকে আমি যাকে দিই তার চেয়ে বেশী ভালবাসি। যাদের অন্তরে অস্থিরতা আর উদ্বিগ্নতা লক্ষ্য করি তাদেরকে আমি কিছু দিয়ে থাকি। আর অন্যদেরকে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর ছেড়ে দিই।"[৩৫]

তিনি বলেন, "যারা এখনো *কুফরের* কাছাকাছি (যেমন, ইসলামে খুবই নতুন) আমি ঐ সকল লোকদের দেই। তাদের অন্তরে ইসলামের ভালবাসা *সৃষ্টির* জন্য দিই।"[৩৬]

তিনি বলেন, "আমি এমন কাউকে দিতে পারি যার চেয়ে আমি অন্যকে বেশী ভালবাসি, কারণ আমি ভীত এ ভেবে যে, আল্লাহ তাকে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে।"[৩৭]

রাসূল (সা) ইতোমধ্যে শুনেছেন যে, *আনসাররা* মন খারাপ করেছে, তাদেরকে কোন দানই দেয়া হয়নি। তাদের মধ্যে কোন কোন অল্প বয়স্ক *আনসার* বলতে লাগলো যে , "যখন কোন সংকটের সৃষ্টি হয় তখন আমাদেরকে ডাক দেয়া হয় কিন্তু গণিমতের মাল অন্যদেরকে দেয়া হয়।" এবং "রাসূল কুরাইশদেরকে দিচ্ছেন আর আমাদেরকে ত্যাগ করেছেন, যদিও আমাদের তলোয়ার এখনো কুরাইশদের রক্তে রঞ্জিত আছে।" এ কথা শুনে রাসূল তাদেরকে চামড়ার একটা তাঁবুতে ডেকে বললেন,

> "কুরাইশরা এখনো *জাহিলিয়াত* ও দুর্যোগের কাছাকাছি অবস্থান করছে। আমি তাদেরকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে চাই, তাদের অন্তর জয় করতে চাই। তোমরা কি খুশি হবে না যে, লোকগুলো পার্থিব সম্পদ গ্রহণ করছে আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে বাড়ী যাচ্ছ? লোকগুলো যদি কোন উপত্যকার ভিতর দিয়ে যায় আর *আনসাররা* যদি যায় কোন পর্বতের মধ্য দিয়ে, তখন আমি *আনসারদের* পথটিই বেছে নেব।"[৩৮]

আনসারদের কাছে গণিমতের মাল বিতরণের *হিকমত* স্পষ্ট হলে রাসূল (সা) ইসলামের জন্য *আনসারদের* কুরবানি, ইসলামের জন্য তাদের ভক্তি, তাদের ঈমানের ব্যাপারে প্রশংসা করলেন। *আনসারগণ* ছিলেন একেবারেই নির্লোভ আর সকল ভয় ভীতিতে ঈমানে আস্থাবান। যখন তারা বুঝতে পারলো যে, কেন তাদেরকে দান করা হয়নি, তখন তারা ঘোষণা করলো যে তারা এতে সন্তুষ্ট যেহেতু এটি ইসলামের স্বার্থেই করা হয়েছে। যে ঈমানের জন্য এত কুরবানি দিয়েছে, তাদের প্রিয় সব জান-মাল ত্যাগ করেছে তখন তারা সন্তোষ প্রকাশ করলো। তারা কিভাবে সন্তুষ্ট না হয়ে পারবেন যখন দেখলেন তাদের নেতা রাসূল (সা) নিজেই তাদেরকে সব কিছুর উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন, তাদের *আকীদার* উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, এবং তাদের ঈমানের প্রশংসা করেছেন? তারা রাসূল (সা) যেমন ভেবেছেন তেমনই উত্তম ছিলেন। রাসূল (সা) এর এ সব কথা শুনে তারা কেঁদেছিলেন আর বলেছিলেন, "আল্লাহর রাসূলের উপর আমরা সন্তুষ্ট, তিনি আমাদের ভাগ্য, তিনি আমাদের অংশ।"[৩৯]

হুনাইন অভিযানে অংশগ্রহণকারী কিছু বেদুঈন আল যারানায় গণিমতের মাল বন্টনের সময় বেশ রূঢ়তা প্রদর্শন করে। তাদের একজন রাসূল (সা) কে বলতে থাকে,[৪০] "ন্যায় বিচার করুন।" তিনি বললেন, "আমি যদি ন্যায়বান না হই, তোমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে।"[৪১] বেদুঈনের কথায় উমর ইবনে খাত্তাব রাগান্বিত হয়ে তাকে হত্যা করার জন্য রাসূল (সা)-এর অনুমতি চাইলেন। কিন্তু রাসূল (সা) তাকে নিষেধ করে বললেন, "আমি মানুষের কাছ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি আমার সাথীদের হত্যা করা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"[৪২]

বেদুঈনদের আচার আচরণে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। কেননা, তাদের বেশীর ভাগই যুদ্ধলব্ধ গণিমতের মালের জন্যই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। রাসূল (সা) যখন হুনাইনের যুদ্ধের গণিমত বিতরণ করছিলেন তখন তারা রাসূল (সা) এর চারদিকে জড়ো হলো। অবস্থা এমন হলো যে, তার জামা গাছের একটি ঢালে আটকে যায়। তিনি তখন বলেন, "এ আদা'র (জায়গা দখল করা কাঁটা গাছ) সমানও যদি আমি গণিমতের মাল পেতাম, আমি[৪৩] তোমাদের মধ্যে তা বিতরণ করে দিতাম। তোমরা আমাকে কৃপণ, মিথ্যাবাদী বা ভীতু হতে দেখতে পেতে না।" এর পর তিনি উটের কুঁজ হতে একটি পশম নিয়ে বললেন, "আল্লাহর কসম এ পশমটি সহ গণিমতের পঞ্চমাংশ ছাড়া আমার কিছুই নেই, পঞ্চমাংশ আমি তোমাদেরকে ফেরত দেব।" এরপর তিনি তাদের উদ্দেশে বললেন, ভাগ করার পূর্বে গণিমতের কোন কিছু নেয়া *হারাম*। এক *আনসার* লোক গণিমতের মাল থেকে প্রাপ্ত এক গামলা উটের পশম নিয়ে এসে তা ফেরত দিল।[৪৪] রাসূল (সা) এর মুক্ত করা জনৈক কারকারাহ সরে যাওয়ায় রাসূল (সা) বললেন, "তার স্থান দোযখে।" তার জিনিসপত্র খোঁজাখুঁজি করে এর মধ্যে একটি জামা পাওয়া গেল। এটি সে গোপন করেছিল।[৪৫]

জনগণের সম্পত্তি রক্ষায় রাসূল (সা) এর নির্দেশনা ছিল পরিষ্কার। *আনসারদের* মনোভাব ছিল এবং তাদের মধ্যে ছিল রাসূল (সা) এর নির্দেশের প্রতি অঙ্গীকার। যার

কোন মূল্য ছিল না এমন তুচ্ছ জিনিসের ব্যাপারেও তারা ছিল নিষ্ঠাবান, যেমন এক গামলা উটের পশম ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল।

বেদুঈনদের আচরণের রূঢ়তায়, তাদের দুনিয়াবি সম্পদের ব্যাপারে রাসূল (সা) ধৈর্যশীল ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষকের ন্যায় যিনি তাদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাদের উপর পরিবেশের প্রভাব, তাদের জীবনাচরণ, চারিত্রিক রূঢ়তা, ব্যক্তিগত চেতনা সম্পর্কে অভিহত ছিলেন। তিনি তাদের সাথে দয়াপূর্ণ ব্যবহার করেন, তাদের পছন্দ অপছন্দের মূল্যায়ন করতেন, তাদের মন মানসিকতার মূল্যায়ন করতেন। তিনি তাদের প্রতি দয়ালু ছিলেন, তিনি ছিলেন তাদের শিক্ষক ও সংস্কারক। ঐ সময়ের রাজারা যেভাবে তাদের প্রজাদের সাথে ব্যবহার করতো তিনি তাদের সাথে তেমন ব্যবহার করেননি। বেদুঈনরা তাদের শাসকদেরকে মাথা নত করে শ্রদ্ধা জানাতো, তারা অদৃশ্য থাকলেও শাসকদেরকে এভাবেই সম্মান প্রদর্শন করতো। বেদুঈনরা তাদের রাজাকে সম্বোধন করার সময় রাজার উদ্দেশে প্রশংসার স্তুতি করতো যেমন করে প্রার্থনাকারী *আব্দ* তার প্রভুর উদ্দেশে করে থাকে। রাসূল (সা) ছিলেন তাদের মত একজন। বেদুঈনরা তাকে সম্বোধন করে গালাগাল করে। তাদের কাছে তিনি মোটেও গোপন রইলেন না। সাহাবীগণ তাঁর উপস্থিতিতে ছিলেন বিনয়ী, কথায় ছিলেন কোমল। তাদের অন্তরে তাঁর জন্য ছিল গভীর মহব্বত। বেদুঈনরা রাসূল (সা) এর প্রতি যে রূঢ়তা, কঠোরতা ও উদ্ধত আচরণ দেখিয়েছে তাকে কুরআনে ভর্ৎসনা করা হয়েছে।[৪৬]

গণিমতের মাল বিতরণের পর হাওয়াজিনদের একটি দল তাঁর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করে। তারা রাসূল (সা) কে তাদের সম্পদ ও বন্দীদের ফেরত দিতে বলে। রাসূল (সা) তাদেরকে সম্পদ ও বন্দীর মধ্যে কোনটি নিতে চায় তার পছন্দ করতে বললে তারা তাদের বন্দীদের ফেরৎ চায়।[৪৭] এ সময় রাসূল (সা) বিশ্বাসীদের উদ্দেশে বললেনঃ

> "তোমাদের এ ভাইয়েরা অনুতপ্ত হয়ে আমাদের কাছে এসেছে, আমি তাদের বন্দীদেরকে তাদের কাছে ফেরৎ দিতে চেয়েছি। সেজন্য তোমাদের মধ্যে স্বাধীনভাবে কেউ যদি তাদের বন্দীদেরকে দিয়ে দিতে চায়, তাকে তা করতে দাও। আর কেউ যদি তাকে তার প্রাপ্য প্রথম গণিমত, যা আমাদেরকে আল্লাহর তরফ থেকে দেয়া হয়েছে, তা শোধ না করা পর্যন্ত তা রেখে দিতে চায়, এবং তাকে তাই করতে দাও।" তখন জনতা বলে উঠলো ঃ "হে আল্লাহর রাসূল, আমরা তাদেরকে বিনা মূল্যেই ছেড়ে দেব।" রাসূল (সা) বললেন "আমি জানি না তোমাদের কে এরূপ অনুমতি দিচ্ছে আর কে দিচ্ছে না। তোমরা ফিরে যাও, তোমাদের নেতাদের আমাদের সাথে আলোচনা করতে পাঠাও।" জনতা তাদের নেতাদের কাছে গেল, তারা রাসূলের কাছে ফিরে এসে তাদের সম্মতির কথা জানাল। এরপর তারা বিনা মূল্যেই তাদের বন্দীদেরকে ফেরৎ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।[৪৮]

রাসূল (সা) যোদ্ধাদের সাথে চুক্তি মোতাবেক হাওয়াজিনদের কাছে বন্দীদেরকে ফেরৎ দিতে চাইলেন। গণিমত ছিল তাদের অধিকার, তাদের সম্মতি ছাড়া রাসূল (সা) তা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করতে পারেন না। যারা সহজ শর্তে বন্দী বিনিময়ে রাযী হয়নি রাসূল (সা) তাদের বন্দীর বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ দিতে চাইলেন। তিনি সৈন্যদের নেতৃত্বদানকারী নেতাদের সাথে এ ব্যাপারটি নিশ্চিত করলেন। বেশীর ভাগ সৈন্যই বন্দীদেরকে ছেড়ে দিতে রাযী হলো। এর মধ্যে বাদ রইলো আল আকরা ইবনে হারিস, সে তামিম গোত্রের সবার পক্ষে কথা বললো এবং উয়াইনা ইবনে হিস্‌ন, সে ফাজারাহ গোত্রের সবার পক্ষ হয়ে কথা বলছিল। রাসূল (সা) তাদের বন্দীদের ক্ষতিপূরণ দিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন।[৪৯] এর দ্বারা বুঝা যায় যে, হাওয়াজিনদের প্রতিনিধিদলটি সম্পদ ও বন্দীদের হস্তান্তরের পরই এসেছিল। ইবনে ইসহাকও তাই বলেছেন।[৫০]

রাসূল (সা) হাওয়াজিনদের ইসলাম কবুল করতে দেখে খুশি হলেন। তিনি তাদের নেতা মালিক ইবনে আওফ আল নাসরি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তারা বললেন যে, সে তায়েফে সাকিফের সাথে আছে। রাসূল (সা) মালিকের পরিবার ও সম্পত্তি তাকে ফেরৎ দিতে চাইলেন। আর সে যদি মুসলমান হয়ে আসে তা হলে তাকে ১০০টি উট উপহার দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। মালিক মুসলমান হয়ে এলেন। রাসূল (সা) তাকে প্রতিশ্রুত উট দিলেন আর তাঁর লোকদের উপর এবং প্রতিবেশী গোত্রসমূহের উপর *আমীর* বানিয়ে দিলেন।

মালিক ভাল মুসলমান হয়ে গেলেন। তিনি তায়েফে সাকিফের সাথে লড়াই করলেন এবং তাদের উপর চাপ প্রয়োগ করেন।[৫১] তাদেরকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলার পর তাদের নেতার এ দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার একটা ইতি টানতে চাইলেন। তারা কোনপ্রকার নড়াচড়া করতে পারলোনা বা কোন প্রকার ব্যবসা বাণিজ্যও করতে পারলো না। তাদের কোন কোন নেতা ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়লো। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো উরওয়া ইবনে মাসুদ আল সাকাফি। সাকাফি শীঘ্র রাসূল (সা) এর সাথে যোগ দিল। রাসূল (সা) এ সময় মদীনা যাচ্ছিলেন। গণিমতের মাল বিতরণ শেষে আল যারানা হতে উমরাহ করে রাসূল (সা) মদীনা আসছিলেন। মদীনা পৌছার পূর্বেই উরওয়া ইবনে মাসুদ আল সাকাফি রাসূল (সা) এর সাথে দেখা করেন এবং সাথে সাথে ইসলাম কবুল করেন। এর পর উরওয়া তায়েফে ফিরে যান। সাকিফ নেতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা। উরওয়া তার লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং তার বাড়ীর উঁচু স্থান হতে সালাতের *আযান* দিতে বলেন। এতে কোন কোন সাকিফ রাগান্বিত হয়ে তাকে তীর নিক্ষেপ করলো ও তাকে আঘাত করলো। উরওয়া তার লোকদের বললেন তার মৃত্যুর পর তাকে যেন মুসলমানদের সাথে কবর দেয়া হয় যে মুসলিমরা তায়েফ অবরোধের সময় শহীদ হয়েছিলেন।[৫২]

সাকিফের নেতৃত্ব তাদের অবস্থার ব্যাপারে মারাত্মক হয়ে গেল। তাদের নিরাপত্তা ও তাদের সম্পদের নিরাপত্তার জন্য তারা চেষ্টা করলো। *হিজরীর* নবম বৎসরে তাবুক থেকে রাসূল (সা) এর ফিরে আসার পর সাকিফরা আবদ্ ইয়া লায়েল ইবনে আমর এর

নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। এর মধ্য থেকে দু'জন এ দলে ছিল। আল মুগিরা ইবনে শুবাহ মক্কা থেকে খানিকটা উত্তরে ওয়াদি কানাতে তাদের সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি আবু বকরকে তাদের আগমনের কথা জানালেন। আবু বকর রাসূল (সা) কে সুখবরটি দেয়ার জন্য দৌড়ে গেলেন। আল মুগিরা তাদেরকে ইসলামের সালাম পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন। আর রাসূল (সা) কে সম্বোধনের সময় কি আদব কায়দা অনুসরণ করতে হবে তা শেখালেন। রাসূল (সা) তাদেরকে মসজিদের একটি তাঁবুতে থাকতে দিলেন। এখান থেকে তারা কুরআন শুনতে পারবে আর মুসলিমরা কিভাবে সালাত আদায় করে তা দেখতে পারবে। প্রতিনিধি দলটি তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন। রাসূল (সা) তাদের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করলেন।[৫৩] তারা রাসূল (সা) কে তিনটি বছর *লা'ত* মূর্তি ধবংস না করার অনুরোধ করেন। কারণ তারা জনরোষের ভয় করছিল। রাসূল (সা) তাদের কথা রাখলেন না। তবে তিনি তাদেরকে মূর্তিগুলো ভাংগা থেকে দূরে রাখলেন। রাসূল (সা) এ কাজে আবু সুফিয়ান ইবনে হারব এবং আল মুগিরা ইবনে শুবাকে পাঠান। তারা রাসূল (সা) এর কাছে তাদেরকে প্রার্থনা করা থেকে মাফ করে দেয়ার জন্য বলেন। তারা মনে করলো আল্লাহর সামনে মাথা নত করে সেজদার মাধ্যমে প্রার্থনা করা হয়, এ বিষয়টির হীন অর্থ করা হয়, মুশরিকরাও *লা'ত* ও পাথরের অন্যান্য দেবদেবীর প্রার্থনা ও মাথা নত করে ও ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে একই ভাবে প্রার্থনা করে থাকে। রাসূল (সা) তাদের এ কথা মানতে পারলেন না। তিনি বললেন, "যেখানে রূকুর ব্যবস্থা নেই সেটি কোন ভাল ধর্ম নয়।"[৫৪] তারা রাসূল (সা) কে তাদেরকে *যাকাত* ও *জিহাদ* হতে মুক্তি দেয়ার আবেদন করে। রাসূল (সা) তাতে রাযী হন। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছেন, "তারা ইসলাম কবুল করবে, *যাকাত* দেবে ও *জিহাদেও* শরীক হবে।"[৫৫] তারা রাসূল (সা) এর কাছে ওযু না করা ও উত্তেজনাকর পানীয় পানের সুযোগ দিতে অনুরোধ করে এবং আবু বকরা আল সাকাফিকে ফেরৎ দিতে অনুরোধ করে। রাসূল (সা) তাদের এ সব অনুরোধের কোনটিই রাখেননি।[৫৬]

তাদের মধ্যে উসমান ইবনে আবুল আস কুরআন শিক্ষা ও ধর্ম জানার বিষয়ে সবচেয়ে বেশী উৎসাহী ছিলেন। রাসূল (সা) তাকে তায়েফের *আমীর* নিযুক্ত করেন। তিনি তাদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোট ছিলেন।[৫৭]

সাফিকের প্রতিনিধি দলটি ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল (সা) কে ধর্ম সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করে। তারা সাহাবীদেরকেও কুরআন কিভাবে বিভিন্ন ভাগে (*আহজাব*) ভাগ হয় জিজ্ঞাসা করলো, "তোমরা কুরআনকে কিভাবে ভাগ করে থাক?" সাহাবী উত্তরে বললেন, প্রথম হিজব্-এ তিন সূরা, দ্বিতীয়টিতে পাঁচ, তৃতীয়টিতে সাত, চতুর্থতে এগার, পঞ্চমটিতে তের, ষষ্ঠটিকে বলা হয় *হিজব আল মুফাজ্জাল; এটি সূরা কাফ* থেকে কুরআনের শেষ পর্যন্ত।"[৫৮] কুরআনের এ বিভক্তিকরণই আজও বহাল আছে, রাসূল (সা) এর সাথে সাক্ষাতে তারা প্রভাবিত হয়, সাহাবীদের সাথে মিশে এবং মুসলমানদের সাথে আলাপ আলোচনায় এতই খুশি হয় যে, তারা রমাযানের অবশিষ্ট দিনগুলোতে নিজেরাও রোযা রাখে।[৫৯]

প্রতিনিধি দলটি মদীনায় পনের দিন থাকার পর তায়েফে ফিরে যায়। আবু সুফিয়ান ইবনে হারব এবং আল মুগিরা ইবনে শুবাহ আল সাকাফি তাদের সাথে *লা'ত* মূর্তি ধ্বংস করতে যান। ইবনে ইসহাক এর বর্ণনায় লা'ত ধ্বংস ও এর চারপাশে সাকাফি মহিলাদের জড়ো হওয়ার বিষয়টি জানা যায়। আল মুগিরা কর্তৃক পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলা ও তার স্বর্ণ ও আকিক মণি নিয়ে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত মহিলারা কেঁদেছিল।[৬০] তায়েফের লোকেরা ভাবলো *আল লা'ত* তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। আল মুগিরা তাদেরকে নিয়ে তামাসা করলেন। তিনি তার কুড়ালটি ফেলে দিয়ে চলে গেলেন। লোকজন বললো, "মহিলাটি নিজেই নিজের উপর প্রতিশোধ নিয়েছে।" আল মুগিরা তাদের কথায় হাসলেন আর তাদেরকে এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনতে বললেন। তিনি আবার ফিরে অবশিষ্ট মূর্তিগুলো ধ্বংস করে ফেললেন। এতদিন ধরে যে *লা'তের* তারা পূজা করে আসছিল তাকে এভাবে ধ্বংস করে ফেলা হয়।

এ অভিযান হতে প্রাপ্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইনের বিবরণ দেয়া হলো, বিধান রচনার তারিখের বিশ্লেষণে কুরআনের আয়াতের বাতিল হওয়ার জ্ঞাতব্য বিষয়টি অনেক কল্যাণের বিষয় *(আল নাসিখ ওয়াল মানসুখ)*। এর ফলে যেখানে বিভ্রান্তি রয়েছে সে অবস্থার কোন বর্ণনা গ্রহণযোগ্য তা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে। কোন আইন কোন পরিস্থিতিতে জারী হয়েছে বিধান ঘোষণার পরিস্থিতি থেকে তা জানা যাবে।

হুনাইন ও তায়েফের অভিযান থেকে প্রাপ্ত বিধান

০১. "নারীর মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। তোমাদের জন্য ইহা আল্লাহর বিধান" (৪:২৪), এ *আয়াত* আওতার দিবসে নাযিল হয়। বিবাহিতা নারী বন্দীদের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়। নারীদের বন্দীদশা তাদেরকে তাদের স্বামীদের থেকে বৈধভাবে আলাদা করে দেয়। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তাদের সাথে যৌন সংসর্গ করা জায়েয যদি তারা *ইদ্দত* পালন করে থাকে, তারা গর্ববতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসবের পর, বা তারা গর্ববতী না হয়ে থাকলে রক্তঃস্রাব হওয়ার পর।[৬১]

০২. সম্পর্কহীন নারীর সাথে নপুংশক পুরুষের সম্পর্ক স্থাপনে বিধি নিষেধ ঃ নপুংশক পুরুষের নারীর প্রতি কোন আসক্তি না থাকার কারণে এটিকে *জায়েয* করা হয়েছে। তায়েফের অবরোধের পূর্বে এ নিষেধাজ্ঞাটি জারী করা হয়। রাসূল (সা) জনৈক নপুংশক পুরুষের কাছে বাদিয়া বিনতে গাইলান আল সাকাফী'র বর্ণনা শুনতে পান। এ নিষেধাজ্ঞা ইসলামী সমাজের স্বার্থে জারী করা হয়।[৬২]

০৩. মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে এরূপ অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে নারী-শিশু-পুরুষ ও ভাড়াটে শ্রমিক লোকদের হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়।[৬৩]

০৪. অমুসলিম ভূ-খন্ডে *(দার আল হারব) হাদ্দ* ধরনের শাস্তি প্রদান। এ ধরনের শাস্তি রাসূল (সা) হুনাইন দিবসে এক মদপানকারীকে অমুসলিম ভূ-খন্ডে দিয়েছিলেন।[৬৪]

০৫. *মুশরিকদের* কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ, এরূপ এক ঘটনায় রাসূল (সা) সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার কাছ থেকে ফেরৎ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অস্ত্র সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। ঈমান আনয়ন করলেই কেবল *মুশরিকদের* কাছ থেকে এরূপ সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে। *মুশরিকদের* যুদ্ধে বদলী হিসাবে নেয়া যাবে না, তাদের থেকে কোন অরিয়েন্টেশন নেয়া যাবে না, কারণ ইসলামের নির্দেশনা সবার উর্ধ্বে।[৬৫]

০৬. যাদের অন্তরে ইসলামের জন্য ভালবাসা পয়দা করতে হবে তাদেরকে গণিমতের কিছু অংশ দেয়া যাবে, সরকার প্রধান বা আমীর কাউকে ইসলামে আনার জন্য বা কাউকে মুসলমানদের ক্ষতি করা থেকে বিরত রাখার জন্য গণিমতের কিছু অংশ দান করে দিতে পারে। আনাস ইবনে মালিক বলেন, "মানুষ পার্থিব কারণেই ইসলাম কবুল করে থাকে কিন্তু যখন তারা ইসলামে দীক্ষিত হয় তখন তার কাছে ইহা পৃথিবী এবং পৃথিবীর মধ্যে যা আছে তার চেয়ে বেশী প্রিয় মনে হয়।[৬৬]

০৭. *আল যারানা* হতে *উমরাহ* পালনের বিধি চালু হয়।

পাদটীকা ঃ

১. আল বায়হাকী, *আল সুনান আল কুবরা*, ৯/৮৪; *দালাইল আল নবুয়্যা*, ৩/৪৭বি, উভয় সূত্রই মুরসাল। বায়হাকির দু'টি সনদে একজনের কোন জীবন বৃত্তান্ত পাওয়া যায়নি। উরওয়ান বর্ণনা তিনি আবু আলাথা মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে খালিদ এবং মূসা ইবনে উতবার বর্ণনায় তার নাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইতাব।

২. আল তাবারি, উরওয়ার *হাসান সনদসহ; সূত্রটি মুরসাল* (তারিখ আল রাসূল ওয়াল মুলক, ৩/৮২)।

৩. ইবনে ইসহাক (আল বায়হাকি, *দালায়েল আল নবুওয়্যা*, ৩/৪৬৯)। *সীরায়* তিনি বলেন, "কুড়িটি বেজোড় রাত্রি" (*সীরাত ইবনে হিশাম*, ২/৪৭৮-৪৮৩)

৪. আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর ইবনে হাযন হতে ইবনে ইসহাকের *মুরসাল* বর্ণনা এবং আবদ আল্লাহ ইবনে আল আকরাম হাসান সনদ সহ তাদেরই প্রদত্ত সূত্র (আল বায়হাকি, দালায়েল আল নবুওয়্যা, ৪/৩৫৬)।

৫. *মুসলিম, সহীহ*, ২/৭৩৬; *আহমাদ, আল মুসনাদ*, ৩/১৫৭। ইমাম আহমাদ হতে হাদীস বর্ণনার পর ইবনে কাসির বলেন যে, বর্ণনাকারী আল সামিত কত সময় ধরে অবরোধ স্থায়ী হয় তার ব্যাপারে বিভ্রান্ত ছিলেন। (আল *বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৪/৩৫৬)

৬. ইবনে হিশাম, *আল সীরাহ*, ২/৫০০; ইবনে হাযম, যওয়ামী *আল সীরাহ*, ২৪৮, ইবনে হাযম জোর দিয়ে বলেন যে, অবরোধটি ১৩ থেকে ১৮ রাতের মধ্যে সংগঠিত হয়, দেখুন, ২৪৩, ২৪৮)।

৭. ইবনে ইসহাক, *সীরাত ইবনে হিশাম*, ২/৪৭৮, ৪৮৩। দূরত্বের সংজ্ঞার জন্য দেখুন, আল বালাদি, *মু'যাম আল মা'লিম আল যুগরাফিয়্যা*, ২৫৪; নাসব আল হারব, ৩৯, ২২৫; আল হারবি, *কিতাব আল মানাসিক*, হামাদ আল জাসিরের পাদটিকা, ৩৫৩।

৮. ইবনে ইসহাক *সীরাত ইবনে হিশাম*, ২/৪৭৮।

৯. আল বালাদি, *মু'যাম আল মা'লিম আল যুগরাফিয়্যা*, ২১৩,২১৪, ৩১৬।

১০. ইবনে ইসহাক *সীরাত আল হিশাম*, ২/৪৭৮-৪৮৩, ট্যাঙ্ক সম্পর্কে দেখুন, মাহমুদ শিত খাত্তাব, *আল রাসূল আল কায়েদ*, ২৫৪।

১১. আল হারবি, *কিতাব আল মানাসিক*, পাদটীকা হামাদ আল যাসির, পৃ. ২৮৫

১২. একটি লম্বা, শক্ত বিমের সাহায্যে তৈরী দু'চাকার যানে স্থাপিত গুলতি (*মানযানিক*)। এর মাথায় ছিল দড়িতে পেচানো পুলি। দড়ির এক প্রান্তে থলির মাথায় একটি জাল, এর মধ্যে পাথর বা দাহ্য পদার্থ রাখা হতো। এগুলো দড়ির সাহায্যে নিক্ষেপ করা হতো। থলির মধ্যে যা কিছুই রাখা হতো তা বিস্ফোরিত হয়ে দেয়ালের উপর পড়তো, এতে মানুষসহ অন্য জীবজন্তু মরতো বা পুড়ে যেত। মাহমুদ শিত খাত্তাব, *আল রাসূল আল কায়েদ*।

১৩. ইবনে ইসহাক, *সীরাত আল হিশাম*, ২/২৭৮; আল তাবারি, *তারিখ*, ২/৩৫৩, কায়রো সংস্করণ।

১৪. আবু দাউদ *আল মারাসিল*, ৩৭, মাখুলের *সহীহ সনদ* ও তার *মারাসিল* হতে, আরেকটি সনদ ইবনে আব্বাসের ইকরিমাহ তথা *মওলা* হতে। ঈমাম আল শাফি এটিকে প্রমাণ হিসাবে নিয়েছেন (আল উম্ম, ৪/১৬১)

১৫. আল ওয়াকিদি, *আল মাগাযি*, ৩/৯২৭, ৯২৩। তিনি বলেন, রাসূল (সা) এর নির্দেশে আল তুফাইল ইবনে আমর আল দওসি জুল কাফ্ফায়েন নামের এক মূর্তির কাছে এটি ধ্বংস করেন। এরপর তিনি ৪০০ লোকবলসহ তায়েফে মুসলমানদের সাথে যোগ দেন। তাদের "ট্যাংক" ও গুলতি ছিল।

১৬. আল বায়হাকি, *আল সুনান আল কুবরা*, ৯/৪৮, মূসা ইবনে উকবা ও উরওয়াহ উবনে যুবাইর এর *মুরসাল* হতে। সনদটি তাদের উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, তাছাড়া এর সাথে একজন বর্ণনাকারী রয়েছে যার জীবন বৃত্তান্ত আমি পাইনি। ইবনে ইসহাক আমির ইবনে শুয়াইবের মারাসিল হতে। আরও দেখুন, আল শাফিঈ, *আল উম্মা*, ৭/৩২৩

১৭. আবদ আল রায্যাক, *আল মুসান্নাফ*, ৫/৩০১; ইবনে হাযার *ফাতহুর বারি*, ৮/৪৬; ইবনে সা'দ, আল তাবাকাত, ২/১৫৮-৯; আল তাবারানি (আল হায় সামি, *মাজমা আল জাওয়াইদ*, ২/২৪৫। তিনি বলেন, "এর বর্ণনাকারী ব্যক্তি সহীহ")। ঘটনা হলো দাসগণ নেমে এলো, যারা এটি করেছে *সহীহ* আল বুখারীতে এটি প্রমাণিত (৫/১২৯), তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে কিনা তার উল্লেখ করা হয়নি।

১৮. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ২/৪৮৫; ইবনে সা'দ, আল তাবাকত ২/১৫৯; আহমাদ *আল মুসনাদ*, ১/২৩৬, ২৪৩, ২৪৮। এটি সাদুক আল হায্যায ইবনে আরতাহ এর উপর ভিত্তি করে প্রণীত হলেও এটা মুদাল্লিস এবং এর দ্বারা *আনানাহ* করা হয়ে থাকে।

১৯. *হাদীস* :, যেই তীর নিক্ষেপ করুক তার অবস্থান *জান্নাতে*। তায়েফ অবরুদ্ধের ঘটনার সাথে এটি বলা হয়, এটি *সহীহ*, আহমাদ, *আল মুসনাদ*, ৪/১১৩, ৩৮৪; কাতাদা আল বায়হাকিতে স্পষ্টভাবে *হাদীস* ঘোষণা করেছেন, *আল সুনান আল কুবরা*, ৯/১৬১

২০. *সহীহ আল বুখারী*, ৮/২০, ৯/১১৩।

২১. ইবনে ইসহাক *সনদ* ছাড়া তাদের নাম বলেন। *সীরাত ইবনে হিশাম*, ২/৪৮৬-৭।

২২. আবু দাউদ, *আল মারাসিল*, ৪৮, ইকরিমা'র *মুরসাল হাদীস* হতে; আল ওয়াকিদি, *আল মাগাযি*, ৩/৯২৬, ৯২৯-৩০।

২৩. *সহীহ আল বুখারী*, ৫/১২৮, ৯/১১৩

২৪. আল তিরমিযী, *সুনান*, ৩/৩৮৫-৬। তিনি বলেন, "এটি *হাসান সহীহ গরিব*।" আল আলবানির মতে মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী এটি *সহীহ*, এটি বর্ণনাকারী আবু আল জুবায়ের'র আনানা'র জন্য নয়। তিনি ছিলেন *মুদাল্লিস*। আল গাযালি ঃ *ফিকহ আল সীরাহ*, (৪৩২)

২৫. *সহীহ আল বুখারী*, ৫/১২৮, ৯/১১৩

২৬. আল হাকিম, *আল মুসতাদরাক*, ২/১২১। তিনি বলেন "মুসলিমের শর্ত অনুসারে এটি *সহীহ*, যদিও তারা এটির বর্ণনা করেন নি। এ ব্যাপারে আল যাহাবি কিছু বলেননি।

২৭. *সহীহ আল বুখারী*, ইবনে হাযার, *ফাতহুর বারি*, ৮/৩২ এক বর্ণনায় বর্ণিত হয় যে, মেয়াদটি ছিল ১৩ রাত।

২৮. *সহীহ* মুসলিম ২/৭৩৭; আহমাদ *মুসনাদ*, ৩/২৪৬; ইবনে হাজার বলেন, "এর সনদ মুসলিমের শর্ত অনুসারে," *ফাতহুর বারি*, ৮/৫০। *সহীহ আল বুখারী*, ২/১০৪; ৪/৫, ৭৩; ৮/৭৯।

২৯. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ২/৪৯২-৩, সনদ ব্যতীত; আল জারকানি, *শারহ্ মাওয়াহিব আল লাদুন্নিয়্যা*, ৩/৩৭; ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারি*, ৮/৪৮।

৩০. প্রাগুক্ত, ২/৪৯৪-৬।

৩১. ইবনে হাজম *যাওয়ামী আল সীরাহ* ২৪৮।

৩২. *মুসলিম, সহীহ*, ৪/১৮০৬।

৩৩. প্রাগুক্ত।

৩৪. ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারি*, ৩/৩৩৬, আল বুখারীতে ও হাদীসটি দেখুন, ২/১০৪, ৪/৫, ৭০, ৮/৭৯, মুসলিম, ২/৭১৭।

৩৫. *সহীহ আল বুখারী*, ২/১০; ৪/৭৪; ৯/১২৫-৬

৩৬. ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৮/৫৩, আল বুখারীর এক বর্ণনা হতে।

৩৭. *সহীহ আল বুখারী*, ১/১১; ২/১০৫-৬; *মুসলিম, সহীহ*, ১/১৩২-৩; ২/৭৩২-৩।

৩৮. *সহীহ আল বুখারী*, ৪/৭৪, ১৪৫, ৫/২৬, ২৮, ১৩০, ১৩১; ৭/১৩৩; ৪/১৩০; ৯/১০৬; *মুসলিম, সহীহ*, ২/৭৩৩-৬।

৩৯. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ৩/৬৭, ৭৬-৬, সনদ সহকারে ইবনে ইসহাক হতে, এটি *হাসান লি যাতিহি*।

৪০. ইবনে ইসহাক *হাসান সনদসহ*কারে তার নাম বলেন যেমন করেন গুর খুয়াসিরাহ আল তাসিসি (*সীরাত আল হিশাম*, ২/৪৯৬)।

৪১. *সহীহ আল বুখারী*, ৪/৭২; ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৮/৬৮; ১২/২৯১; ২৯৩।

৪২. সহীহ মুসলিম ২,৭৪০, দেখুন, ইবনে ইসহাকের বর্ণনা (*সীরাত ইবনে হিশাম*, ২/৪৯৬)। আল হাফিয ইবনে হাযার বলেন, "এতে মনে হয় মানুষটি দুবার বিতরণের ব্যাপারে অভিযোগ করে। হুনাইনের গণিমত ভাগ করে দেয়ার পরে আলী কিছু স্বর্ণ সরাসরি হুনাইনের পরে বিতরণ করে দিয়েছিলেন।" ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৮/৬৯; ১২/৯১, ১৯৩।

৪৩. ইবনে ইসহাক, একটি সনদসহ যা *হাসান লি জাতিহি* (*সীরাত ইবনে হিশাম*, ২/৪৮৮-৪৯০)। আল গাযালি, *ফিকহ আল সীরা*, পৃ. ৪২৬, শায়খ আল আল বানির পাদটীকাসহ।

৪৪. *সহীহ আল বুখারী*, ৪/৫৯।

৪৫. *সূরাত্ আত তাওবাহ*, ৯ : ৯৭, ৯৮।

৪৬. *সহীহ আল বুখারী*, ৩/১৬৫।

৪৭. প্রাগুক্ত, ৩/৮৭।

৪৮. ইবনে হিশাম, ২/৪৮৮-৯০, ৪৯২, সনদ সহকারে যা *হাসান লি যাতিহি*, ইবনে ইসহাক যাকে স্পষ্টভাবে *তাহদিস* বলেছেন। আরও দেখুন, আল মুসনাদ, ২/১৮৪; আবু দাউদ, *সুনান*, ৭/৩৫৯; আল নিসাঈ, *সুনান*, ৬/২২০; আল হায়সামী, মাজমা আল যাওয়ায়িদ, ৬/১৮৭-৮।

৪৯. ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৪/৩৫৪-৫; ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারি*, ৮/৩৩-৪।

৫০. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ২/৪৯০-২।

৫১. ইবনে ইসহাক, *সনদছাড়া* (*সীরাত ইবনে হিশাম*, ২৫৩৭-৮)। মূসা ইবনে উকবা তার সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন এবং বলেন জনগণের সাথে আবু বকরের হাজ্জ যেমন দেরী হয়েছিল উরওয়ার ইসলাম গ্রহণও দেরীতে হয়েছিল। আবু বকরের হাজ্জ সম্পন্ন হয় ৯ হিজরীতে, ইবনে কাসির মনে করেন। ইবনে ইসহাকের বর্ণনা বেশী কাছাকাছি। *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৫/২৯।

৫২. আবু ওবায়েদ, *আল আসওয়াল*, ২৪৭, এবং ইবনে জানযাওয়ে, *আল আসওয়াল*, ৪৪২। উভয়েই দীর্ঘ পত্রের কথা বলেন আর বলেন যে, পত্রটি রাসূল (সা) সাকিফকে লিখেছিলেন। বিবরণটি উরওয়া ইবনে যুবাইর'র মুরসাল হতে গৃহীত, নাহিয়ার কারণে এর সনদের মধ্যে কিছু দুর্বলতা রয়েছে।

ইবনে ইসহাক বলেন, সনদ ছাড়া পত্রটির অংশ যেটি ওয়াদি ওয়াযের তাহরিমের সাথে সংশ্লিষ্ট (*সীরাত ইবনে হিশাম*, ৪/২০০)। আল ইমাম আহমাদ আল মুসনাদে এটির বর্ণনা করেন। ১/১৬৫; আবু দাউদ এটি হাদীস হিসাবে তার *সুনানে* বর্ণনা করেন, তিনি আবার এটি নেন আল আওয়াম হতে, ওয়াযেযর তাহরিম সম্পর্কে। আল যুবাইর বলেন, *তাহরিম* অনুষ্ঠিত হয় আল তায়েফের অবরোধের পূর্বে। *আল বুখারীর* মতে মুহাম্মদ ইবনে আবদ আল্লাহ ইবনে ইনসান আল তায়েফিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এটির বর্ণনা করেন। আবু হাতিম বলেন, "তার সূত্র শক্তিশালী নয়, তার হাদীস সতর্কতার সাথে গ্রহণ করতে হবে।" ইবনে হিব্বান *সিকাতের* মধ্যে তার বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত করেন (তাহজীব আল *তাহযীব*, ৯/২৪৮)। *আল তাগরীবে* আল হাফিয ইবনে হাজার বলেন, "তিনি নমনীয়।" আল বুখারী তার পিতা হতে বলেন, তার হাদীস *সহীহ* নয়, ইবনে হিশাম তাকে *সিকাতের* অন্তর্ভুক্ত করেন এবং বলেন, "তিনি ভুল করেন।" আল যাহাবি এর উপর বলেন, এবং বলেন, "আল হাফিয কেবল একজন বর্ণনাকারীর ব্যাপারে বলতে পারেন যিনি অনেকগুলো *হাদীস* বর্ণনা করেন।" আবদ্ আল্লাহ'র কেবল এ হাদীসে রয়েছে। তিনি যদি এর মধ্যে ভুল করে থাকেন তা হলে তিনি কিছু সঠিক কোথায় করেছেন? "(*তাহযীব আল*

তাহযীব, ৪/১৪৯), *আল খিলাল ফি আল ইলাল* এর মতে আহমাদ তাকে *যয়িফ* বলেছেন। আল শাফিঈ তার *হাদীসকে সহীহ* বলেছেন এবং এটিকে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। আল-যাহাবী, *মিযান আল ইতিদাল*) আল শায়েখ আহমাদ শাকির *হাদীসটিকে সহীহ* বলেছেন। (*আল* মুসনাদ, হাদীস এর ২৭৬), তবে একটি *হাদীস সহীহ* হওয়ার ব্যাপারে তিনি নমনীয় ছিলেন, এবং ইমাম আল শাফিই *হাদীসটিকে* সহীহ হওয়ার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর নির্ভর করেছেন। এটি সুবিদিত যে, আল ঈমান আল শাফিঈ এর চেয়ে ঈমান আল বুখারী আহমাদ ও আবু হাতিমের চেয়ে বেশী বিশেষায়নকৃত। তার বিশাল যোগ্যতা সত্ত্বেও হাদীসটি সহীহ নয়। পুরনো *মাযহাবে (আল কাদিম)* ঐ হাদীসের উপর আল ঈমাম আল শাফিঈ নির্ভর করেছেন। তার নতুন *মাযহাবে (আল জাদিদ)* এরূপ করেন নি। এরপরও তার মতামত বেশীর ভাগ মতামতের সাথে একরূপ, ওয়ায্‌যকে পবিত্র স্থান হিসাবে (*হারাম*) মনে করা হতো না। (আল যারকানি, *শারহ আল মাওয়াহিব আল লাদুনিয়্যা,* ৪/১০) আমি মনে করি *হাদীসটিকে* তিনি দুর্বল মনে করেছেন।

আল খাত্তাবি বলেন, "ওয়ায্‌য কে তার পবিত্র স্থান হিসাবে ঘোষণা করার ব্যাপারে আমি কোন কারণ দেখছি না এটি যদি নিরাপত্তা ও মুসলমানদের কোন উপকারে না আসে। *তাহরিম* কোন বিশেষ ও নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য হওয়ার বিষয়টি সম্ভব হতে পারে, এরপর এটি বাতিল করা হয়।" আল খাত্তাবি বলেন, তায়েফ অবরোধ কালে মুসলিমরা এর গাছপালা, খেলাধুলা, বিভিন্ন স্থানের সুযোগ সুবিধা লাগায়। এটি হারাম ছিলনা (*মুখতাছার সুনান আবু দাউদ লি আল মুনযিরি,* ২/৪৪২)

এ দীর্ঘ পাদটীকা সংযুক্ত হয়েছে এ কারণে যে, নাহয় শর্‌ই রাজনীতির ব্যাপারে রাসূল (সা) এর পত্রের উপর নির্ভর করবে, বিশেষ করে কিছু অধুনা গবেষক এ দলিলের উপর নির্ভর করেছেন এবং তারা মনে করেছেন যে, রাসূল (সা) ওয়ায্যে'র তাহরিমে সাকিফদের জন্য অপেক্ষা করেছেন; ওয়ায্‌যকে তারা সম্মান করত বলে। আওন আল শরীফ কাসিস, *নাশাত আল দওলা আল ইসলামিয়্যা* (The Emergence of the Islamic State), ১৩৭

৫৩. ইবনে ইসহাক, *সীরাত ইবনে হিশাম* ৪/৫৩৮-৪০, *মু'যাল সনদ সহ* আল গাযালী, *ফিকহ্ আল সীরাহ,* আল আলবানির পাদটীকাসহ, পৃ. ৪৫০।

৫৪. আবু দাউদ, *সুনান*, ২/১৪৬ এর সনদ হলো *হাসান লি যাতিহি*।

৫৫. আহমাদ *মুসনাদ*, ৪/১৬৪। আল হায়সামি বলেন, "এর বর্ণনাকারী ব্যক্তিগণ *সিকাহ*।" *মাযমা আল জাওয়ায়িদ*, ৪/২৪৫।

৫৬. আহমাদ মুসনাদ, ৪/২১৮; ইবনে মাযাহ, ১/৩১৬, আরও দেখুন, *মুসলিম, সহীহ,* ১/৩৪২, এখানে তিনি বলেছেন যে, উসমান ইবনে আবুল আসকে *আমির* নিযুক্ত করা হয়েছিল।

৫৭. আহমাদ *মুসনাদ*, ৪/৯, ৩৪৩; আবু দাউদ, *আল সুনান*, ১/৩২১-২; ইবনে মাযাহ, *আল সুনান* ১/৪২৭-৮। হাদীসটি উসমান ইবনে আবদুল্লাহ হতে আবদুল্লাহ ইবনে আবদ আল রহমান আল তায়িফি কর্তৃক বর্ণিত। এটিকে হাসান স্তরে উন্নীত করার জন্য সুতাবা'তকে শক্তিশালী করতে হবে। এর কারণ আল তায়িফি *সাদুক* তবে তিনি ভুল করেন ও বিভ্রান্ত হন। ইবনে হাজার *আল তাকরিক*, ২/১১; *মিযান আল ইতিদাল*, ৩/৪৩)।

৫৯. ইবনে হিশাম, *আল সীরাহ*, ২/৫৪০-১। এর সনদে রয়েছে ইসা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মালিক যাকে ইবনে হাজার *মকবুল* বলেছেন (তাকরিব, ২/৯৯)।

৬০. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ২/৫৪১-২, সনদ ছাড়া ইবনে ইসহাক হতে। ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৫/৩৩-৪, সনদ ছাড়া মূসা ইবনে উকবাহ্ হতে।

৬১. *সাহাব আন্ নযুল*-এর জন্য দেখুন *শারহ আল নওয়ায়ী আলা মুসলিম, সহীহ*, ৩/৬৩৭। আল মুবারকপুরি, *তুহফাত আল আহওয়াযি*, ৪/২৮২; *আওন আল মাবুদ*, ৬/১৯১, ১৯৩; ইবনে কাসির, *তাফসীর*, ১/৪৭৩।

৬২. *সহীহ আল বুখারী*, ৫/১২৮; ৭/৩৩, ১৩৭। *সহীহ* মুসলিম।

৬৩. আহমাদ, *আল মুসনাদ*, ৩/৪৮৮, *হাসান সনদসহ* (*ইরওয়া আল গালিল*, ৫/৩৫)। আল হাকিম, *আল মুসতাদরাক*, ২/১২৩। আল বায়হাকি, *আল সুনান আল কুবরা*, ৯,১৩০। আল হাকিম এটিকে *সহীহ* বলেছেন, আল যাহাবি তাঁর সাথে একমত। আরও দেখুন, আল আলবানি, *ইরওয়া আল গালিল*, ৫/৩৫-৬; ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৬/১৪৭-৮।

৬৪. আবু দাউদ, সুনান, ১২/১৯৬-৭; আহমাদ *আল মুসনাদ* ৪/৩৫০; আল দারাকুতনি, *সুনান*, ৩/১৫৭-৮; আল শওকানি, *নায়েল আল আওতার*, ৭/১৪৫। এর সনদ হলো আবদুল্লাহ ইবনে আবদ আল রহমান ইবনে আযহার। তিনি *মকবুল* (*তাগরির*, ১/৪২৭)।

৬৫. ইবনে কাইয়্যিম। জা'দ *আল মা'দ* ৩/৪৭৯; আল কুরতুবি, *আল যামিলি আল তালখিস আল হাবির*, ৪/১০০-১০১। ইবনে হাজার উল্লেখ করেন : "মুশরিকদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া আপাত দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ মনে করেন, এর পর এটিকে জায়েয করা হয়। আল" শাফিঈ এরূপই বলেন।

৬৬. *সহীহ* মুসলিম ৪/১৮৬।

অধ্যায় ১৭

তাবুক অভিযান

তায়েফ[১] অবরোধের ছয় মাস পর হিজরীর নবম সনের গ্রীষ্মে রজব মাসে তাবুক অভিযান পরিচালিত হয়। ঐতিহাসিকগণ প্রথা অনুযায়ী তাবুক অভিযানের সরাসরি কারণটি খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেন। ইবনে সা'দের মতে হেরাক্লিয়াস বাইজেন্টাইন বাহিনীর সমাবেশ ঘটান। হেরাক্লিয়াসের আরব বন্ধুরাও এ সমাবেশে ছিল। মুসলমানগণ এ খবর শুনে তাবুকের[২] দিকে রওয়ানা দেন। আল ইয়াকুবের মতে যাফর ইবনে আবু তালিবের প্রতিশোধ গ্রহণের বিষয়টিই হল তাবুক[৩] অভিযানের আসল কারণ। জিহাদের অবশ্য কর্তব্যের অংশ হিসাবেই এ অভিযান। আল হাফিয ইবনে কাসির *জিহাদ* সম্পর্কে শুনে বলেছিলেন, "রাসূল (সা) (ভৌগোলিক ভাবে) কাছে হওয়ার কারণে বাইজেন্টাইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেন। ইসলাম ও মুসলমানদের কাছে হওয়ার কারণে বাইজেন্টাইনের লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া জরুরী হয়ে পড়েছিল।" এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

> হে মুমিনগণ, যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখুক। জেনে রাখ আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন। (৯ : ১২৩)[৪]

মুসলমানদেরকে মদীনা ছেড়ে বাইজেন্টাইনীদের মোকাবেলা করতে হবে। ইহুদীরা মুসলমানদেরকে তাবুক যেতে পরামর্শ দিয়েছিল, পুনরুত্থান দিবসে এবং রাসূল (সা) এর দেশে মৃতদেরকে জমায়েত করা হবে- এ জাতীয় বক্তব্য মিথ্যারই নামান্তর। এটা বলাও অসত্য হবে যে,

> ... তারা তোমাকে দেশ হতে উৎখাত করার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল, তোমাকে সেখা হতে বহিষ্কার করার জন্য ..." (১৭ : ৭৬)

এ ব্যাপারে আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন। এ বক্তব্যগুলো *মুরসাল ও যয়িফ*। তাছাড়া কুরআনের এ আয়াতটি মক্কায়[৫] নাজিল হয়েছে এ মর্মেও বিষয়টির খন্ডন করা হয়েছে। এর আগের মুহূর্তের অভিযানের চেয়ে এ অভিযানটি ছিল আলাদা। এ অভিযান পরিচালিত হয় বাইজেন্টাইন ও আরব খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে। অন্য অভিযানগুলো পরিচালিত হয় ইহুদী ও আরব *মুশরিকদের* বিরুদ্ধে।

খ্রিস্টবাদ তার নিজস্ব চেতনা ও শিক্ষা হারিয়ে ফেলেছে। তারা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে যে ভেদাভেদ তা তাদের যীশুর উপর বিশ্বাসকে ঘিরে। খ্রিস্টানদের অনেকেই ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী (পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা), যীশুর ব্যক্তিত্বের মধ্যেকার স্বর্গীয় ও মানবিক প্রকৃতির অভিন্নতায় বিশ্বাসী। কোন কোন খ্রিস্টানের মতে যীশুর মাত্র স্বর্গীয় প্রকৃতিই ছিল; মূলত ঃ সিরিয়া ও মিশরের ইয়াকুবের

বংশধর। খ্রিস্টানরা তাদের এ সবের ব্যাপারে সম্মেলন করে। হেরাক্লিয়াস রোমান সাম্রাজ্যের সংহতির জন্য ধর্মের দল উপদলের মধ্যে আপোষের চেষ্টা করেন। কিন্তু তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। রোমান সম্রাট ইয়াকুবের অনুসারী সিরিয়া ও মিশরের লোকদেরকে নির্যাতন করে। এর ফলে মুসলমানদের অনেক ধর্মীয় নেতা দেশ থেকে বহিস্কৃত হন। অনেকে পালিয়ে যান।

ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি দুর্নীতি সীমাবদ্ধ থাকেনি। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের উপর অর্পিত করের বোঝা, জনগণের মধ্যে শ্রেণী চেতনা মানুষকে বিভিন্ন পদ মর্যাদায় ভাগ ভাগ করে ফেলে। সারা দেশেই এ অবস্থা চলতে থাকে। সে জন্য খ্রিস্টান আর বহুইশ্বরবাদীর মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। কিতাবীদেরকে যুদ্ধে (জিহাদ) নিয়োজিত করার জন্য মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। যেভাবে মুসলমানদেরকে জিহাদে শরীক করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তেমনি মুসলমানদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে খ্রিস্টানদেরকে তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়া হয়। খ্রিস্টানদেরকে সামরিক অব্যাহতিও দেয়া হয়। পৌত্তলিকদের কাছ থেকে কোন জিয্‌য়া নেয়া হতো না। যারা ইসলাম গ্রহণ করতো আর যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে যাদের কে অব্যাহতি দেয়া হয় তারাই এ সুবিধা ভোগ করে।

> যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌য় ঈমান আনেনা ও পরকালেও নয় এবং আল্লাহ ও তার রাসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে *জিয্‌য়া* দেয়। (৯:২৯)

আরব উপদ্বীপে পৌত্তলিকতা ধ্বংসের পর, কিতাবীদের বহিষ্কারের পর মুসলিমরা একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। অর্থ্যাৎ এভাবে মুসলিমরা খ্রিস্টানদের মোকাবেলা করে।[৬] এটাই ছিল তখনকার ইসলামের প্রকৃতি ও মুসলমানদের জীবনের লক্ষ্য। তাবুক অভিযানে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

তাবুকের অবস্থান হিযাযের উত্তরে, মদীনার ৭৭৮ কি মি দূরে আধুনিক সড়কের পার্শ্বে। তাবুক তখন ছিল বাইজেন্টাইনের অধীনস্ত একটি শহর। রাসূল (সা) এটিকে তাবুক বলতেন।[৭] এটিকে কষ্টের অভিযান (*গাজওয়া আল উমরাহ*) বলা হতো। তাবুক অভিযানে রাসূল (সা) যে কষ্টের শিকার হয়েছিলেন সে জন্য তাবুকের এ নামকরণ করা হয়।[৮] কুরআনেও বলা হয়েছে ঃ

> আল্লাহ অনুগ্রহপরায়ণ হলেন এ নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি যারা তার অনুগমন করেছিল সংকটকালে-এমনকি যখন তাদের এক দলের চিত্ত বৈকল্যের উপক্রম হয়েছিল। পরে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করলেন। তিনি তাদের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। (৯:১১৭)।

নেতৃস্থানীয় *তফসীরকার* কাতাদাহ[৯] ও মুজাহিদ বর্ণনাটির ব্যাখ্যা দেন এভাবে "দু'জন একটি খেজুর ভাগ করে খেত, একদল লোক একটি মাত্র খেজুর খেত, এদের

একজন এটি চোষণ করতো, পরে পানি পান করতো, এরপর আরেকজন খেজুরটি চোষণ করতো এবং পানি পান করতো।"[১০] অভিযানের সময়গত কারণেই এ অর্থনৈতিক সংকট হয়েছিল কিনা জানা যায়নি। খেজুরের মৌসুম আর খেজুর বিক্রি সমস্যার কারণেই অর্থনেতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছিল। নাকি অন্য কোন কারণে এরূপ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল তা জানা যায়নি।[১১]

তাবুক অভিযানে সামরিক শক্তি সরবরাহকারী

রাসূল (সা) তাঁর সাহাবীদেরকে সামরিক বাহিনীর উপর ব্যয় করার জন্য বলেছিলেন এবং তাদেরকে আল্লাহর তরফ থেকে বেহেশতের খোশ খবর দিয়েছিলেন। ধনী-গরীব সব সাহাবী রাসূল (সা) এর কথায় এগিয়ে এলেন এবং সামর্থ অনুযায়ী শক্তি বৃদ্ধির কাজে সাহায্য করলেন। তাবুক অভিযানে উসমান ইবনে আফ্ফান সবচেয়ে বেশী ব্যয় করেছিলেন। রাসূল (সা) বলেন, "যে কষ্ট করে সেনাবাহিনীকে সুসজ্জিত করবে সে জান্নাত পাবে।" সেজন্য উসমান সেনাবাহিনীর সুসজ্জিত করণের কাজে ব্যয় করেন।[১২] উসমান এক হাজার দিনার রাসূল (সা) কে দিলেন। রাসূল (সা) বললেন, "ইবনে আফ্ফান আজকের পরে কোন কিছু করলে তার আর কোন ক্ষতি হবে না।" রাসূল (সা) কথাটি বার বার বললেন,[১৩] আবার কতগুলো দুর্বল বর্ণনা থেকেও জানা যায় উসমান সৈন্যবাহিনীর সুসজ্জিত করণের কাজে অন্যভাবেও সাহায্য করেছিলেন। সেনাবাহিনীর জন্য তিনি উটও দিয়েছিলেন।[১৪] উসমান প্রশ্নাতীতভাবেই এগুলো করেছিলেন। উসমানের এসব দানের কথা সাহাবীদের ভালভাবেই জানা ছিল। তাবুক অভিযানে ৩০,০০০ সৈন্যের বাহিনী যোগ দিয়েছিল। উসমান এ বিশাল বাহিনীর সুসজ্জিতকরণে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছিলেন।

আল তাবারি অনেক সনদসহ বর্ণনাগুলোর বর্ণনা দিলেও এগুলোর যে দুর্বলতা ছিল না তা নয়। তবে বর্ণনাগুলোর একটি আরেকটিকে সমর্থন করায় এগুলোকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে জোরালো বর্ণনা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। আবদুর রহমান ইবনে আওফ সামরিক বাহিনীর জন্য দু'শত দিরহাম ব্যয় করেন।[১৫]

গরীব মুসলমানগণ তাদের সাধ্যমত দান করেছিলেন। তারা বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছিলেন। মুনাফিকরা তাদেরকে তাদের দানের ব্যাপারে ঠাট্টা করেছিল। খায়সামা আল আনসারি এক সা' পরিমাণ খেজুর দান করার জন্য এনেছিলেন; মুনাফিকরা তার দৈন্যদশা দেখে তাকে ভর্ৎসনা করলো।[১৬] আকিল আধা সা' পরিমাণ খেজুর দানের জন্য এনেছিলেন, তাঁর এ অবস্থা দেখে মুনাফিকরা বলল, "এ লোকের সাদাকা আল্লাহর দরকার নেই।" তারা বলল, "অন্য সবাই শুধু দেখানোর জন্যই এরূপ করছিল।" আল্লাহ কুরআনে বলেন ঃ

> মু'মিনদের মধ্যে যারা স্বত:স্ফূর্তভাবে সাদাকা দেয় এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে আল্লাহ তাদেরকে বিদ্রূপ করেন; তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (৯:৭৯)।[১৭]

ধনীদেরকে লোক দেখানোর কথা বলে এবং গরীবদের দারিদ্র্যের কারণে ভর্ৎসনা করে মুনাফিকরা।

তাবুক অভিযানের সময় মুনাফিকদের মনোভাব

এ অভিযানের সময় মুনাফিকির বিষয়টি প্রকাশিত হয়। মুনাফিকরা সেনাবাহিনী সুসজ্জিত করার সময় এর বিরুদ্ধে প্রচার যুদ্ধ চালাতে থাকে। তারা জনগণকে এ বলে নিরুৎসাহিত করে, "বেশী তাপমাত্রার মধ্যে বের হয়ো না"। এ সময়ে খুব গরম ছিল। মানুষ গাছের নীচে ছায়া খুঁজছিল। মুনাফিক মুসলমানদের কেউ কেউ রাসূল (সা) তাদেরকে পেছনে থাকতে বলেছেন বলে চালিয়ে দেয়। এর জন্য তারা ভুয়া কারণ দেখায়। আল্লাহ তাদেরকে এরূপ অনুমতি দেয়ার জন্য দোষারোপ করেন ঃ

> আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন। কারা সত্যবাদী তা তোমার নিকট স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কারা মিথ্যাবাদী তা না জানা পর্যন্ত তুমি কেন তাদেরকে অব্যাহতি দিলে?[১৮] (৯:৪৩)

কুরআনে মুনাফিকদের অবিশ্বাস আর মুনাফিকিকে মদীনার মুনাফিকদের চেয়েও খারাপ বলে অভিহিত করা হয়েছে। মুনাফিকদের অন্তর কঠিন, তাদের অন্তর কঠিন ও ইসলামের তেমন জ্ঞান নেই।

> কুফরী ও কপটতায় মরুবাসীগণ কঠোরতর; এবং আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তার সীমারেখা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার যোগ্যতা এদের অধিক। (৯:৯৭)

মুনাফিকদের কপটতা মদীনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না মরুভূমিতেও ছড়িয়ে পড়ে।

> মরুবাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের আশে পাশে আছে তাদের কেউ কেউ মুনাফিক এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও কেউ কেউ, তারা কপটতায় সিদ্ধ। তুমি তাদেরকে জান না; আমি তাদেরকে জানি। আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি দেব ও পরে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে মহাশাস্তির দিকে।

কুরআনে মুনাফিকদের ওযর গ্রহণ না করতে ও তাদেরকে বিশ্বাস করতে নিষেধ করা হয়েছে।

> তোমরা তাদের নিকট ফিরে আসলে তারা তোমাদের নিকট অজুহাত পেশ করবে;
>
> বলো, 'আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের জানিয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্যও করবেন এবং তাঁর রাসূলও। অত:পর, যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তাঁর নিকট তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে। এবং তিনি তোমরা যা করতে; তা তোমাদের জানিয়ে দেবেন।' (৯:৯৪)

কুরআনে তাদেরকে "জঘন্য" বলে (৯:৯৫) অভিহত করা হয়েছে। বিশ্বাসী ও মুনাফিকদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। মুনাফিকদেরকে সেজন্য এরপর থেকে মোকাবেলা করা হয়েছে। মুসলমান আর মুনাফিকদের মধ্যে আচরণের বেলায় কোন ভেদাভেদ করা হলো না। কুরআনে তাদের ত্রুটিগুলোকে প্রকাশ্যে প্রচার করা

হয়েছে। রাসূল (সা) মুনাফিকদের নির্মিত আল যিরারে সালাত পড়া বন্ধ করে দিলেন আর মসজিদটিকে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিলেন। তিনি তাদের মৃতব্যক্তির জানাযা পড়াও বন্ধ করে দিলেন। তবে মুসলমানগণ তাবুক থেকে ফিরে আসার পর আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলু-এর জানাযা পড়েছিলেন। আল্লাহ তাকে এ ব্যাপারে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

> "তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে তুমি কখনো তার জন্য জানাযার সালাত পড়বেনা এবং তার কবরের পার্শ্বে দাঁড়াবে না"[১৯] (৯:৮৪)

মুসলমানদের কিভাবে ক্ষতি করতে পারবে তাদের ছিল সবসময় সে চিন্তা। তাদের সভা-সমাবেশ করার জন্য মুনাফিকরা ঠিক তাবুক অভিযানের পূর্বে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে। তারা মসজিদটি নির্মাণের সময় বলতে থাকে যে, মুসলমানদের জন্য বেশী জায়গা করে দেয়ার জন্য এ মসজিদ নির্মাণ করছে। যারা রাসূলের মদীনার মসজিদে সালাত পড়তেন তাদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে কিছু লোককে তাদের নির্মিত মসজিদে নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। মুনাফিকরা রাসূল (সা) কে তাদের মসজিদে সালাত আদায় করতে বলল। এভাবে তারা মুসলমানদেরকে বিপথে পরিচালনা করতে চাইল। আল্লাহ কুরআনে মুসলমানদেরকে তা করতে নিষেধ করেন আর তাদের মসজিদকে *মসজিদে যিরার* (অসৎ কাজ করার মসজিদ) বলে অভিহিত করা হয় ঃ

> এবং যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতিসাধন, কুফরী ও মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশে এবং ইতোপূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি সংগ্রাম করেছে তার গোপন ঘাঁটি স্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশে, তারা অবশ্যই শপথ করবে, 'আমরা সদুদ্দেশ্যেই তা করেছি'; আল্লাহ সাক্ষী, তারাতো মিথ্যাবাদী। তুমি তাতে কখনও দাঁড়িয়োনা; যে মসজিদের ভিত্তি প্রথমদিন হতেই স্থাপিত হয়েছে তাকওয়ার উপর, তাই তোমার সালাতের অধিক যোগ্য। তথায় এমন লোক আছে যারা পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন। (৯:১০৭-৮)

বেশীরভাগ মুনাফিকই পেছনে থেকে যায়, তারা তাবুক অভিযানে যায়নি। কিছু কিছু মুনাফিক মুসলমানদের সাথে যোগ দেয়, তাদের যোগ দেয়ার জন্য দূত পাঠানো হয়েছিল।[২০] সৈন্য সমাবেশের জন্য যে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল এটা তারই অংশ ছিল। আরব গোত্রের লোকজন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। সূরা তাওবায় এ ব্যাপারে বলা হয়েছে ঃ

> হে মু'মিনগণ, তোমাদের হলো কী যে, তোমাদেরকে আল্লাহর পথে অভিযানে বের হতে বলা হয় তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে ভূ-তলে ঝুঁকে পড়? তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হয়েছ? পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো অকিঞ্চিতকর। (৯:৩৮)

মুজাহিদের মতে তাবুক অভিযান সম্পর্কে কুরআনের এ আয়াত নাজিল হয়েছিল। যখন তাদেরকে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয় তখন ছিল খেজুর তোলার মৌসুম;

যখন ফল পাকছিল, মানুষ তাপে গাছের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করছিল, এসময় মানুষজনের বাইরে যাওয়া ছিল কষ্টকর।[২১] মুজাহিদের মতে কুরআনে বৃদ্ধ, যুবক, ধনী -গরীব সবাইকে যুদ্ধে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

> অভিযানে বের হয়ে পড় হাল্কা অবস্থায় হউক অথবা ভারি অবস্থায়, এবং সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা। তা-ই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে। (৯:৪১)

যখন কোন মুনাফিক পেছনে থাকার অনুমতি চাইল তখন আল্লাহ কুরআনে বলেনঃ

> আশু লাভের সম্ভাবনা থাকলেও সফর সহজ হলে তারা নিশ্চয়ই তোমার অনুসরণ করত, কিন্তু তাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হলো। তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, 'পারলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সংগে বের হতাম।' তারা নিজদেরকেই ধ্বংস করে। তারা যে মিথ্যাচারী তাতো আল্লাহ জানেন। (৯:৪২)।

এ অভিযানে অংশগ্রহণে অনিচ্ছার কারণ ছিল তাবুক ছিল মদীনা থেকে দূরে। সফরটি ছিল কষ্টকর, যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যও সহজলভ্য ছিলনা। বেদুঈন, মুনাফিক ও কিছু সংখ্যক মুসলমান পেছনে থেকে গেল।[২২] সাহাবীদের এ ব্যাপারে সবারই যথাযথ কারণ ছিল, শুধু মাত্র চারজনের যৌক্তিক কোন কারণ ছিলনা।

বিশ্বাসীগণ দ্রুত জিহাদের ডাকে সাড়া দেন

সফরের দীর্ঘ পথ, এবং সৈন্যবাহিনীর বিশালতার কারণে রাসূল (সা) তাঁর গন্তব্য স্থলের বিষয়টি তাঁর সাহাবীদের কাছে প্রকাশ করলেন। জিহাদে শরীকগণও যাতে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে সে জন্যও তিনি গন্তব্যস্থল প্রকাশ করেন। অন্য সময় রাসূল (সা) কখনো গন্তব্য স্থলের কথা আগে প্রকাশ করতেন না পাছে শত্রুরা সতর্ক হয়ে যেতে পারে।

বিশ্বাসীগণ জিহাদের জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়লেন। রাসূল (সা) আলীকে তার পরিবার পরিজনের সাথে পেছনে থাকার কথা বললেন। আলী বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি সকলকে মহিলা ও শিশুদের পেছনে থাকতে বলছেন?" রাসূল (সা) বললেন, মূসার প্রতি হারুন যেরূপ সন্তুষ্ট ছিলনা তুমিও কি আমার সাথে তেমন সন্তুষ্ট নও?" বিশ্বাসীদের মনোভাব দেখে মনে হলো তারা গাছের ফল আর গাছের ছায়াতে খুশি ছিলেন না; তারা আল্লাহর জন্য তাপ, তৃষ্ণা ও ক্ষুধাকেই পছন্দ করছিলেন। এটাই ছিল তাদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যা তারা আখেরাতে পাবে।[২৩]

আবু খায়সামা আল আনসারি বললেন, "রাসূল (সা) যখন বের হলেন আমি পেছনে থাকলাম। আমি আমার বাগানের ভেতরে গেলাম, দেখলাম আমার স্ত্রী একটি গাছে পানি দিচ্ছে। আমি বললাম, 'এটা ঠিক হচ্ছে না, রাসূল (সা)বাইরে তাপের মধ্যে, বাতাসের মধ্যে, আমি এখানে ছায়ায় জীবনের সুখ ভোগ করছি'। আমি কিছু মাংস ও

খেজুর নিয়ে বের হয়ে পড়লাম। যখন আমি সৈন্যদের কাছে পৌছলাম, লোকজন আমাকে দেখে ফেলল। রাসূল (সা) তখন বললেন 'এইতো আবু খায়সামা'। আমি আসার পর তিনি আমার জন্য দোয়া করলেন।"[২৪]

গরিব বিশ্বাসীরা হতাশ হয়ে পড়লেন, তারা *জিহাদে* যেতে পারলেন না। এমন একজন ছিলেন *উলাবা ইবনে যাইদ*। তিনি ছিলেন *আল বাক্কাইন*, তিনি রাতে ইবাদত করতেন আল্লাহর কাছে কাঁদতেন আর বলতেন, "আল্লাহুম্মা," "হে আল্লাহ আপনি *জিহাদের* হুকুম করেছেন, আমাদেরকে *জিহাদ* করতে উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু আপনি আমাকে রাসূলের সাথে *জিহাদে* যাওয়ার সুযোগ দেননি। সাদাকা হিসাবে আমি সব মুসলমানকে যারা আমার প্রতি অন্যায় করেছে, শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেছে, আমার সম্মানের হানি করেছে তাদেরকে আমি ক্ষমা করে দিয়েছি।" রাসূল (সা) তাকে বললেন, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।[২৫]

আবু মূসা আল আশারি'র নেতৃত্বে আশারিরা বেরিয়ে এল। তারা রাসূল (সা) এর কাছে জিহাদে যাওয়ার জন্য উট চাইল। কতক্ষণ ধরে রাসূল (সা) তাদের জন্য কোন উট জোগাড় করতে পারলেন না। কিছুক্ষণ পর তিনি তাদের জন্য তিনটি উট জোগাড় করতে পেরেছিলেন।[২৬]

শারীরিক দুর্বলতাসহ বিভিন্ন কারণে যারা *জিহাদে* যেতে পারেনি তারা হতাশ হলো, মনের দুঃখে কাঁদলো। তারা সবার পেছনে পড়ে রয়েছে এই ভেবে হতবিহবল হলো। এসময় কুরআনের নিম্নবর্ণিত আয়াত নাজিল হয়।

> যারা দুর্বল, যারা পীড়িত এবং যারা অর্থ সাহায্যে অসমর্থ তাদের কোন অপরাধ নেই, যদি আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি তাদের অবিমিশ্র অনুরাগ থাকে। যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন হেতু নেই; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তাদেরও কোন অপরাধ নেই যারা তোমার নিকট বাহনের জন্য আসলে তুমি বলেছিলে, 'তোমাদের জন্য কোন বাহন আমি পাচ্ছিনা।' তারা অর্থ ব্যয়ে অসামর্থ্যজনিত দুঃখে অশ্রুবিগলিত নেত্রে ফিরে গেল। (৯:৯১-৯২)।[২৭]

যারা বৈধ কারণে *জিহাদে* যেতে পারেনি তাদেরকে রাসূল (সা) বাছাই করে ফেললেন। তারা *জিহাদে* যেতে না পারলেও তাদের মনোভাব ছিল সঠিক। তিনি বলেন, "মদীনায় এমন সব লোক রয়েছে, তুমি যেখানেই যাও বা তুমি যদি উপত্যকা অতিক্রম করেও যাও তারা তোমাদের সাথেই থাকবে।" জনগণ জিজ্ঞাসা করলো, "হে রাসূল, তারা কি মদীনায় আছে?" রাসূল (সা) বলেন, "তারা মদীনায় আছে। কোন বৈধ কারণে তারা *জিহাদে* আসেনি এবং তাদেরকে *জিহাদে* যোগ দিতে দেয়া হয়নি।"[২৮] কা'ব ইবনে মালিক বলেন, "মদীনায় যারা রয়ে গেছেন তারা মুনাফিক লোকজন, আর যাদেরকে শারীরিক বৈধ কারণে মদীনায় রেখে আসা হয়।"[২৯]

তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণকারী সেনাবাহিনী

জিহাদে অংশগ্রহণকারী সেনাবাহিনী সম্পর্কে কিছু কিছু বর্ণনা রয়েছে। এগুলোর একটির সাথে আরেকটির মিল নেই। তবে বর্ণনাগুলোর ব্যাপারে একমত হওয়া যায়। কা'ব ইবনে মালিক বলেন, "রাসূল (সা) এর সাথে অনেক মুসলমান ছিলো। তবে বইতে তাদের নাম লিখে রাখা হয়নি।"[৩০] কা'বা'র আরেকটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, "মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১০,০০০ জন"।[৩১]

আল ইকলিলে বর্ণিত আছে যে, সৈন্য সংখ্যা ছিল ২০,০০০ জন, ইবনে ইসহাক এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন। আল ওয়াকিদির বক্তব্য হলো, তার সাথে ১০,০০০ সদস্যের বাহিনী ছিল। কাবে'র বর্ণনায় যা বলা হয়েছে তা'দের সবাই ছিল বিভিন্ন পশুর উপর সওয়ারি বাহিনী।

বাহিনীর অবশিষ্টগুলো ছিল পদাতিক বাহিনী। আবু জুরাহ আল রাযি'র মতে সৈন্য বাহিনীর সংখ্যা ছিল ৪০,০০০,[৩২] যায়েদ ইবনে সাবিতের মতে এ সংখ্যা ছিল ৩০,০০০।[৩৩]

বেশীরভাগ ঐতিহাসিকের মতে এ সংখ্যা ছিল ৩০,০০০। এ সংখ্যা এটাই নির্দেশ করে যে, বিশ্বাসীদের মধ্যে ঈমানের গভীরতা কত গভীর ছিল যার কারণে এত বিরূপ পরিবেশেও তারা *জিহাদে* যোগ দিতে আসেন। বিরূপ পরিবেশে সৈন্যবাহিনী কষ্টের মুখে পতিত হয়। রাসূল (সা) যত বড় বাহিনী পরিচালনা করেছিলেন এর মধ্যে এটাই ছিল সবচেয়ে বড়। আল ওয়াকিদির মতে যখন সেনাবাহিনী জমায়েত হলো তখন রাসূল (সা) যু কাশাবের মধ্যদিয়ে মদীনা থেকে রওয়ানা দেন। মদীনা হতে ৪০ কি মি দূরে সিরিয়ার পথে তারা যাত্রা করেন। যেখান থেকে তারা তাবুকের দিকে রওয়ানা দেন। তাঁর সাথে গাইড ছিলেন আলকিমাহ ইবনে আল ফাগওয়া আল খুজাই।[৩৪] তিনি আনসারদের প্রতি গোত্রকেই একটি করে গোত্রীয় পতাকা ও জাতীয় পতাকা সাথে নিতে বলেন। আরব জাতিগুলোর পতাকা ও জাতীয় পতাকা সাথে ছিল।

তাবুকে আবু বকর আল সিদ্দিককে সবচেয়ে বড় জাতীয় পতাকাটি দেয়া হয়। আর সবচেয়ে বড় পতাকাটি দেন আল যুবায়েরের হাতে। উসাইদ ইবনে হুদাইরের হাতে দেন আল আউস গোত্রের পতাকা, আর আবু দুজানার হাতে[৩৫] দেয়া হয় আর খাযরাজের পতাকা। কেউ কেউ বলেন যে, রাসূল (সা) এ পতাকাটি দিয়েছিলেন আল হাব্বাব ইবনে আল মুন্দিরের হাতে।[৩৬] যায়েদ ইবনে সাবিত পতাকা নেন বানু মালিক ইবনে আল নায্যার গোত্রের; আবু যায়েদ পতাকা নেন বানু আমর ইবনে আউফ গোত্রের; বানু সালামার পতাকা নেন মুয়ায ইবনে জামাল। আলওয়াকিদিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সেনাবাহিনীর পথ ও পতাকা বিতরণের বিষয় বিস্তারিত বর্ণনা করেন। নিজে মাতরূক হলেও তিনি সীরাত গ্রন্থে প্রচুর তথ্য সরবরাহ করেন। তাঁর নিকট থেকে এরূপ তথ্য গ্রহণে অনুমতি দেয়া হয়েছিল।

যারা পিছনে পড়েছিলেন এবং তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণ করেননি

তাবুক অভিযান থেকে তিনজন সাহাবী পেছনে থেকে গিয়েছিলেন। তারা হলেনঃ কা'ব ইবনে মালিক, মারারাহ ইবনে আলরাবি, হিলাল ইবনে উমাইয়া আল ওয়াকিফি। এ তিন *আনসার* তাদের ঈমানের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। কা'ব ইবনে মালিক বদর যুদ্ধে ও আকাবার দ্বিতীয় শপথ ছাড়া আগের সবগুলো অভিযানই দেখেছেন। তিনি অভিযানের জন্য প্রস্তুতি নিতে দেরি করলেন। তবে তিনি পেছনে পড়ে থাকতে পছন্দ করেননি। সে যাই হোক, তার গড়িমসি, গাছের ছায়া, ফলফলাদির ভালবাসা তাকে পেয়ে বসেছিল। মুসলিম বাহিনী তাকে রেখেই চলে গেল।

মারারাহ ইবনে আল রাবি এবং হিলাল ইবনে উমাইয়া উভয়েই বদর যুদ্ধ দেখেছেন। ৮০ জনেরও বেশী লোক পেছনে অবস্থান করে।[৩৭] আল ওয়াকিদির মতে এরা ছিল মদীনার *মুনাফিক*। তাঁর মতে বানু গিফার গোত্রের বেদুঈন ও অন্যান্য গোত্রের লোকের সংখ্যাসহ এ দলে ছিল ৮২ জন, আবদুল-হ ইবনে উবাই ও তার অনুসারীদের চেয়েও এ সংখ্যা ছিল অনেক বেশী।[৩৮] যারাই পেছনে ছিল তারা মনে করেছিল যে, তারা যে সেনাবাহিনীর পেছনে তা কেউ দেখছে না।[৩৯]

তাবুকের পথে রাসূল (সা) পেছনে পড়ে থাকাদের কারো কারো কথা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি আবরাহুম কুলসুম ইবনে হুসাইন আল গিফারীকে বানু গিফার ও বানু আসলাম[৪০] সম্পর্কে এবং তাবুকে কা'ব ইবনে মালিক[৪১] সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন।

কুরআনের *সূরা তাওবাতে* পেছনে থেকে যাওয়া মুসলমানদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর সাথে তাদের যোগ না দেয়াকে নিন্দা করা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের উপর যে *জিহাদে* যোগ দেয়া *ফরযে আইন* ছিল তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এ সূরায় তাদের কাছ থেকে *সাদাকার* বিনিময়ে তাদের অনুশোচনাকে গ্রহণ করা হয়েছে, *সাদাকা* দেয়ার মধ্যে দিয়ে জিহাদে যোগ না দিয়ে দূরে থাকা যে তাদের অপরাধ ছিল তা তারা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাদের *সাদাকা* গ্রহণের কথাও এ সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে। এ সূরায় *মুনাফিকদের* বদকার্যগুলোকে সবার সামনে প্রকাশ করা হয়েছে। তারা যে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়তিতে বিশ্বাস করতো না তাও বর্ণনা করা হয়েছে। তারা জীবনকে বেশী ভালবাসতো, মৃত্যুকে করতো ভয়, তারা *জিহাদকে* ভয় করতো। *মুনাফিকদের* অন্য দোষও ছিল : তারা অনিচ্ছাকৃত ভাবেই টাকা খরচ করতো। অর্থব্যয়ে তাদের কোন ভাল খেয়াল ছিল না; তারা শুধু খারাপ বলাতেই উৎসাহবোধ করতো; তারা অন্যদেরকে কাপুরুষ বলতো; কিন্তু তাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হতো তারা কি বলছে, তারা তখন বলতো যে তারা কৌতুক করছে। কুরআনে তাদের কোন ওজরকেই গ্রহণ করা হয়নি, তাদেরকে কাফির বলা হয়েছে, তাদের জন্য সব ধরনের ক্ষমা নিষিদ্ধ করা করা হয়েছে। তাদের মৃতদের জন্য দোয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ক্ষণস্থায়ী এ পৃথিবীতে তাদের হাসির বিনিময়ে মৃত্যুর পর আখেরাতে তাদেরকে

দীর্ঘদিন ধরে কাঁদতে হবে। তাদের প্রতি ঘৃণার অংশ হিসেবেই তাদের জন্য ভবিষ্যতের যে কোন *জিহাদে* যোগ দেয়া তাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। মুসলমান বাহিনীকে শুদ্ধ করার জন্য, অবিশ্বাসীদের থেকে মুসলমানদের আলাদা করার জন্য, পাছে মুনাফিকরা মুসলমানদের মধ্যে কাপুরুষতা ও হীনমন্যতা ছড়িয়ে দিতে পারে তার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কুরআনে এক আয়াতে যারা যুদ্ধ যাওয়া থেকে পেছনে থেকে গিয়েছিল এবং যারা দুঃখ প্রকাশ করেছে, যারা না মুনাফিক না ঐসব লোক যারা পেছনে থেকে গিয়েছিল ও তাদের ভুল তারা স্বীকার করেছিল, তাদের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত করা হয়েছে।

মদীনা ও বেদুঈনদের যারা যুদ্ধে না গিয়ে পেছনে থেকে গিয়েছেন এ সূরায় তাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়। *জিহাদের* জন্য বড় ধরনের পুরস্কারের কথা আর *জিহাদের* যোগ দেয়া *ফরযে আইন* বিষয়ে এ সূরায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তাবুকে উপস্থিতি

রাসূল (সা) তাবুকে অনেক বড় *খুতবা* দিয়েছিলেন- কোন কোন সূত্র থেকে এটি জানা যায়। *সহীহ সনদে* এ *খুতবার* কথা সমর্থিত হয়নি।[৪২] দোয়ার বিষয়টি অন্য হাদীস হতে নেয়া হয়েছে। এর কিছু *সনদ সহীহ*, কিছু সনদ *হাসান।* এতে মনে হয় কোন কোন বর্ণনাকারী *খুতবাকে হাদীস* হতে আলাদা করে দেখেছেন।

তাবুক অভিযানে রাসূল (সা) বেশ কয়েক জন সাহাবীকে সহ খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে দাওমা আল জানদালে প্রেরণ করেন। উরওয়া ইবনে আল যুবায়েরের মুরসাল সনদের হাদীসে দেখা যায় খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে ৪২০ জন সৈন্যসহ সেখানে পাঠানো হয়েছিল।[৪৩] খালিদ নগরীর বাইরে পাহারা দেয়ার সময় দাওমা আল জানদালের রাজা উকাইদির ইবনে আবদ আল মালিককে আটক করেন।[৪৪] রাসূল (সা) *জিযয়া* দেয়ার শর্তে তার সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন।[৪৫] মুসলমানগণ উকাইদিরের পরিহিত গাউনের প্রশংসা করছিল। রাসূল (সা) এ সময় বলেন, "তোমরা এ গাউনের প্রশংসা করছ? যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, বেহেশতে সা'দ ইবনে মুয়াযের রুমাল তার গাউনের চেয়েও উত্তম।"[৪৬] উকাইদের কাছ থেকে খালিদ গণিমত হিসাবে ৮০০ বন্দী, ১,০০০ উট, ৪০০ বর্ম, ৪০০ বর্শা পেয়েছিলেন।[৪৭]

তাবুকে থাকা অবস্থায় রাসূল (সা) এর কাছে আয়লার রাজার কাছ থেকে উপঢৌকন এলো। এটি ছিল একটি সাদা বর্ণের খচ্চর ও একটি জামা। রাসূল (সা) *জিযয়া* দেয়ার শর্তে তার সাথে শান্তি চুক্তি করলেন।[৪৮]

একটি দুর্বল বর্ণনা হতে জানা যায়, তাবুকে রাসূল (সা) ও বাইজেন্টাইন শাসক হেরাক্লিয়াসের মধ্যে পত্র বিনিময় হয়েছিল। রাসূল (সা) দিহিয়্যা আল কালবিকে তার কাছে পাঠান। হেরাক্লিয়াস পয়গাম্বরীর[৪৯] চিহ্ন দেখে আসার জন্য আল তানুখিকে পাঠান। এটি *সহীহ* হলে বলতে হবে রাসূল (সা) দ্বিতীয়বারের মত দিহিয়্যাকে একটি পত্র নিয়ে সপ্তম হিজরীতে সিজারের নিকট প্রেরণ করেন।

এ অভিযানের সময় বাইজেন্টাইনীদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ সংগঠিত হয়নি। মুসলমানগণ তাবুকে পৌঁছে বাইজেন্টাইনী ও আরব গোত্রের লোকদের মুখোমুখি হননি। নগরীর শাসকগণ *জিয্য়া'র* শর্তে তাদের সাথে সন্ধিচুক্তি করেন। মুসলমান বাহিনী ২০ দিন তাবুকে থেকে মদীনায় ফিরে আসেন।[৫০]

তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন

তাবুক থেকে মদীনায় ফেরার সময় মুসলমান বাহিনী সামুদদের ভূ-খন্ড আল হিজ্‌র-এর মধ্য দিয়ে আসেন। কুরআনের বর্ণনা মতে এ সামুদদেরকে মাদী উট দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছিল। তারা উটটিকে হত্যা করে। তাদের বিদ্রোহের কারণে প্রবল ঝঞ্ঝা তাদের উপর দিয়ে বয়ে যায়।[৫১] মুসলমান বাহিনী আল হিজরের বিধ্বস্ত বাড়ীঘরে ঢুকতে চাইলে রাসূল (সা) নিষেধ করেন। "ঐসব লোকদের বাড়ী ঘরে তোমরা প্রবেশ করো না। যারা নিজেদের প্রতি নিজেরাই অবিচার করেছে, ক্রন্দনরত অবস্থা (অর্থ্যাৎ নাস্তানাবুদ অবস্থা) ছাড়া তাদের গৃহে প্রবেশ করবে না, তা যদি কর তোমাদের উপরও তাদের মত একই মুসিবত পতিত হতে পারে।" এর পর রাসূল (সা) তাঁর মাথা ঢেকে নিয়ে দ্রুত উপত্যকা পার হয়ে গেলেন। রাসূল (সা) তাদের কূপ থেকে পানি পান করতে ও সে পানি দিয়ে *ওযূ* করতেও নিষেধ করেন। এ পানি মিশ্রণে তৈরী খাদ্য তাদের উটকে খাওয়াতে বলেন, কিন্তু নিজেরা যাতে না খায় সে ব্যাপারে সাবধান করে দেন।[৫২]

মুসলমান বাহিনী ফেরার পথে পানির অভাবে উটকে পানি পান করাতে পারছিলেন না বলে কষ্টের কথা বলেন। রাসূল (সা) তখন আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। "হে আল্লাহ, তুমি যেভাবে দুর্বল ও শক্তিশালীকে সাহায্য কর তেমনি উটগুলোকে বোঝা বহন করতে শক্তি দাও, যেভাবে ভিজা ও শুকনা অবস্থায় সাহায্য কর। সেভাবে তুমি উটগুলোকে ভূমিতে ও সাগর বক্ষে ভার বহনে শক্তি দাও।" এ দোয়ার পর উটেরা তাদের শক্তি পায়, মদীনায় বোঝা বহন করে নিয়ে যায়। এর পর মুসলমান বাহিনীর আর কোন অভিযোগ রইল না।[৫৩]

মদীনায় ফেরার পথে মুনাফেকরা তাদের মুখ এমনভাবে ঢেকে নিল যেন বাইরে থেকে চেনা না যায়। তারা রাসূল (সা) এর বাহনকে বোকা বানাতে চাইলো। রাসূল (সা) কে যাতে তার বাহন ফেলে দেন সে জন্য এরূপ করলো। রাসূল (সা) কিন্তু তাদেরকে দেখে ফেললেন। তিনি তাদের কাছ থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিলেন।[৫৪]

মুসলমান বাহিনী মদীনার কাছাকাছি এসে পৌঁছলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদেরকে স্বাগত জানাতে সানিয়াত আল ওয়াদায় এলো।[৫৫] রাসূল (সা) মদীনায় পৌঁছে তাঁর মসজিদে দু'রাকাত সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি লোকজনের সাথে বসলেন। যেসব মুনাফিক তাঁর পেছনে অবস্থান করছিল তারা সামনে এসে শতরকমের ওজর উত্থাপন করলো। তিনি তাদের অবস্থাটা বুঝতে পারলেন আর তাদের কাছ থেকে আনুগত্যের শপথ বাক্য পাঠ করায়ে তাদেরকে ক্ষমার জন্য দোয়া করলেন। আল্লাহই তাদের মনের গোপন কথা প্রকাশ করলেন। কা'ব ইবনে মালিক এগিয়ে এলে তার পেছনে হিলাল ইবনে উমাইয়্যা ও মারিয়া ইবনে আল রাবিও এলেন। তারা স্থির করলেন

যে, তাদের পেছনে থাকার ব্যাপারে তারা কোন ওজর উপস্থাপন করবেন না। তারা পেছনে থাকার ওজরের কথা বলে আবার মিথ্যার আশ্রয় নিতে চাইলেন না। রাসূল (সা) মুসলমানদেরকে তাদের সাথে কথা বলতে না করে দিলেন। মুসলিমরা এভাবে তাদের সাথে ৫০ দিন ধরে কোন কথা বললেন না। তাদের স্ত্রীদেরকে তাদের থেকে দূরে থাকতে বলা হলো। তাদের স্ত্রীরা তাদের আত্মীয় স্বজনের কাছে চলে গেল। বাকী থাকলো মাত্র হিলালীর স্ত্রী। হিলালী বুড়ো হওয়ার কারণে রাসূল (সা) এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে হিলালের স্ত্রী তার সেবার জন্যে থেকে গেল। বর্ণিত তিনজন খুব বিমর্ষ হয়ে পড়লো। আল গাসাসিনার রাজা এ পরিস্থিতির সুযোগ নিতে চাইলেন। তিনি কা'ব ইবনে মালিকের কাছে পত্র লিখলেন। পত্রে মালিককে তার সাথে যোগ দিতে বলা হলো। কিন্তু কা'ব ইবনে মালিক তার পত্রটি ছিড়ে ফেললেন আর বললেন তার বিচার করা হয়েছে। সমাজ হতে তার নির্বাসন কুরআনের আয়াত নাযিল পর্যন্ত চলতে থাকে। আয়াতে আল্লাহ তাদের অনুশোচনা গ্রহণ করেছেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

> তিনি ক্ষমা করলেন অপর তিন জনকেও, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত করা হয়েছিল। যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য তা সংকুচিত হয়েছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়েছিল এবং তারা উপলব্ধি করছিল যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নেই, পরে তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ-পরায়ণ হলেন, যাতে তারা তওবা করে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৫৬] (৯:১১৮)

তাবুক অভিযান হতে লব্ধ আহকাম

রাসূল (সা) আবদ আল রাহমান ইবনে আউফ এর পেছনে তাবুকে ফজরের সালাত আদায় করলেন। যখন রাসূল (সা)-এর কোন কারণে দেরি হয়ে যেত তখনই রাসূল এভাবে সালাত আদায় করতেন। রাসূল (সা) এসে গেলে আবদুর রাহমান সরে গিয়ে তাঁকে ইমামতি করতে দিতে চাইতেন। কিন্তু রাসূল (সা) তাকে জায়গা ছেড়ে না দিয়ে সালাত শেষ করতে বলতেন এবং তার পেছনে সালাত আদায় করতেন। এর দ্বারা বুঝা যায় রাসূল (সা) বেশীরভাগ সময়ে নিজেই সালাত পড়াতেন। কখনো কোন কারণে তাঁর দেরি হয়ে গেলে আবদুর রাহমান সালাত পড়াতেন।[৫৭]

মদীনার দিকে যাওয়া মুয়ায ইবনে জাবাল রাসূল (সা) কে এমন একটি আমলের কথা জিজ্ঞাসা করলেন যা করলে বেহেশত অনিবার্য। রাসূল (সা) তখন বললেন, এসব কাজের শীর্ষ কাজ হলো *শাহাদাহ*, এর কাঠামো সালাত, যাকাত, আর এরও শীর্ষে *জিহাদ*।[৫৮]

এ অভিযানের সময় রাসূল (সা) কে *সুতরা* কী (সালাত কালীন আড়াল সম্পর্কে বর্ণনা) জিজ্ঞাসা করা হয়। যে সালাত আদায় করছে তার সুতরা জানার জন্য এ প্রশ্ন করা হয়। এর উত্তরে রাসূল (সা) বললেন, এর দৈর্ঘ্য হবে উটের জীনের মাথার সমান।[৫৯]

এ অভিযানের সময় রাসূল (সা) *জোহর, আসর, মাগরিব* ও *ইশা* এক সাথে আদায় করেন।[৬০]

রাসূল (সা) তাবুকে ২০ দিন পর্যন্ত ছিলেন, ঐ সময়ে রাসূল (সা) সালাত সংক্ষেপ করেছিলেন।[৬১]

তাবুকের দিকে যাওয়ার সময় ওয়াদি আল কুরায় "একটি বাগানের বিষয়ে হিসাব" করলেন। গাছ থেকে পাকা খেজুরের হিসাব করছিলেন যা ঐ সময়ে ফলানো যেত। এর থেকে বুঝা যায় যে, আন্দাজ বা হিসাব করা জায়েয।[৬২]

তাবুকে থাকাকালীন একটি বাড়ী থেকে তিনি পানি পান করতে চাইলেন। তাকে চামড়ার থলিতে করে পানি দেয়া হলো। এ সময় মৃত পশুর চামড়া সম্পর্কে রাসূল (সা) বললেন, চামড়া ট্যানিং করা হলে এটি পাক হয়ে যায়।"[৬৩]

তিন সাহাবীর সমাজ হতে বহিষ্কারের পর থেকে এটা জায়েয যে, কোন মুসলমান অপর কোন মুসলমানকে শরীয়ার কারণে তিন দিনের চেয়েও বেশী দিন ত্যাগ করে থাকতে পারে।[৬৪]

এ অভিযানের ফলে আরব উপদ্বীপের উত্তরাঞ্চলে ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জিত হয় এবং বৃহত্তর সিরিয়ার স্বাধীনতার একটি কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাসূল (সা) এর ইন্তিকালের ঠিক পূর্বে উসামা ইবনে যায়িদ ইবনে হারিসার নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেন, কিন্তু খলিফা আবু বকরের অনুমতি ছাড়া এটি যাত্রা করতে পারেনি। এর কারণ রাসূল (সা) এর ইন্তিকালের কারণে তারা এ অভিযান আগেভাগে শুরু করতে পারেননি।

স্বধর্ম পরিত্যাগের কারণে (*রিদ্দা* আন্দোলন) মদীনা ও ইসলামের যে গুরুতর অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তা সত্ত্বেও আবু বকর সিরিয়ায় সৈন্য পাঠাতে বাধ্য হলেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার সাথে সাথে সিরিয়া ও ইরাক যুক্ত করার জন্য আবু বকর সেনাবাহিনীকে অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত করলেন। মানব জাতিকে অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে মুক্ত করার জন্য, "একমাত্র আল্লাহর ইবাদত প্রতিষ্ঠার জন্য আর যাতে মানবজাতির উপর অত্যাচার নির্যাতন চলতে না পারে, সর্বত্র ন্যায় বিচার ও সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর উপর ঈমান প্রতিষ্ঠার জন্য" (৮:৩৯) সর্বোপরি ইসলামিক মিশনকে সফল করার জন্য আবু বকর তার সেনাবাহিনীকে সুসজ্জিত করে তোলেন।

পাদটীকা ঃ

১. ইবনে হাজর, *ফাতহুর বারী*, ৮/৮৪। এটি তাইফ অবরোধের ছয় মাস পরের ঘটনা, হিসাবে এটিকে মনে করা হয়, আল *মাগাযি'র* লেখক মুহাম্মদ ইবনে আয়াযের বর্ণনা থেকে এটি জানা যায়। উসমান ইবনে আতা আল খুরাসানি ও তার পিতার দুর্বল সনদ হতে এটি বর্ণিত। এ ঘটনা যে রজব মাসে ঘটেছিল এ ব্যাপারে বিভ্রান্তি রয়েছে। রাসূল (সা) যিলহজ্জে তাইফ অবরোধের পর মদীনায় প্রবেশ করেন।

২. ইবনে সা'দ, *আল তাবাকাত আল কুবরা*, ২/১৬৫।

৩. আল ইয়া কুবি, *তারিখ*, ২/৬৭।

৪. ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ২/৫। আরও দেখুন, আল তাবারি, *তাফসীর*, ১১/৭১।

৫. ইবনে কাসির, *তাফসীর* ৫/২১০-২১১। এ কারণ বর্ণনায় বর্ণনায়র সূত্রটি প্রত্যাদেশের জন্য (*সাবাব আল নুযূল*) ইবনে আসাকীরের *তারিখ দিমাশ্‌ক* - এ বর্ণিত হয়েছে, ১/১৬৭-৮। এর সনদে আহমাদ ইবনে আল জাম্মার আল আতরিদি'র নাম বর্ণিত হয়েছে, এটি *যঈফ*।

৬. *তাফসীর আল তাবারি*, ১১/৭২, এখানে তিনি আবদ আল রাহমান ইবনে যাইদ ইবনে আসলাম আল আদবি'র (মৃ. ১৮২ হি.) একজন বড় মানের ভাষ্যকার'এর *তাফসীর* এর বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। কিন্তু মুহাদ্দিসদের বর্ণনায় তিনি *যঈফ, তাগরিব*, ১/৪৮০।

৭. *সহীহ মুসলিম, কিতাব আল ফাযায়েল*, ৭/৬০-৬১।

৮. *সহীহ আল বুখারী, কিতাব আল তাওহীদ*, ৯/১২৯ এবং অন্যান্য বর্ণনা; *সহীহ মুসলিম*, ৫/৮২, আরও দেখুন, *ফাতহুর বারী*, ৮/৮৪; অর্থনৈতিক ব্যাপারে দেখুন, *সহীহ মুসলিম* ১/২৬-২৭, ৪১-৪২; আল নবাবী, *শারহ সহীহ মুসলিম*, ১/২২১-২২৩; আল কুরতবী, *তফসীর* ৪/২৭৯।

৯. দু'টো *সনদই মুনকাতি*, কারণ কাতাদাহ ও মুজাহিদ ঐটিকে দেখেননি; কাতাদার *সনদ সহীহ;* সানিদ ইবনে দাউদ আল মাসিসির কারণে মুজাহিদের *সনদ দুর্বল*।

১০. আল তাবারি, *তাফসির*, ১১/৫৫।

১১. ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারি*, ৩/৩৪৩-৪।

১২. *সহীহ আল বুখারী, কিতাব আল ওয়াসায়া*, ৪/১১;ইবনে হাযার *ফাতহুর বারী*, ৫/৩০৬।

১৩. আহমাদ, *মুসনাদ*, ৫/৫৩; আল তিরমিযি, *সুনান কিতাব আল মানাকিব*, ১৩/১৫৪-৫, তার বর্ণনামতে এ হাদীস হাসান গারিব। এ সনদে যদিও তারা তা বর্ণনা করেননি। আল গারাবির মতে এটি *সহীহ*, তবে এর বর্ণনাকারীগণ এটিকে *সহীহ*'র পক্ষে মত দেন। এর কারণ সনদের সাথে কাসির ইবনে আবু কাসির'র নাম যুক্ত আছে, ইবনে সামারার *মওলা* আল তাকরিবে যাকে আল হাফিয *মকবুল* মনে করেন (২/১৩৩)। আল ইযলি ও ইবনে হিব্বান তাকে *সিকাহ* মনে করেন। তারা এব্যাপারে সদয় ছিলেন। *মিযান আল ইতিদাল*, ৩/৪১০। এতে প্রমাণ হয় *হাদীসটি* ঠিক আছে এবং অন্যরা এটিকে হাসান হিসাবে জোরালো করেছেন।

১৪. আর তিরমিযি, *সুনান*, (*কিতাব আল মানাকিব*, ১৩/১৫৩-৪)। তিনি বলেন, "এ *সনদে হাদীসটি গারিব*, আমরা এটি আল সাকান ইবনে আল মুগিরার হাদীস হতে জানতে পারি।"

আল হাকিম, *আল মুসতাদরাক*, ৩/১০২, তিনি এটিকে *সহীহ* বলেছেন। আল যাহাবি তার সাথে একমত। তবে এর মধ্যে *মাযুল আল আইন* (যা মোটেও জানা যায়নি) ফারকাদ আবু তালহার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। (*তাহজিব আল তাহযিব*, ৮/২৬৪)। এভাবে তাদের *সহীহ'র* ধারণার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়।

১৫. আল তাবারি, *তাফসীর*, ১০/১৯১-৬। আল মুসান্না ইবনে ইবরাহিম আল আম্লিলি যিনি অজ্ঞাত, এবং উমর ইবনে আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফকে সূত্র হিসাবে ধরা হয়। আল শায়েখ মাহমুদ মুহাম্মদ শাকির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, সনদ হতে উমরকে বাদ দেয়া হয়েছে এবং এটি *যঈফ*। দেখুন, প্রাগুক্ত, ১০/১৯৭, সনদ

হিসাবে মুহাম্মদ ইবনে রাযা আবু সাহল আল আবাদানি যিনি অজ্ঞাত, তাকে সনদ হিসাবে নেয়া হয়েছে, আমর ইবনে ইয়াস্‌সাফ এর সনদ *যঈফ*। আরও দেখুন, প্রাগুক্ত, ১/১৯৪-৫। দুর্বল আওফিসের সনদ হতে উদ্ধৃত।

প্রাগুক্ত, ১০/১৯৫, এটি মুজাহিদের *মারাসিল* হতে গৃহীত, আবদ আল্লাহ ইবনে আবু নাযিহ-এ এর সনদযুক্ত, তিনি মুদাল্লিস, এবং মুজাহিদ হতে *আনানাহ* কৃত। প্রাগুক্ত, ১০/১৯৫। কাতাদার *মুরসাল* হতে দু সনদসহ উদ্ধৃত। এগুলো *সহীহ সনদ*। কাতাদার সাথে সংশ্লিষ্ট।

১৬. *সহীহ আল বুখারী, কিতাব আল তাফসির*, ৬/৫৬; ইবনে হাজার *ফাতহুর বারি*, ৮/৩৩০।

১৭. আল তাবারি, *তাফসীর*, ১০/১৯৭, *সহীহ সনদসহ*।

১৮. প্রাগুক্ত, ১০/১৪২, মুজাহিদের *সহীহ মুরসাল সনদসহ*।

১৯. ইবনে হাযার, *ফাতহুর বারি*, ৮/৩৩৩; ৩/২১৪, *সহীহ সনদসহ*।

২০. আল ওয়াকিদি, *আল মাগাযি*, ১৩/৯৯০। তার বর্ণনায়র উপর ভিত্তি করেই এটির বর্ণনা করা হয়। মাত্র একজন হলে আল ওয়াকিদিকে প্রমাণ হিসাবে নেয়া যাবে না। গোত্রগুলোকে মদীনার বাইরে নেয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না। এটি ছিল মদীনার ভেতরে সাহাবীদেরকে সংগঠিত করার মত।

২১. আল তাবারি, *তাফসীর*, ১০/১৩৩, মুজাহিদের বর্ণিত লোকদের সনদ *সিকাহ* , তবে এটি *মুরসাল*, আবদুল্লাহ ইবনে আবু নাযিহ আল মক্কীর *আনানাহ* সহ যা *মুদাল্লিস*।

২২. আল তাবারি, *তাফসীর*, ১০/১৭, হাসান সনদসহ তবে কাতাদার *মুরসাল সনদসহ*।

২৩. *সহীহ আল বুখারী*, ২/১৭, অন্য অধ্যায়; *সহীহ* মুসলিম, ৭/১২১-১।

২৪. আল তাবারানি কর্তৃক বর্ণিত (*ফাতহুর বারি*, ৪/১১৯); ইবনে এ বর্ণনা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেন, সনদ ছাড়া (*সিরাত আল হিশাম*, ৪/১৬০-৪)। উরওয়া ইবনে আল যুবাইর ও মূসা ইবনে উকবা উভয়েই এর বর্ণনা করেন ও এর সাথে যুক্ত করেন (ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৫/৭-৮)। *সহীহ* মুসলিম, ৮/১০৭, এবং আহমাদ, *মুসনাদ*, ৬/৩৮৭-৮, এ বর্ণনার অংশ হিসাবে বর্ণিত, যা ছিল "এটি হবে আবু খাইসামা।"

২৫. অনেক মাখরায ও দুর্বল সনদসহ উলাবা ইবনে জাহিদ'র ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এর *সহীহ সনদ* আছে, তবে সাদাকা দান কারীর নাম উল্লেখ ছাড়া এটি বর্ণিত হয়েছে। ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসাবে মোটের উপর এটি বৈধ। দেখুন, ইবনে হাজার, *আল ইসাবা*, ৪/৫৪৬-৮।

২৬. *সহীহ আল বুখারী*, (ইবনে হাযার, *ফাতহুর বারি*, ৮/১১০-১)। আহমাদ, *মুসনাদ*, ৪/৩৯৮, *সহীহ সনদসহ*।

২৭. আল তাবারী, *তাফসীর*, ১০/২১১, যাদের ব্যাপারে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে তাদের ব্যাপারে কিছুই *সহীহ* প্রমাণ করা যায়নি। এব্যাপারে বর্ণনায় ভিন্নতা রয়েছে। কেউ কেউ বলেন কান্না কারীদের উপর এটি অবতীর্ণ হয়েছে বা আল আইরবায ইবনে সারিয়্যা, বা আইয ইবনে আমর বা বানু মুকরাদ।

২৮. ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারি*, ৮/১২৬।

২৯. *সহীহ আল বুখারী* , ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারি*, ৮/১১৪।

৩০. *সহীহ হাদীস*, আল বুখারী বর্ণিত (*ফাতহুর বারি* ৮/১১৩)।

৩১. *সহীহ* মুসলিম ৮/১১২।

৩২. ইবনে হাযার *ফাতহুর বারী*, ৮/১১৮।

৩৩. আল ওয়াকিদি, *আল মাগাযি*, ৩/৯৯৬।

৩৪. প্রাগুক্ত। ২/৯৯৯। আল ওয়াকিদির *মাতরূক*। এ বর্ণনায়র সনদ পরীক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ এ বর্ণনায় দেখা যায় রাসূল (সা) যুহর ও আসর দু'ইকামতে একসাথ করে আদায় করেন। এর সাথে যেহেতু শরীয়া আইনের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। আল ওয়াকিদি সে কারণে দুর্বল, আমি মূল পাঠ্যে এর উল্লেখ করেছি।

৩৫. আল ওয়াকিদি, *মাগাযি*, ২/৯৯৬; ইবনে সা'দ, *আল তাবাকাত*, ৩/১৯৬।

৩৬. ইবনে আসাকির, *তারিখ দি মাসক*, ১/৪১৬, তার সনদও আল ওয়াকিদির সাথে সংশ্লিষ্ট।

৩৭. ইবনে হাযার, *ফাতহুর বারি*, ৮/১১৪; আল তাবারি, *তাফসীর*, ১১/৫৮, আল যুহরীর মুরসাল হতে।

৩৮. ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারি*, ৮/১১৯।

৩৯. প্রাগুক্ত, ৮/১১৪।

৪০. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ৪/১৭২-৩, আল যুহরীর ইবনে ইসহাকের বর্ণনা হতে। তিনি যে শুনেছেন এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে তিনি কিছু বলেন নি। তবে তিনি "আল জুহরী বর্ণিত" শব্দগুলোর উল্লেখ করেন। তিনি সম্ভবত এটি আল যুহরীর *মাগাযি* হতে নিয়েছেন। এবং এটি যুহরী হতে মুয়াম্মারের মাধ্যমে বর্ণিত হয় (*মুবারিদ আল জামান ফি জাওয়ারিদ ইবনে হিব্বান*, ৪১৮)। হাসান লি গায়রিহি'র অবস্থা পর্যন্ত বর্ণনাটিকে জোরালো করা হয়েছে।

৪১. ইবনে হাযার, *ফাতহুর বারি*, ৮/১১৪।

৪২. ইমাম আহমাদ, *আল মুসনাদ*, ৩/৩৮, আবু ওবায়েদ নাতিদীর্ঘ *খুতবার* কথা (*আল আমওয়াল*, ২৫৫-৬) বলেছেন। তাদের সনদে রয়েছে *মাযুল* নামে খ্যাত আবু আল খাত্তাব আল মিসরী। আল হাফিয ইবনে কাসির (*আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৫/১৩-১৪) বিষয়টিকে একটি দীর্ঘ *খুতবার* বিষয় বলেছেন; তার সনদে রয়েছে *মাতরূক* নামে খ্যাত আবদ আল আজীজ ইবনে ইমরান।

৪৩. ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৫/১৭, তার সনদে রয়েছে ইবনে লাহিয়্যা, আবু আল আসাদ হতে। এখানে ইবনে লাহিয়্যার সূত্র দুর্বল। এটি উরওয়ার *মুরসাল* হাদীসের একটি।

৪৪. ইবনে হাজার, *আল ইসাবাহ*, ১/৪১২-৫, আসিম ইবনে উমর ইবনে আনাম হতে ইবনে ইসহাক হতে সনদ সহকারে। এটি হাসান হতে পারে, এটি ইবনে ইসহাকের *আনানাহ* এর জন্য নয়। তিনি ছিলেন *মুদাল্লিস*। আল সুয়ুতি, আল খাসায়েস আল কুবরা, ২/১১২-৩, ইবনে ইসহাক হতেও, তার শায়খ আবদ আল্লাহ ইবনে আবু বকর ও ইয়াজিদ ইবনে রূমান হতে; এটি *মুরসাল*। ইবনে ইসহাক স্পষ্টভাবে *সাযা* ঘোষণা করেছেন।

৪৫. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ৪/১৮২।

৪৬. প্রাগুক্ত, ৪/১৭০, হাসান সনদ সহকারে।

৪৭. ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৫/১৭। আবু আসওয়াদ হতে ইবনে লাহিয়ার সনদ সহ, এখানে ইবনে লাহিয়ার সূত্র দুর্বল। এটি উরওয়ার একটি *মুরসাল হাদীস*।

৪৮. *আল বুখারী, কিতাব আল জিযয়া*, ৬/৭৭; *সহীহ* মুসলিম, *কিতাব আল ফাযায়েল*, ৭/৬১।

৪৯. আহমাদ *মুসনাদ*, ১/২০৩; ৩/৪৪২; ৫/২৯২; সাইদ ইবনে আবু রাশিদের সনদসহ, যিনি *মকবুল* যিনি এটির বর্ণনা করেন।

৫০. *সওয়ারিদ আল যামান ইলা জাওয়ায়িদ ইবনে হিব্বান*, ১৪৫, *সহীহ সনদ সহকারে*।

৫১. *সহীহ আল বুখারী*, (ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারি*, ৪/১১৮-৯; *সহীহ* মুসলিম, ৪/২২০-১)।

৫২. ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৫/১১, হাসান সনদ হলেও আল আব্বাস ইবনে সহল ইবনে সা'দ আল সাইদি'র মুরসাল সনদ এর সাথে যুক্ত।

৫৩. আহমাদ, *মুসনাদ*, ৬/২০, *হাসান সনদ সহ, মাওয়ারিদ আল যামান ফি জাওয়ায়িদ ইবনে হিব্বান*, ৪১৮।

৫৪. আহমাদ, *মুসনাদ*, ৫/৩৯০, *হাসান সনদসহ*, আল বায়হাকি, *আল সুনান আল কুবরা*, ৯/৩২-৩, দু'টি সনদ সহ, সনদ ছাড়া একটি ইবনে ইসহাক হতে এবং আরেকটি *মুরসাল* সহ উরওয়া ইবনে আল জুবাইর হতে। উরওয়ার সনদে ইবনে লাহিয়ানের কারণে দুর্বলতা রয়েছে।

৫৫. আহমাদ, *মুসনাদ*, ৫/৩৯০। *হাসান সনদসহ*। আল বায়হাকি, *আল সুনান আল কুবরা*, ৯/৩২-৩, দু'সনদ সহ, সনদ ছাড়া একটি ইবনে আল যুবাইর হতে। সনদ ও অন্যটি উরওয়াহ ইবনে আল যুবাইর হতে, এটিও *মুরসাল*। ইবনে নাহিয়ার কারণে উরওয়ার সনদে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে।

৫৬. ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৮/১১৩-১১৬, *আল বুখারীর* একটি বর্ণনা হতে গৃহীত।

৫৭. *সহীহ* মুসলিম, ১/১৫৮-৯; *সহীহ আল বুখারী*, ১/৪৩-৪

৫৮. আহমাদ, *মুসনাদ*, ৫/২৪৫-৬, *হাসান সনদ সহকারে*।

৫৯. আল নাসাই, সুনান, ২/৬২, *সহীহ সনদসহ কারে*।

৬০. আল যারকানি, *শারহ্ মুয়াত্তা মালিক*, ২/৫৫-৫৮।

৬১. *মাওয়ারিদ আল যামান ইলা যাওয়াইদ ইবনে হিব্বান*, ১৪৫, *সহীহ সনদ সহ*।

৬২. ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারি*, ৩/৩৪৩।

৬৩. আবু দাউদ, *সুনান*, *কিতাব আল লিবাস*, ৪/৬৪, *হাসান সনদসহ*।

৬৪. অনেক উপকার এর মধ্য থেকে গৃহীত, ইবনে হাজার *ফাতহুর বারী*, ৮/১২৩-৪, এখানে তিনি বিস্তারিত বর্ণনা দেন।

অধ্যায় ১৮

প্রতিনিধিলের বছর

হিজরীর নবম বছরকে *আম'আল উফুদ* বা প্রতিনিধি দলের বছরবলা হয়। রাসূল (সা) হিজরীর অষ্টম বছরের শেষ দিকে আল যারানায় ফিরে আসেন। এ সময় আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন স্থান হতে আরব গোত্রগুলো ইসলাম কবুলের জন্য অপেক্ষা করছিল। যখন মক্কা বিজয় হয় তখন তারা ইসলাম কবুলের জন্য আসতে থাকে। ইবনে সা'দের তাবাকাত বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের ব্যাপারে ব্যাপকভাবে জানার জন্য নির্ভরযোগ্য সূত্র।[১] বিভিন্ন সূত্রের বরাতে জানা যায় এ সময় ষাটটিরও বেশী প্রতিনিধিদল ইসলাম কবুলের জন্য এসেছিল।[২]

প্রতিনিধি দলগুলো সম্বন্ধে বিভিন্ন বর্ণনার সূত্রগুলোর কোন সনদ পাওয়া যায় না। ইবনে ইসহাকই প্রথম দিকে তাদের ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তাঁর তথ্যগুলোর সূত্র মাঝে মধ্যেই ব্যবহার করেছেন, তাঁর বর্ণনাগুলো সনদ ছাড়াই ব্যবহৃত হয়েছে।[৩] এ দুস্প্রাপ্য বর্ণনাগুলো আল যুহরী, আবদ আল্লাহ ইবনে আবু বকর এবং আল হাসান আল বসরি'র *মুরসাল* বর্ণনাটি। দিমাম আল হাসান আল বসরি'র মুরসাল বর্ণনা। দিমাম ইবনে সালাবাহ প্রতিনিধি হিসাবে আসার বর্ণনাটি ব্যতিক্রম। এর জন্য ইবনে আব্বাস ও মুহাম্মদ ইবনে আল ওয়ালিদ ইবনে নুয়েফি'র সনদ যুক্ত হয়েছে। মুহাম্মদ ইবনে আল ওয়ালিদ গ্রহণযোগ্য হলেও তাঁকে অনুসরণ করা হয় না।

তার কারণে বর্ণনা দুর্বল হয়ে পড়ে। ইবনে ইসহাক যেসব প্রতিনিধি দলের কথা বলেন তারা হলো বানু তামিম, বানু আমির, বানু সা'দ ইবনে বকর, আবদ আল কায়েস, বানু হানিফা, তায়, বানু যুবাইদ, কিন্দাহ, হিমাইরের রাজা, বানু আল হারিস ইবনে কাব, হামদান , তবাদী ইবনে হাতিম, ফারওয়াহ ইবনে মালিক আল মুরাদি, সারাদ ইবনে আবদ আল্লাহ আল আযাদি, ফারওয়াহ ইবনে আমর আল যিযামি উল্লেখযোগ্য। যে কেউ লক্ষ্য করবেন যে, ইবনে ইসহাক তাঁর বর্ণনায় অনেকগুলো কবিতার অবতারণা করেছেন।

ইবনে সা'দ[৪] বর্ণনায়র ভেতরে প্রবেশ করেন। তিনি প্রতিনিধি দলের বিষয়গুলো বিস্তারিত ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তবে তাঁর বেশীর ভাগ বর্ণনাই আল ওয়াকিদি ও হিশাম আল কালবির মাধ্যমে এসেছে। তারা উভয়ই *মাতরূক*। অল্পকিছু ছাড়া অন্য বর্ণনাগুলো এসেছে *সাদুক* আলী ইবনে মুহাম্মদ আল সাদায়নির মাধ্যমে। ইবনে সা'দ যতগুলো সনদ ব্যবহার করেছেন তার কতগুলো দুর্বল বর্ণনাকারীদের কারণে আবার কতগুলো *মুরসাল* হওয়ার কারণে ক্রটিযুক্ত। ইবনে সা'দের বর্ণনাগুলোর মধ্যে কিছু বর্ণনা আফ্‌ফান ইবনে মুসলিম এবং আরিস ইবনে আল ফায্‌ল আল ফাযুলির মাধ্যমে এসেছে।

ঐতিহাসিকদের বর্ণিত প্রতিনিধি দলের বিস্তারিত এ বর্ণনাগুলো মুহাদ্দিসদের নিয়ম অনুযায়ী *সহীহ* হিসাবে প্রমাণিত হয়নি। প্রতিনিধিদলের আবার কিছু কিছু বর্ণনা *সহীহ*। এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু কিছু বর্ণনায়র *সহীহ* সনদ রয়েছে।[৫] ইমাম আল বুখারী বানু তামিম গোত্রের প্রতিনিধিদল আসার ব্যাপারে উল্লেখ করেন। *সূরা হুযুরাতে* বানু তামিমের লোকেরা কি আচরণ করতো সে ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা ছিল বদমেজাজী ও বদস্বভাবের। যেমন, তারা রাসূল (সা) কে উচ্চ: স্বরে ঘরের বাইরে থেকে ডাকাডাকি করছিল। এর জন্য তারা কোন অনুমতিও গ্রহণ করেনি। মুসলমানদেরকে আচরণ শেখানোর জন্য *সূরা হুযরাত* নাযিল হয়েছিল। রাসূল (সা) এর সাথে শিষ্ঠাচারমূলক সম্বোধন এবং তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নেয়ার বিষয়টি এ সূরার মাধ্যমে শেখানো হয়েছিল।

আল বুখারী আরো উল্লেখ করেন যে, আবদ আল কায়েস এবং বানু হানিফার প্রতিনিধিদলও রাসূল (সা) এর কাছে এসেছিল। এর মধ্যে ভন্ড মূসায়লিমাও ছিল। মূসায়লামা ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূল (সা) এর মৃত্যুর পর তার হাতেই নিয়ন্ত্রন হস্তান্তর করতে হবে। রাসূল (সা) তাকে বলেছিলেন সে যদি এক খন্ড খেজুর গাছের ঢালও চায় তাও তাকে দেয়া হবে না। মূসায়লামা ঝগড়া-বিবাদ এবং নির্যাতন করার মত অবস্থা করলেও তাকে কোনভাবেই ছাড় দেয়া হবে না। আল বুখারীর মতে নাযরানের প্রতিনিধিদলও রাসূল (সা) এর কাছে এসেছিল। এদের মধ্যে আবার নাযরানের দু'শাসক আল আকিব ও আল সাইয়্যিদও ছিল। রাসূল (সা) তাদেরকে ইসলাম কবুল করতে বলেন কিন্তু তারা ইসলাম কবুল করতে অস্বীকার করলো।

রাসূল (সা) *মুবাহালা'র* মাধ্যমে তাদেরকে বিচারের সম্মুখীন করলেন। এ সময় কুরআনের আয়াত নাযিল হয় ঃ

> আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তাকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছিলেন। অত:পর তাকে বলেছিলেন, 'হও,' ফলে সে হয়ে গেল। এ সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে, সুতরাং সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে কেউ এ বিষয়ে তোমার সাথে তর্ক করে তাকে বল, আস, আমরা আহবান করি আমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে; অত:পর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহর লানত। (৩:৫৯-৬১)।[৬]

তারা প্রার্থনার মাধ্যমে এরূপ বিচারের সম্মুখীন হতে রাযী হলো। কিন্তু তারা আবার ভয়ে এ সিদ্ধান্ত থেকে নিজেদেরকে প্রত্যাহার করে নিল। তারা মনে করলো যে, এ রায় তাদের বিরুদ্ধে যাবে। তারা *জিয্য়ার* বিনিময়ে শান্তি চুক্তি করতে চাইল। রাসূল (সা) আবু ওবায়দা আমর ইবনে আল জাররাহকে *জিয্য়া* আদায়ে তাদের সাথে পাঠালেন। নাযরানের লোকদের সাথে *জিয্য়ার* বিনিময়ে ইসলামের যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেল তাতে বাইজেন্টাইনদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। এর ফলে মুসলমানগণ বাইজেন্টানের কাছ থেকে নিরাপত্তা পেল যার কারণে মুসলমানগণ সিরিয়ার বাইজেন্টাইনদের মোকাবেলা করার জন্য বড় ধরনের প্রস্তুতি নিতে থাকলো।

আল বুখারী ইয়েমেনের লোকদের এবং আশারি লোকদের প্রতিনিধিদলের আসার কথাও উল্লেখ করেছেন। ইয়েমেনের লোকদের মধ্যে ছিল মূসা এবং তায়ে'র লোকজন। এ ছাড়া বুখারী আদী ইবনে হাতিম আল তাই-য়ের আসার কথাও উল্লেখ করেন।

ইবনে আব্বাস বলেন যে, বানু সা'দ ইবনে বকর মদীনায় দিমাম ইবনে সালাবাহকে পাঠান। সে ছিল কঠিন প্রকৃতির লোক। মাথায় ছিল ঘন চুল, সে তাঁর চুল দু'ভাগে পরিপাটি করে রাখতো। মসজিদের দরজায় সে তাঁর উটকে বসালো আর তার পাগুলো বেঁধে দিলো। এরপর সে রাসূল (সা)ও তাঁর সাথীদের সাথে বসেছিল। সে জিজ্ঞাসা করলো, "আপনাদের মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র কে?" রাসূল (সা) বললেন, "মুহাম্মদ?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ"। দিমাম বললো, "হে মুহাম্মদ, আমি আপনাকে কিছু সাধারণ প্রশ্ন করতে চাই। রাগ করবেন না, কারণ আমি আপনার সাথে রাগ করিনি।" রাসূল (সা) বললেন, তোমার কি প্রশ্ন আছে করতে পার" দিমাম বললো, "আল্লাহর শপথ করে বলছি, আল্লাহ আপনাকে বলেছেন যে, আমাদেরকে তার ইবাদত করতে হবে। এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না। আর আমাদেরকে মূর্তি পূজা ত্যাগ করতে হবে এবং তার বিরোধীদেরকে ত্যাগ করতে হবে। যাদের নামে আমাদের পূর্ব পুরুষগণ উপাসনা করে গেছে? রাসূল (সা) বললেন, "*আল্লাহুম্মা*, হ্যাঁ।"

এরপর দিমাম ইসলামের ফরয কাজগুলোকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করতে লাগলো। প্রত্যেকবারই আল্লাহর উপর শপথ করে দিমাম বলে যাচ্ছিল। তার কথা শেষ হওয়ার পর সে বললো, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আপনি তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি সবগুলো দায়িত্বই পালন করবো, আপনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকবো। এর চেয়ে আমি কমও করবো না বেশীও করবো না।" এর পর দিমাম চলে গেলেন। রাসূল (সা) বললেন, "সে যা বলে তা যদি করে তা হলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

এর পর দিমাম তার লোকদের কাছে চলে গেলেন। লোকদের সামনে সে লা'ত ও উজ্জা করলো। তার কথা শুনে তারা বললো, "ও দিমাম, কুষ্ঠরোগ ও পাগলামী থেকে সাবধান! "দিমাম বললো" তোমাদের উপর অভিশাপ, আল্লাহর শপথ। এ দু'টি মূর্তি তোমাদের কোন উপকার বা ক্ষতি কোনটাই করতে পারে না। আল্লাহ একজন রাসূল পাঠিয়েছেন এবং পবিত্র গ্রন্থ পাঠিয়েছেন যা তোমাদেরকে তোমাদের বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, আমি এখন তাঁর কাছ থেকে এসেছি। তিনি তোমাদের যা করতে বলেছেন আর যা নিষেধ করেছেন আমি তাই নিয়ে এসেছি।" আল্লাহর হুকুমে সন্ধ্যা নেমে এলো। নারী-পুরুষ যারা উপস্থিত ছিল তারা সবাই ইসলাম কবুল করলো।[৭]

এসব আলোচনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হিজরীর নবম বছরে বিভিন্ন প্রতিনিধিদল, বিভিন্ন গোত্র ইসলাম গ্রহণের জন্য মদীনায় এসেছিল। বর্ণনায়র মূল পাঠ্যাংশকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে বিবেচনা করতে হবে। যেসব কবিতাকে কঠিন ব্যবস্থা

হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সেগুলো যাচাই করে দেখতে হবে।

হিজরীর নবম বছরে আরব উপদ্বীপে ইসলাম বিস্তার লাভ করে। ইতিহাসে প্রথমবারের মত ইসলামের পতাকাতলে উপদ্বীপের মানুষ একতাবদ্ধ হয়। যদিও ইসলামের পূর্বেও এ উপদ্বীপের লোকজন আশেপাশের ছোট রাষ্ট্রসমূহের উন্নয়ন ও রাজনৈতিক পদ্ধতি দেখে আসছিল। এর আগে মেই'ন, সাবা, হিমাইর, কান্দা, আল গাসাসিনাহ ও আল মুনাদিরার ন্যায় ছোট ছোট রাষ্ট্রসমূহ আরব উপদ্বীপকে এক পতাকাতলে একতাবদ্ধ করতে সক্ষম হয়নি। বস্তুতপক্ষে এসব ছোট ছোট রাষ্ট্রের সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ইসলাম আগমনের পূর্বে যাযাবর সভ্যতা এসব দেশে প্রভাব বিস্তার করেছিল। মাত্র দশ বৎসরের মধ্যে আরব উপদ্বীপের মধ্যে লোকদের আলাদা আলাদা চরিত্র বৈশিষ্ট্য ও গোত্রসমূহের স্বাতন্ত্র এবং মানুষের *জাহেলী* স্বভাব সত্ত্বেও রাসূল (সা) মানুষকে একতাবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটি লোক দেখানো কোন ভাসাভাসা ঐক্য ছিল না। এটি মানুষের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করেছিল, মানসিকতা ও আচার আচরণের মধ্যেও ঢুকে পড়েছিল। সেজন্য আরব উপদ্বীপ শক্তিশালী ও মযবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় যার উপর ইসলামিক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে। এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল যার কর্তৃত্ব এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

পাদটীকা ঃ

১. আল হাফিয ইবনে হাজার তার প্রতি নির্দেশ করেছেন তবে তিনি বলেন যে, তিনি তাদের মধ্যেকার হাওয়াজিনদের বর্ণনায় অবহেলা করেছেন।
২. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ৪/২২১-২; ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৮/৮৩।
৩. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ৪/২৩৫, ২৪১, ২৫৪, ২৬০।
৪. *আল তাবাকাত আল কুবরা*, ১/২৯১-৩৫৯।
৫. ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৫/৪০।
৬. আবু দাউদ, *সুনান*, ৩/১৬৭; ইবনে সা'দ *তাবাকাত*, ১/৭
৭. আবু দাউদ, *সুনান*, ১/৭৯; আল হাকীম, আল মুসতাদরাক, ৩/৫৪-৫৫; আহমাদ *মুসনাদ*, ইবনে আব্বাসের হাদীস হতে। আল হাকীম এটিকে সহীহ বলেছেন।

   আল জাহাবীও তাঁর সাথে একমত তবে এটি হাসান, কেননা এটি ইবনে ইসহাকের মাধ্যমে এসেছে, এবং তার সাথে মুহাম্মদ ইবনে আল ওয়ালিদ ইবনে যুয়েফি আল আসাদিকেও অর্ন্তভুক্ত করেছে। মুহাম্মদ ইবনে আল ওয়ালিদ *মকবুল*। সালমান ইবনে কুহাইলের মাধ্যমে আবু দাউদের বর্ণনায় একটি *মুতাবাহ* রয়েছে। তিনি *সিকাহ*। দু'ইমাম আল বুখারী ও মুসলিম মদীনায় দিমাম আগমনের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন। *সহীহ* মুসলিম, ১/৩২; সহীহ আল বুখারী, ১/২২।

অধ্যায় ১৯

আবু বকরের নেতৃত্বে হাজ্জ নবম হিজরী

রাসূল (সা) মক্কা বিজয়ের বছরে হজ্ব পালন করেননি। এ বছর তিনি শুধু *উমরাহ* করেই মদীনায় ফিরে আসেন। মুশরিক আর মুসলিম হিজরীর অষ্টম বৎসরে একত্রে হাজ্জ পালন করেন। নবম বৎসরে রাসূল (সা) আবু বকরকে হাজ্জ পালনের জন্য নির্দেশ দিলেন। আবু বকর নির্দেশ অনুযায়ী যিলহজ্জ মাসে হাজ্জ পালনের জন্য যান।[১] তাঁর সাথে কয়জন হাজ্জ করতে গিয়েছিলেন একমাত্র আল ওয়াকিদির বর্ণনায়ই সেটি পাওয়া যায়। তার মতে এ সময় আবু বকরের সাথে ৩০০ জন *সাহাবী* ছিলেন। তারা তাদের সাথে ২০টি কুরবানির পশু নিয়েছিলেন।[২]

যখন আবু বকর হজ্বের উদ্দেশে মদীনা রওয়ানা দেন তখন *সূরা তাওবা* নাজিল হয়। সূরার প্রথম অংশের অর্থ অনুযায়ী রাসূল (সা) আলি ইবনে আবু তালিবকে হাজ্জের খবর প্রচারের জন্য পাঠান। এটি ছিল জ্বিলহজ্জের দশ তারিখ এবং পশু কুরবাণীর দিন। রাসূল (সা) বললেন, "আমার গৃহের একজন ছাড়া আর কেউ এ খবর প্রচার করতে পারবে না।"[৩] আবু বকর যখন আলীকে দেখলেন তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কি কোন নির্দেশ করতে বা কোন নির্দেশ পৌছাতে এসেছেন? তিনি উত্তরে বললেন, "নির্দেশ পৌছে দিতে এসেছি।" তারা একত্রে এগিয়ে চললেন।[৪]

আবু বকর হজ্বের *আমীর* হিসাবে আর আলী সূরা *তওবার* প্রথম অংশের প্রচারের জন্য। আবু হুরায়রার ন্যায় কোন কোন সাহাবী মানুষের কাছে এ দাওয়াত পৌছায়ে দেয়ার কাজে সাহায্য করলেন।[৫]

আলী ইবনে আবু তালিবকে চারটি নির্দেশসহ পাঠানো হয়েছিল ঃ

"কোন অবিশ্বাসী বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না; কোন বিবস্ত্র লোক কাবা তওয়াফ করতে পারবে না, এ বছরের পর কোন *মুশরিক* হাজ্জ করতে পারবে না; রাসূল (সা) এর সাথে যারা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে এ চুক্তি তার মেয়াদকাল পর্যন্তই বলবৎ থাকবে।"[৬]

সূরা তাওবার প্রথম অংশ মুসলমান ও পৌত্তলিকদের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করেছিল। নবম বৎসরের পর হতে কোন পৌত্তলিক আর হাজ্জ করতে আসতে পারবে না। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হলো। মুসলমানদের সাথে যাদের চুক্তি ছিল তার কারণে তারা চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম পেল। এর পরে মুসলমানদের সাথে যে চুক্তি ছিল সে অনুযায়ী তাদেরকে অসীম সময় দেয়া হলো বা দশই যিলহজ্জ হতে চার মাসের জন্য এ সময় বেঁধে দেয়া হলো। যাদের সাথে কোনরূপ চুক্তি ছিল না এ চুক্তির ফলে পবিত্র মাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত ৫০ দিন সময় বেঁধে দেয়া হলো। এ

সময় ছিল মুহাররমের শুরু হওয়া পর্যন্ত। এসময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করবে।[৭]

> ইহা সম্পর্কচ্ছেদ আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ হতে সেই সমস্ত অংশীবাদীর সাথে যাদের সাথে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে। অতঃপর তোমরা দেশে চার মাস কাল পরিভ্রমণ কর ও জেনে রাখবে যে তোমরা আল্লাহকে হীনবল করতে পারবে না এবং আল্লাহ *কাফিরদেরকে* লাঞ্ছিত করে থাকেন। মহান হজ্জের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে মানুষের প্রতি ইহা এক ঘোষণা যে, আল্লাহর সাথে অংশীবাদীদের কোন সম্পর্ক রইলোনা এবং তার রাসূলের সাথেও নয়; তোমরা যদি তাওবা কর তবে তোমাদের কল্যাণ হবে; আর তোমরা যদি মুখ ফিরাও তবে জেনে রাখবে যে, তোমরা আল্লাহকে, হীনবল করতে পারবে না, এবং কাফিরদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও (৯:১-৩)।

ইসলাম প্রচারের বারো বছর পার হয়ে গিয়েছে। মুসলমানগণ ইসলাম প্রচারে সকল অনুমোদিত পন্থায় যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। *জাহিলিয়াতের* ধর্মীয় আচার অনুসারে মুশরিকরা মূর্তি পূজা করে আসছিল এবং কাবাগৃহ *তওয়াফ* করে আসছিল। এখন সময় এসেছে তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের আর তাদের গোয়ার্তুমি ও মূর্খতা পরিহার করে সত্যের পথে দাখিল হওয়ার।

বিষয়টি এখানেই সীমাবদ্ধ থাকলো না; সতর্কতামূলক অভিযান, ইসলামের প্রচার, দূর-দূরান্তের ইসলামী সংগঠনের বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার গতি লাভ করলো। এর সবগুলোই ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে চলে আসলো। বিদায় হজ্জের পূর্বে রাসূল (সা) ইয়েমেনের প্রদেশ শাসনে আবু মূসা আল আশারী এবং মুয়ায ইবনে জাবালকে প্রেরণ করেন। রাসূল(সা) তাদের উভয়কে বললেন, "মানুষের জন্য জিনিস সহজলভ্য করে দেবে, মানুষের জন্য কোন জিনিস কঠিন করো না। মানুষের সাথে দয়া ও বিনম্র আচরণ করবে। তাদের প্রতি কঠোর হবে না। মানুষকে শুভ সংবাদ দেবে। তাদেরকে তাড়িয়ে দিও না।"[৮] তিনি মুয়াযকে বললেন ঃ

তুমি আহলে কিতাবদের কাছে আসবে। যখন তুমি তাদের কাছে পৌছবে, তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করার অধিকার কারোরই নেই আর মুহাম্মদ তাঁর রাসূল। তারা যদি তোমার কথা শুনে তখন তাদেরকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে বলবে। তারা যদি তোমার কথা শুনে তখন তাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের কথা বলার সাথে সাথে *সাদাকার* (যাকাত) কথা বলবে। সাদাকা ধনীদের কাছ থেকে আদায় করে গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে দিতে হবে। তারা যদি তোমার এ কথা মানে তখন তাদের সাথে সতর্ক আচরণ করবে। তাদের সর্বোত্তম সম্পত্তি (যাকাত হিসাবে) নিয়ে যেও না। মযলুম ব্যক্তির বদদোয়াকে ভয় করবে। মযলুমের ফরিয়াদ আর আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা থাকে না।[৯]

রাসূল (সা) প্রথমে খালিদ ইবনে আল ওয়ালিদকে ইয়েমেনে পাঠান, এরপর তার স্থলে আলী ইবনে আবু তালিবকে পাঠানো হয়। রাসূল (সা) এর সাথে হাজ্জ পালনের জন্য আলী সেখানে অবস্থান করেন। আলী হামাদান গোত্রের মধ্যে ইসলাম প্রচারে সফল হয়েছিলেন।[১০]

পাদটীকা ঃ

১. ইবনে সা'দ একটি সহীহ সনদ সহ বর্ণনা করেন। মুজাহিদদেরও এর পেছনে সমর্থন আছে। *আল তাবাকাত আল কুবরা*, ২/১৬৮)। ইবনে ইসহাক, সীরাত ইবনে হিশাম, ৪/২১০।

২. ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৮/৮২।

৩. ইবনে ইসহাক, *হাসন সনদসহ*, তবে এটি মুহাম্মদ ইবনে আলী আল বাকীর এর মুরসাল হাদীস (*সীরাত ইবনে হিশাম*, ৪/২০৪; আল তাবারী, *তাফসীর*, ১০/৬৫)। এর সমর্থনে রয়েছে *শাওয়াহিদ*, তাদের দ্বারা এটি জোরালো হয়েছে।
ইবনে কাছির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৫/৩৭-৮।

৪. প্রাগুক্ত।

৫. আহমাদ, মুসনাদ, হাদীস নং, ৫৪৯, *সহীহ সনদ সহ*; আল তিরমিজী। *সুনান*, ৪/১১৬, তিনি এটিকে সহীহ বলেছেন; আত তাবারী, *তাফসীর*, ১০/৬৩-৪।

৬. ইবনে কাসির, আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া, ৫/৩৮। আহমাদ, *মুসনাদ* হতে; তিনি বলেন, "এর *সনদ জায়্যিদ*"

৭. আল তাবারী, ১০/৬৬, ৭৪। বিভিন্ন বর্ণনায়র মধ্যে তাবারী এটিকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলেছেন। ইবনে কাসির বলেন *সহীহ* বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ মুসলমানদের সাথে যাদেরই চুক্তি হয়েছে, চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত চুক্তি ভংগ থেকে বিরত থাকবে, এটি যদি চার মাসের বেশীও হয়, কারো সাথে কোন চুক্তি না থাকলেও তার বিরতি চারমাস পর্যন্ত চলতে থাকবে। এ দলটি সম্ভবত প্রথমটির সাথে যোগ দিয়েছে, যাতে চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরতি চলতে থাকে। এর মেয়াদ যদি চারমাসের চেয়ে কমও হয়। এসব কর্মকান্ডে চারমাসের বিরতি দেয়া হবে, এর কারণ যাদের সাথে কোন চুক্তি নেই তাদের উপর এর অগ্রাধিকার রয়েছে। আল্লাহ সবচেয়ে ভাল জানেন।

৮. আল বুখারী বর্ণনা করেছেন (ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৫/৯৯)।

৯. প্রাগুক্ত।

১০. আল বুখারী কর্তৃক বর্ণিত (ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৫/১০৪)।

অধ্যায় ২০

বিদায় হাজ্জ

ইসলামে *হাজ্জ* পাঁচ ফরযের একটি ফরয। বিভিন্ন বর্ণনায়র[১] ভিত্তিতে হিজরতের দশম, নবম বা ষষ্ঠ বৎসরে *হাজ্জ* ফরজ করা হয়। হিজরতের দশম বৎসরে রাসূল (সা) ঘোষণা করেন যে, তিনি হাজ্জ পালন করবেন। মদীনায় হিজরতের পর এবারই তিনি হাজ্জ করলেন। আরব উপ-দ্বীপের সবাই তাঁর সাথে হাজ্জ করতে সমবেত হয়েছে। যিলহাজ্জ মাস শেষ হওয়ার পাঁচ দিন পূর্বেই তিনি মদীনা থেকে রওয়ানা দেন।[২] তিনি যখন আরাফাত মাঠে থাকেন তখন কুরআনের নিম্ন বর্ণিত আয়াত নাযিল হয়।

> "...আজ আমি তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম, আর জীবনব্যবস্থারূপে ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম... (৫:৩)[৩]

মুসলমানগণ রাসূল (সা) এর কাছ থেকে হাজ্জের আচার অনুষ্ঠানগুলো শিখে নিলেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, "আমার কাছ থেকে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগুলো গ্রহণ কর।" তাঁর হাজ্জ ছিল *শরীয়ার* বিধি-বিধানে পরিপূর্ণ। আরাফাতের ময়দানে তাঁর ভাষণে সাধারণ নিয়মকানুন সম্পর্কে নসিহত করা হয়েছে। এ কারণেই বিদায়হাজ্জের ব্যাপারে পন্ডিতগণ বেশী বেশী আগ্রহ দেখিয়েছেন। বিদায় হাজ্জ থেকে অনেকগুলো বিধান জারী হয়েছে। রাসূল (সা) এর ভাষণ থেকেও হাজ্জ ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক বিধি বিধান জারী হয়েছে। এসব বিধি বিধানের ব্যাখ্যাতেই ফিকহ ও হাদীসের গ্রন্থগুলো ভরপুর। কোন কোন পন্ডিত বিদায় হাজ্জের উপরই বিশেষভাবে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

বিদায় হজ্জে বিশাল জনসমাবেশ হয়। সবাই আরাফাতে দেয়া বিদায় হজ্জের ভাষণ *খুতবাতুল ওয়াবিদা* শুনেন। তিনি এ ভাষণ দেন *আইয়্যাম আল তাশরীক* এর মাঝামাঝি সময়ে। (দশই যিল হজ্জের পরের তিন দিবস)।

> "এ মাসে তোমাদের এ ভূমিতে আজকের দিনটি তোমাদের নিকট যেমন পবিত্র, অবশ্যই তোমার জীবন, তোমার সম্পত্তিও অপরের নিকট তেমনি পবিত্র এবং অলংঘনীয়। তোমরা শোন, *জাহিলিয়া* যুগের সব নিয়ম পদ্ধতি আমার পদতলে, সবগুলোই আজ ধ্বংস হয়েছে। *জাহিলিয়্যা* যুগের সব খুনের প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার বাতিল করা হলো। আমি সর্বপ্রথম রবী'আ ইবনে হারিসের পুত্রের খুন অর্থ্যাৎ তার খুনের প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার বাতিল করলাম। *জাহিলিয়্যা* যুগের সুদ বাতিল করা হলো। সর্বপ্রথম স্বগোত্রীয় মহাজনের সুদ অর্থ্যাৎ (আমার চাচা) আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সুদ বাতিল করলাম। নারীদের সম্পর্কে তোমরা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে গ্রহণ করেছ। নিশ্চয় তোমাদের যেমন নারীদের উপর হক আছে তদ্রুপ নারীদেরও

তোমাদের উপর হক আছে। তুমি যাদেরকে পছন্দ কর না তাদেরকে তোমার বিছানায় বসতে দেয়া উচিত নয় কিন্তু এর পরও তারা যদি তা করে তা হলে তাদেরকে বেত্রাঘাত কর তবে কঠোরভাবে নয়। তোমার উপর তাদের অধিকার আছে তোমার কাছ থেকে মানসম্মত ভাবে অন্ন-বস্ত্র পাওয়ার। আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব রেখে গেলাম। এটি অনুসরণ করে চললে কখনো পথ ভ্রষ্ট হবে না। পুনরুত্থান দিবসে আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। (এখন বল) তোমরা কি বলবে? জনগণ সমস্বরে বলল, আমরা সাক্ষ্য দেব, আপনি আল্লাহর পয়গাম আমাদেরকে পৌছায়ে দিয়েছেন, আপনার পয়গাম্বরীর কর্তব্য আপনি সম্পন্ন করেছেন, আমাদেরকে আপনি সদুপদেশ দিয়েছেন। এ উত্তর শুনে তিনি আকাশের দিকে তিনবার অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, "হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থেকো, হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থেকো, হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থেকো"[৪]

তিনি মদীনায় পৌছে আরেক ভাষণ দেন এবং বলেন, "তোমরা কুফরীর দিকে ফিরে যেয়ো না, আমার ওফাতের পর একে অপরের মুন্ডুপাত করো না।"[৫]

বিদায় হাজ্জ থেকে ফিরে আসার পথে রাসূল (সা) আঠারই যিলহজ্জে আল যাহফা'র কাছে আল গাদির খুমে আরেক জনসমাবেশে ভাষণ দেন। এ সময় তিনি আলী ইবনে আবু তালিবের হাত উপরে তুলে ধরে বললেন, "আমি তারই বন্ধু যার বন্ধু আমি নিজে।" আলী ইয়েমেন থেকে ফিরে এসে বিদায় *হাজ্জ* পালন করলেন।[৬] কিছু সৈনিক তার বিরুদ্ধে অভিযান করেছে, সে তাদের সাথে কড়া আচরণ করেছে। সে তার ডিপুটির বিতরণকৃত বস্ত্র ফেরৎ নিয়েছে। তারা যেন তাদের অভিযোগ উত্থাপন বন্ধ করে সে জন্য গাদির খুমে রাসূল (সা) আলীর মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করেন এবং তার গুণাবলীর বিষয়ে বলেন।[৭]

পাদটীকা ঃ

১. ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৫/১০৯।

২. ইবে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৪/১০৪; ইবনে ইসহাক, হাসান সনদ সহকারে। সীরাত ইবনে হিশাম, ৪/২৭২। ইবনে কাসির, আল *বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*। ৫/১১১। এটি ইবনে ঈসহাকের বর্ণনায় অনুরূপ। তিনি বলেন, "এর সনদ জায়্যিদ।"

৩. *সহীহ আল বুখারী*, (*ফাতহুর বারী*, ৮/১০৮)।

৪. *সহীহ আল মুসলিম*, ৪/৩৮-৪৩। যাবির ইবনে আবদুল্লাহ'র হাদীস হতে। আল শায়খ মুহম্মদ নাসির আল দীন আল আলবানী -এর সাথে কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। অন্য হাদীসের গ্রন্থ হতে যাতে কিছু *সহীহ* সংযোজনসহ যাবিরের হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। (হুজ্জাত আল নবী, পৃ. ৭১-৭৩, দেখুন, *হুজ্জাত আল নবী'তে* যাবিরের *হাদীসের* বর্ণনা; ৩৮-৪১)

৫. দেখুন, *সহীহ আল বুখারী* ও *ফাতহুর বারী'*তে বর্ণিত খুতবার অংশ বিশেষ, ৮/১০৮। ইবনে ইসহাক *সনদ* ছাড়া বিদায় হাজ্জের লম্বা ভাষণের বর্ণনা দেন। ইমাম আহমেদ বিদায় হজ্জের লম্বা খুতবার বর্ণনা দেন, এ ভাষণ দেয়া হয় *আইয়্যাম আল তাশরীকের* মাঝামাঝি সময়ে। এর সনদে রয়েছে আলী ইবনে যায়িদ ইবনে যাদান'র নাম, আল তাগরিবে আল হাফিয ইবনে হাজার যা বলেছেন তার ভিত্তি দুর্বল। আল বান্না বলেন, "আল বায্যারও ইবনে উমর হতে একই অর্থ সহ একই বর্ণনা ভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন।" হাদীসের ইমামগণ তাদের গ্রন্থ সমূহে এর অংশমাত্রই বর্ণনা করেছেন। তারা তাদের গ্রন্থে *সহীহ* সনদের ভিত্তিতে বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ ভাল জানেন। (*আল ফাতহ আল রাব্বানী*, ২৭৯-২৮১)।

৫. *সহীহ আল বুখারী, ফাতহুর বারী*, ৮/১০৭, সহীহ মুসলিম ১/৮২।

৬. ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৫/২০৯। তাঁর মতে হাদীস সমূহের সনদ ছিল জায়্যিদ কাবী এবং তিনি এগুলো অন্য সনদ সহ বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে একটি আল যাহাবী *সহীহ* মনে করেন। ৫/২১২, তিনি এতে রাসূল (সা) এর উক্তি উপস্থাপন করেন। "হে আমাদের প্রভু, তার তুমি বন্ধু হও, যে আলীর বন্ধু হয়েছে, তুমি তার শত্রু হও যে আলীর শত্রু হয়েছে। সনদ সম্পর্কে তিনি বলেন এটি *জায়্যিদ সনদ*।" *সুনানের* শর্তানুযায়ী এর মানুষগুলো *সিকাহ*।" আল তিরমিযী আরেকটি হাদীসকে একই সনদসহ *সহীহ* বলেছেন।

৭. প্রাগুক্ত। ৫/১০৬।

অধ্যায় ২১

উসামা ইবনে যাইদ ইবনে হারিসার বাহিনীকে অস্ত্রসজ্জিতকরণ

বিদায় হাজ্জের পর রাসূল (সা) মদীনায় ফিরে আসেন। হিজরীর দশম বৎসরের যিলহজ্জের অবশিষ্টাংশ, মুহাররম ও সফরের সময়টুকু পার হয়ে গেল। এরপর তিনি সিরিয়া অভিযানের জন্য বাহিনী প্রস্তুতির কাজ শুরু করে দেন। উসামাহ ইবনে যাইদ ইবনে হারিসাকে তিনি সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং আল বিকলা ও ফিলিস্তিনের দিকে অগ্রসর হতে বলেন। বাহিনীর অন্য সবাই প্রস্তুতি নিল। তাদের মধ্যে মুহাজির ও আনসার ছিলেন। আবুবকর ও উমরের সাথে মাত্র আঠার বছরবয়সের উসামা ইবনে যাইদও ছিলেন। বাহিনীর কেউ কেউ বলতে থাকে যে, বয়োজ্যেষ্ঠ *আনসার* ও মুহাজিরের উপর উসামাকে সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া উসামা ছিলেন মুক্তিপ্রাপ্ত ও খুবই অল্পবয়স্ক। রাসূল (সা) তাদের কোন কথা শুনলেন না। তিনি তাদেরকে তার সাথে ভাল ব্যবহারের নির্দেশ দেন।[১] কিন্তু অভিযান পরিচালনা দেরি হয়ে গেল। অভিযানের প্রস্তুতি শুরু হওয়ার দু'দিন পর রাসূল (সা) অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাসূল (সা) নিজে উসামার পতাকাটি বেঁধে দিয়েছিলেন। উসামা আল যারফ-এ তাঁবু খাটান।[২] একমাত্র আল ওয়াকিদিই বলেছেন যে, উসামার বাহিনীতে ৩,০০০ জন লোক ছিলেন।[৩]

পাদটীকা ঃ

১. দেখুন, আল বান্না আল সা'তি, আহমাদ আবদ আল রাহমান, *আল ফাতহুর রব্বানী*, ২১/২২১-২২৩।

২. ইবনে হিশাম, *সহীহ*, ৪/৩২৮; ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৮/১২৫।

৩. ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৮/১৫২।

অধ্যায় ২২

রাসূল (সা)-এর ইন্তিকাল

বিদায় হজ্জের[১] প্রায় তিন মাস পর রাসূল (সা) অসুস্থ হয়ে পড়েন, মায়মুনার[২] কক্ষে তাঁর অসুস্থতা শুরু হয়েছিল। অসুস্থতা দশদিন[৩] পর্যন্ত স্থায়ী হয়। তিনি বারই রবিউল আউয়াল[৪] তেষট্টি বছর বয়সে[৫] ইন্তেকাল করেন। সহীহ আল বুখারীতে আছে খায়বার বিজয়ের ঠিক সপ্তম বৎসরে তাঁর শরীরে সমস্যা দেখা দেয়। খায়বার বিজয়ের পর তিনি সালাম ইবনে মাসকাশের স্ত্রীর দেয়া বিষ মিশ্রিত এক টুকরা গোশ্‌ত খাওয়ার পর থেকে তাঁর এ সমস্যার শুরু হয়। রাসূল (সা) গোশ্‌তের টুকরা বমি করে ফেলে দেন। তিনি এটি গিলে ফেলেন নি। এরপরও বিষের ক্রিয়া নষ্ট হয়নি।[৬] তিনি তাঁর স্ত্রীদেরকে বললেন, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশার[৭] গৃহে তাঁকে নেয়ার জন্য। সেখানে যেন তাকে সেবা দেয়া হয়। আয়শা তাঁর নিজ হাতে তাঁর দেহ মুছে দিচ্ছিলেন। কুরআনের[৮] শেষ দু'সূরা পড়ে তাঁর দেহ মুছে দিচ্ছিলেন।

অসুস্থতা বাড়ার সাথে সাথে তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে আসছিল। তিনি এসময় সাহাবীদেরকে বললেন "আমি কি তোমাদের জন্য কিছু লিখে রেখে যেতে পারি না, যা তোমাদের বিপথে পরিচালিত করবে না?" তাঁর একথায় তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল ঃ উপস্থিত কেউ কেউ লিখনসামগ্রী নিয়ে আসতে চাইলেন। কেউ বললেন এতে তাঁর কষ্ট বেড়ে যাবে। রাসূল (সা) এর লিখনসামগ্রী নিয়ে আসার জন্য যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে অনেকের মতে লিখনসামগ্রী আনার বিষয়টি নির্দেশের মত ছিল না। ছিল অনেকটা পরামর্শের মত। উমর বললেন, "আল্লাহর কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট।" রাসূল (সা) তাঁর লিখনসামগ্রী নিয়ে আসার বিষয়টি পুনরায় উল্লেখ করেন নি। রাসূল (সা) যা বলতেন তাদের জন্য তা বাধ্যতামূলক ছিল। অতীতেও সেরূপ হয়েছে। তিনি এর পূর্বে যখন অসুস্থ হতেন তিনি এরূপ করতেন। একবার অসুস্থ হয়ে তিনি পৌত্তলিকদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দেয়ার জন্য মৌখিকভাবে বলেছিলেন আর প্রতিনিধি দলের লোকদেরসাথে সম্মান আর উদারতাপূর্ণ ব্যবহার করার কথা বলেছিলেন।[৯]

তিনি ফাতিমাকে তাঁর কাছে ডেকে আনলেন, গোপনে তাঁর কাছে কিছু যেন বললেন। এরপর তাঁকে ডেকে আবার গোপনে কিছু বললেন। এবার তিনি হাসলেন। রাসূল (সা) এর মৃত্যুর পর ফাতিমা বলেছিলেন যে, রাসূল (সা) এর জীবনমৃত্যুর কথাটিই রাসূল (সা) তাকে বলেছিলেন। সেজন্য ফাতিমা কেঁদেছিলেন। এরপর রাসূল (সা) তাকে বলেছিলেন যে, তাঁর পরিবারের মধ্যে তিনিই সবার আগে তাঁর সাথে মিলিত হবেন। সে জন্য তিনি হেসেছিলেন।[১০] ঘটনা তাই হলো। পয়গাম্বরীর এটি একটি নমুনা।

তাঁর অসুস্থতা আরো বেড়ে গেল। অসুস্থতার জন্য তিনি সালাত পড়াতে পানেনি। তিনি বললেন, "আবু বকরকে সালাত পড়াতে বল।" আয়শা এটি পছন্দ করলেন না। তিনি মনে করছিলেন মানুষ এটিকে খারাপ মনে করবে। আয়শা বললেন, "আবু বকর ভদ্রলোক মানুষ, তার স্বর কোমল, তিনি কুরআন পড়ার সময় অঝোরে কাঁদেন।"[১১] রাসূল (সা) বার বার বলার পর আবু বকর সালাতে ইমামতি করলেন।[১২] রাসূল (সা) আল আব্বাস ও আলীর সাহায্যে এবার ঘর থেকে বের হয়ে এলেন, সালাতে ইমামতি করলেন। বক্তব্য রাখলেন, তাতে তিনি আবু বকরের প্রশংসা করলেন, তার গুণাবলীর প্রশংসা করলেন। রাসূল (সা) ইশারা করে বললেন, আল্লাহ তাকে দু'নিয়ায় ও আখেরাতের মধ্যে যেকোন একটি বেছে নিতে বললেন। তিনি আখেরাতকেই বেছে নিলেন।[১৩]

তিনি সবশেষ খুতবা দেন তাঁর মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে। খুতবায় তিনি বলেন, "আল্লাহর একজন গোলাম, তাঁকে এ বিশ্ব, এ বিশ্বের সৌন্দর্য দেখানো হয়েছে, তিনি আখেরাতকে পছন্দ করেছেন।" আবু বকর বুঝলেন এটি তার নিজেকে বুঝানো হয়েছে। আবুবকর কাঁদলেন। লোকজন আশ্চর্য হয়ে তার দিকে তাকালো, তবে তারা এর অর্থ বুঝতে পারলো না।[১৪]

মৃত্যুর দিন রাসূল (সা) ফজরের সালাতের সময় আয়শার ঘরের পর্দা সরায়ে সালাতের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো মুসলমানদের দিকে দেখলেন। তাদের দেখে মৃদু হাসলেন আর জোরে হাসলেন। মনে হচ্ছিল তিনি তাদেরকে বিদায় জানাচ্ছেন। তিনি ঘর থেকে বের হয়ে এসেছেন এতে মুসলমানগণ খুশি হয়ে উঠলো। আবু বকর পেছনে সরে এলেন কারণ তিনি বুঝছিলেন যে, রাসূল (সা) সালাতে ইমামতি করার জন্য বের হয়ে আসছেন। কিন্তু রাসূল (সা) আবু বকরকে হাত দিয়ে ইশারা করে সালাত শেষ করতে বললেন। রাসূল (সা) সালাত পড়ে গৃহে গিয়ে পর্দা টেনে দিলেন।

ফাতিমা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার বাবার জন্য এটি কষ্টের।" রাসূল (সা) ফাতিমাকে বললেন, "তোমার পিতা আজ থেকে আর কোন কষ্ট পাবে না।"[১৫]

উসামা ইবনে যায়িদ গৃহে ঢুকলেন। রাসূল (সা) নীরবে ইশারায় তার জন্য দোয়া করলেন। তিনি যন্ত্রণার জন্য কথা বলতে পারছিলেন না।[১৬]

মৃত্যু যখন এসে গেল তিনি আয়শার কোলে হেলান দিয়েছিলেন। আয়শা তার ভাই আবদুর রহমানের কাছ থেকে একটি মেছওয়াক নিয়ে এর মাথা চিবায়ে নরম করে দিলেন। রাসূল (সা) এটি দিয়ে দাঁত পরিস্কার করে নিলেন।[১৭]

পানির পাত্রের ভিতরে হাত দিয়ে পানিতে মুখমন্ডল ধুয়ে নিলেন আর বললেন, "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ,[১৮] মৃত্যুর যন্ত্রণা"। তিনি যখন কথা বলছিলেন তাঁর গলা ভরি হয়ে আসলো... যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, তাদের সঙ্গী হবে এবং এবং তারা কত উত্তম সংগী ..." (৪:৬৯),[১৯] এবং আল্লাহর করুণাপ্রাপ্ত বেহেশতের সাথী হবে"। আয়শা বুঝতে পারলেন, তিনি বেহেশতে প্রশংসিতদের সাথী হওয়াকে পছন্দ করে নিয়েছেন।[২০]

তার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, আয়শার কোলে থাকা অবস্থায় পূর্বাহ্নে কারো মতে মধ্যাহ্নে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। এ সময় আবু বকর আল মদীনায় উপস্থিত ছিলেন না। আল সানা থেকে এসে তিনি রাসূল (সা) এর মুখের কাপড় সরায়ে তাঁর দেহের উপর ঝুঁকে গিয়ে তাঁকে চুমু দিলেন। এরপর লোকদের কাছে গেলেন। লোকদের কেউ এ খবর বিশ্বাস করলো আর কেউ করল না। লোকদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হলো। তিনি এসময় দেখলেন 'উমর মানুষদের সাথে কথা বলছিলেন আর রাসূল (সা) এর মৃত্যু সংবাদ অস্বীকার করছিলেন। মানুষ আবু বকরের চারপাশে জড়ো হলো। আবু বকর বললেন, "এতে সন্দেহ নেই, কেউ যদি মুহাম্মদের ইবাদত করে থাকে, তাহলে মুহাম্মদ ইন্তেকাল করেছেন, আর আল্লাহর ইবাদত করে থাকলে আল্লাহ জীবিত আছেন, আল্লাহর কখনো মরণ নেই।"

আল্লাহ বলেন ঃ

> মুহাম্মদ মানুষ ব্যতীত কিছু নয়, তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। সুতরাং সে যদি মারা যায় অথবা নিহত হয় তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহর ক্ষতি করবে না বরং আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন। (৩:১৪৪)

জনতা চুপ হয়ে গেল। উমর মাটিতে বসে পড়লেন। তার পা তার ভর নিতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল ঐ সময় ছাড়া তারা আর কখনো এ আয়াত শুনেননি।[২১]

ফাতিমা, আল্লাহ তোমার উপর রহমত বর্ষণ করুক, উমর বললেন।

হে আমার পিতা, তিনি আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়েছেন।

হে আমার পিতা, বেহেশতের বাগানে তার বাসস্থান।

হে আমার পিতা, আমরা জিবরাঈলের কাছে তার মৃত্যু ঘোষণা করছি।[২২]

আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

তার পরিবার ও তার সঙ্গীদের উপর।

"সকল প্রশংসা দয়ালু ও দাতা আল্লাহর জন্য যিনি সমস্ত বিশ্বজগতের মালিক।"

আল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন।

পাদটীকা ঃ

১. ইবনে কাসির বলেন যে, রাসূল (সা) বড় হাজ্জের ৮১ দিন পর ইন্তেকাল করেন। *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৫/১০১)।

২. এ বর্ণনাটির ব্যাপারে সবাই একমত হয়েছেন। পরস্পরবিরোধী অন্য বর্ণনাগুলো থেকে জানা যায় রাসূল (সা) কে অসুস্থতার সময়ে জয়নব বিনতে যাহশ বা রিহানা'র গৃহে নেয়া হয়। *ফাতহুর বারী*, ৮/১২৯।

৩. সুলায়মান আল তিমি এর উপর জোর দেন। আল বায় হাকী *সহীহ* সনদ সহকারে এর বর্ণনা দেন। বেশী সম্ভব এ সময় হতে পারে ১৩ দিন। ইবনে হাযার, *ফাতহুর বারী*, ৮/১২৯।

৪. আল হাফিয ইবনে হাজার আবু মিখনাফের বক্তব্য গ্রহণ করেন এবং বলেন যে , তিনি রবিউল আউয়ালের দু'তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। অন্যরা ভুল করে বলেন, "আশার (দশ) থেকে "সানিন" (দু) দিন। ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৮/১৩০।

৫. *সহীহ আল বুখারী*, (ইবনে হাযার, *ফাতহুর বারী*, ৮/১৫০)।

৬. প্রাগুক্ত। ৮/১৩১।

৭. প্রাগুক্ত। ৮/২৭: আহমাদ, *আল মুসনাদ, আল ফাতহুর রাব্বানী*, ২১/২২৬), *সহীহ সনদ* সহ।

৮. *সহীহ আল বুখারী* (ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*), ৮/১৩১

৯. প্রাগুক্ত, ৮/১৩২।

১০. প্রাগুক্ত, ৮/১৩৫।

১১. ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ৮/৩৩০, *সহীহ সনদসহ*; ইবনে কাসির, *আল বিদ্যায়্যা ওয়া আল নিহায়া*, ৫/২৩৩।

১২. ইবনে কাসির, প্রাগুক্ত, ৫/২৩২-৩।

১৩. *সহীহ আল বুখারী*, ইবনে হাজার, *ফাতহুর বারী*, ৮/২৭। আরও দেখুন, আল মুসনাদ আল ফাতহ আল *রাব্বানী*। ২১/২৩১; ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া*, ৫/২২৯-২৩০।

১৪. আহমাদ, *মুসনাদ* (আল ফতেহ আল রাব্বনী, ২১/২২২, পাদটীকা নং ৩)। *তুরকাত আল নবী*, আল বুখারী কর্তৃক বর্ণিত, মুসলিম, আহমাদ এবং আল বায়হাকী। একটি সনদসহ যার বর্ণনা কারী *সিকাহ*, তবে এটি *মুরসাল*।

১৫. *সহীহ আল বুখারী* (ইবনে হাযার, *ফাতহুর বারী*, ৮/১৪৯)

১৬. ইবনে হিশাম, *সীরাহ* ৪/৩২৯, *সহীহ* সনদ সহ।

১৭. আল বুখারী, *সহীহ (ফাতহুর বারী*, ৮/১৩৮)

১৮. প্রাগুক্ত। ৮/১৪৪।

১৯. প্রাগুক্ত। ৮/১৩৬।

২০. প্রাগুক্ত, ইবনে হিশাম, *সীরাহ*, ৪/৩২৯, *সহীহ সনদসহ*,

২১. *সহীহ আল বুখারী*, (*ফাতহুর বারী*,৮/১৪৫)।

২২. প্রাগুক্ত, ৮/১৪৯।

লেখক পরিচিতি

- ডঃ আকরাম জিয়া আল উমরী ১৩৬১ (১৯৪২) হিজরীতে উত্তর ইরাকের মসুলে জন্মগ্রহণ করেন।
- বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৩৮২ (১৯৬২) হিজরীতে বি এ এবং ১৩৮৬ (১৯৬৬) হিজরীতে ইসলামের ইতিহাসে এম এ ডিগ্রী লাভ করেন।
- কায়রোর আইন শামস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৩৯৪ (১৯৭৪) হিজরীতে তিনি পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন।
- ১৩৮৬-১৩৯৬ (১৯৬৬-১৯৭৬) হিজরী পর্যন্ত মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান এবং একাডেমিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।
- বর্তমানে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েট ডিপার্টমেন্টে সুন্নাহর ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন।
- ডঃ আল উমরী ইসলামী ইতিহাস-বিশেষ করে রাসূলের (সা) জীবনী সম্পর্কে প্রায় ২০ খানা গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন।

তার মৌলিক রচনাসমূহ নিম্নরূপ-

i) বুহুস ফি আল সুন্নাহ আল মুশরিকা (চতুর্থ সংস্করণ)
ii) আল মুজতামা আল মাদানী ফি আহমদ আল নুবুবাহ (দু'খন্ড)
iii) আল রিসালা ওয়া আল রাসূল
vi) আল সীরাত আল নবুবিয়া আল সহিহা
v) কিয়াম আল মুজতামা আল ইসলামী মিন মঞ্জুর আহারী
vi) আল তুরাহ ওয়া আল মুয়াসারা

এছাড়া তার সম্পাদনা কর্মসমূহ নিম্নরূপ-

i) আল মারিফা ওয়া আল তারিখ, ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান আল ফাসাবী।
ii) আজওয়াজ আল নবিয়ী, মুহাম্মাদ ইবনে জুবালাহ।
iii) তরিকাত আল নবিয়ী, হামাদ ইবনে ইসমাঈল আল আনসারী
vi) মুসনাদ খলিফা ইবনে খাইয়াত, আল উসফুরী আল বসরী (২৪০ হিঃ)।